প্রকাশক—

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

মিত্র প্রেস।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না

দ্বারা মুদ্রিত.

৩।১।১, গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভূমিকা

স্কুল পাঠ্য পুস্তকে সঙ্ক্ষিপ্ত পৃষ্ঠায় বা পূর্ণ কলেবর গ্রন্থে যখন আমি কোন দেশ প্রসিদ্ধ লোকের জীবন চরিত পাঠ করি, প্রায়ই তখন আমার মনে হয়, যে ইহার নাম অমুকের জীবন চরিত না হইয়া, অমুক স্তোত্র বা অমুক বন্দনা হইলে ভাল হইত। অলৌকিক বা অসাধারণ কাহিনী শ্রবণের জন্য সচরাচর মানব মন এতই আকৃষ্ট যে, বাস্তব বর্ণনা অনেক সময় জনপ্রিয় হয় না, আবার গুণমোহিত আখ্যায়িকা লেখকগণ, যেন অজ্ঞাত ইচ্ছার প্রেরণায় নিজ নিজ নায়ককে মনোমত অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া তোলেন। কি স্বদেশী কি বিদেশী কোন কোন সুলেখকের লিপি কৌশলে এমন পটুতা লক্ষিত হয় যে, তাহার গুণে নিত্য দৃষ্ট অলি-পৌরে সত্য কথ্য-ভাষাতেও সুষমা ভূষিত হয়।

জীবন চরিত লেখার সম্বন্ধে গ্রন্থকারদের আর এক প্রতিবন্ধক আছে, জগৎবরেণ্য বীরপুরুষদিগেরও যে কর্ম্ম-শৈশব ছিল, কোটিপতি ধনেশ্বর বা তাঁহার পূর্ব্ব-

পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কখনও যে অনুনয় স্বরে শ্রমের আরাধনা করিয়াছেন এ কথা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও ভক্তগণ প্রায় শুনিতে চাহেন না। সুতরাং লিখিতে হইবে, ষেটেরা পূজার রাত্রিতে শিশুবিদ্যাসাগর কর্ণাটি-কণ্ঠে উত্তরাকাণ্ডের পালা এমন ভাবে গান করিয়া-ছিলেন যে, বিধাতাপুরুষ সকল হিসাব কিতাব ভুলিয়া শিশুর কপালে প্রাণ প্রাণ প্রাণ এই তিনটি মাত্র শব্দ লিখিয়া অন্তর্হিত হইলেন, অথবা দোলার উপর ভারতবর্ষের ম্যাপ না পাতিয়া দিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কখনই ঘুমাইতে পারিত না। সাধারণতঃ লেখামাত্রই সহজ বোধগম্য প্রাণস্পর্শী ও কৌতূহল-জাগরণক্ষম হওয়া উচিত, সাহিত্য-কলাবিদ যখন উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে কাল্পনিক বা বাস্তব মানব চরিত্র চিত্রিত করেন, তখন তাঁহার দেখান চাই যে, নায়ককে যশোসুমেরুশিখরে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে কত কঙ্কর-কর্কশ পথ ক্ষতবিক্ষত পদক্ষেপে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কেবল মনুমেণ্টের উপর মানুষ দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ময়দানস্থ জনতার বাহবার হাত তালিতে বিশেষ ফল লাভ হয় না, সে

মানুষ কিরূপে পদস্খলন সামলাইয়া সঙ্কীর্ণ সঙ্কটাপন্ন অন্ধকার সোপানগুলির ধাপের উপর অটল চরণে ঘূরিতে ঘূরিতে অত উচ্চ স্থানে আপনাকে উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা অনুধাবন ও অনুকরণ করিবার প্রয়াস প্রত্যেক দর্শকের মনে থাকা উচিত।

এই চরিত্র পটে যে নায়কের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহাকে আমি অতি নিকটে চিনিতাম, অথচ বোধহয় সেই কারণেই তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতাম না। আমার কৈশোর শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনান্তে প্রান্ত সীমায় পৌছান পর্য্যন্ত শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের ও আমাদিগের পারিবারিক বাস ভূমে প্রতিবেশিত্ব সম্বন্ধের মধ্যে একটি প্রাচীর মাত্র ব্যবধান ছিল এবং অন্তঃপুরস্থ একটি দ্বার উভয় পরিবারস্থ অন্তঃপুরিকাগণের একত্র সম্মিলনে বাধাও দূর করিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে বল্লভ মহাশয় তাঁহার সৌভাগ্যসৌধ নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টক কাষ্ঠাদি সংগ্রহে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং সান্ধ্যদীপ দান হইতে দ্বিযামার অবসান পর্য্যন্ত এত ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন যে, বিশ্রম্ভালাপের অবসর তাঁহার ছিলই না বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। আবার অন্যদিকে আমারও ঐ দশা। সংসারে অপরিচিত অজ্ঞাত কয়েকটি যুবক সুহৃদের বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের সঙ্কল্প বাস্তবে পরিণত করা প্রচেষ্টার খড়কুটা কুড়াইবার জন্য নিজের ক্ষুদ্রশক্তি সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত করিয়াছি। বাড়ীর লোকই বাড়াভাত আগলাইয়া রাখিয়া টিকিটি দেখিতে পাইত না ত প্রতিবেশীর সহিত মেশামিশি করিব কখন? কিন্তু এমন কতকগুলি পুষ্প আছে যাহার সৌরভ অন্যমনস্ক নাসারন্ধ্রেও প্রবেশ করে, তদ্ভিন্ন অভিনয় কলার চর্চ্চা সেই সময় দিন দিন আমাকে মানবের মুখে তাহার হৃদয়ের গতি অধ্যয়ন করিবার শিক্ষা আমায় দিতেছিল। তাই বল্লভ মহাশয় যে কিরূপ কর্ম্মবীর, ধর্ম্মপথে পা ঠিক রাখিবার জন্য তিনি কত সাবধান, আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ-মনোরথ সংসার পথ-যাত্রীর দুঃখে সমবেদন তাঁহার আত্মাকে কত উন্নত করিতেছে তাহাও আমার দৃষ্টি একবারে এড়ায় নাই। আর অন্তঃপুরের শ্রুতি আমাকে জানাইয়া দিত যে, কাহার অবগুণ্ঠন আবরিত নয়নের দৃষ্টি বল্লভ মহাশয়ের হৃদয়ে দরিদ্রকে আনন্দ বণ্টনে আনন্দিত হইবার স্বর্গীয়

আবেশ প্রেরণ করিতেছে। বল্লভ মহাশয়ের কর্ম্মগুরু ছিলেন তাঁহার শ্বশুর পতিতপাবন সাউ মহাশয়, অতুল ঐশ্বর্য্য লাভে মাৎসর্য্য বিহীন নিরহঙ্কারে অলঙ্কৃত আত্মগোপনপ্রিয় মহাপুরুষ।

আমার স্থির বিশ্বাস, অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে দৃঢ়ীভূত বিশ্বাস যে মানুষের নাম আর কর্ম্মজীবনও চরিত্রের উপর আধিপত্য করে, অয়সের আশ্রয়ে অর্জ্জনের প্রয়াস, মন বনে মনে মৃগ অন্বেষণে, এই সাধুজীবন গীতি-গান সন্ন্যাসী বাবুর সন্ন্যাস।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

সাহিত্যক্ষেত্রে কোন পরিচয় দিবার মত যশঃ অর্জ্জন করিতে পারি নাই, তথাপি শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের জীবনচরিত রচনার এই প্রয়াস, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার মতই দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বাল্যকালে এই প্রাতঃস্মরণীয় কর্ম্মবীর ও দান-প্রেমিকের কার্য্যাবলী দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। তখন আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে এই মহৎ ব্যক্তির দিকেচাহিয়া বিস্মিত হইতে হইত। দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে, বালকত্ব হইতে পৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, দেশের কেহই বাঙ্গালা-মায়ের এই কৃতি ও ভক্তসন্তানেব জীবনকাহিনী সংগ্রহ করিরার চেষ্টা করিলেন না।

অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, শ্যামাচরণের পুত্রগণ উপযাচক হইয়া তাঁহাদের পিতৃদেবের জীবন-

চরিত রচনা করাইবার চেষ্টা করিবেন না। তাঁহাদের পুজ্যপাদ জনক কখনও নামের কাঙ্গাল হইয়া কোন কাজ কখনও করেন নাই, সুতরাং তাঁহারাও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ বিষয়ে নিরস্ত আছেন। তবে কেহ যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে তাঁহার জীবন-চরিত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারেন।

এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমি স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ মাহাশয়ের আবাল্য সহচর ও কর্ম্মচারী দ্বিজবর মণ্ডল মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পূর্ব্বেই তিনি ইহ-লোক ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আমার সহধর্ম্মিণী সরলাবালা এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ দিয়া-ছিলেন। আমি যাহাতে অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমার গুরু কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি, সে বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আনুকুল্য না পাইলে আমি এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার সুবিধা পাইতাম না। কিন্তু

গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বড় সাধ ছিল, এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে তিনি উহা স্বয়ং পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে সাধ মিটিল না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া বাহির হইল; কিন্তু তিনি উহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। লেখকের সে দুঃখ কখনও দূরীভূত হইবে না।

আমার পরম স্নেহভাজন অনুজযুগল, শ্রীমান্ প্রসাদকুমার চন্দ্র ও শ্রীমান্ বিধুভূষণ চন্দ্র আমার এই সাহিত্য-প্রচেষ্টায় যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়াছেন। তাঁহারা সংসারের অন্য সকল প্রকার দায়িত্ব হইতে আমাকে অব্যাহতি না দিলে এই গুরু-কর্ত্তব্য আমি কখনই সম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইতাম না। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে নানাভাবে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম।

গ্রন্থে অনেক ভ্রম ত্রুটি রহিয়া গেল। মুদ্রাকর প্রমাদ এড়াইবার মত কৌশল এই লেখকের আয়ত্তাতীত,

সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা উপেক্ষা করিলে চরিতার্থ হইব। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার ঃ

শীকৃড়া কুলীন গ্রাম,
২৪-পরগণা,
রথযাত্রা ২৪শে আষাঢ় সোমবার,
সন ১৩৩৬ সাল।
ইং ১৯২৯ খৃঃ, ৮ই জুলাই।

ভ্রম সংশোধন।

৫৫৫ পৃষ্ঠা "মালসাপূর্ণ আহার্য্য ও রজত মুদ্রা বিতরিত হইতেছিল" ইহার পরিবর্ত্তে পড়িতে হইবে, "মালসাপূর্ণ আহার্য্য, একখানি বোম্বাই চাদর ও একটি করিয়া রজতমুদ্রা বিতরিত হইতেছিল।"

৯০ পৃষ্ঠা "নিমাইচরণের" পরিবর্ত্তে "প্রেমচাঁদ" পড়িতে হইবে।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক :

রত্নকণা (যন্ত্রস্থ)

সুন্দরবনে শিকার ঐ

দানবীর

শ্যামাচরণ বল্লভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

জগতে কাহারও জীবন-কথা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হয়, তাঁহার জীবনের আদর্শের দ্বারা জগৎ কতটুকু লাভবান্ হইয়াছে। কারণ, এক ব্যক্তির জীবনের আদর্শ-দ্বারা অন্য ব্যক্তির পার্থিব কিম্বা পারমার্থিক জীবন গঠন করিবার উপাদান সংগৃহীত হয়, এবং দেখা যায়, সমস্ত মনুষ্যই এইরূপ আদর্শ শিক্ষকরূপে জগতে আগমন করেন না। মধ্যে মধ্যে এক এক ব্যক্তি মনুষ্য-সমাজের আদর্শ-

রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য লোক তাহাদের জীবন গঠন করিয়া মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, দেখা যায় মানুষ মাত্রই কোন না কোন আদর্শের অনুগামী। আদর্শ-গ্রহণেচ্ছু লোক মনুষ্য সমাজের মধ্যে বিরল নহে। কারণ, মানুষ জ্ঞাত আছে এবং বুঝিতে পারে যে, কোন আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবন ধারাকে নিয়মানুযায়িক পথে পরিচালিত করা যাইবে না, আদর্শচ্যুত হইলে জীবনের গতি মধ্য-পথে স্তব্ধ হইয়া যাইবে। এই আদর্শের ক্রম, উচ্চ এবং নিম্ন উভয় দিকেই বর্ত্তমান। উচ্চাদর্শের আশ্রয় লইলে মহত্ত্বের দিকে মন প্রধাবিত হয়, নিম্নের দিকে আশ্রয় লইলে ক্রমেই চিত্ত অবনত হইতে থাকে।

আদর্শই হইতেছে সীমাহীন সমুদ্র-মধ্যস্থ অর্ণব-পোতের দিক-নির্ণয়কারী যন্ত্র-স্বরূপ। কারণ, নাবিক যখন দারুণ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে সীমাহীন সমুদ্রে পথিভ্রান্ত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া হতাশ হইয়া পড়ে, তখন ঐএকমাত্র যন্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কূলে

আসিবার জন্য পোতকে চালনা করে। সেইরূপ সংসার-সমুদ্রে মানুষ যখন পথিভ্রান্ত ও শ্রান্ত হইয়া জীবন-গতিকে গন্তব্য পথে পরিচালন করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহার সম্মুখে স্থাপিত আদর্শই হইতেছে তাহার একমাত্র সম্বল। সে তখন ঐ আদর্শের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পুনরায় হর্ষভরে ও প্রফুল্ল মনে যাত্রারম্ভ করে। তবে সেই সময় যদি সে উচ্চাদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গমন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে মহত্ত্বের উচ্চতর স্তরে উপনীত হইবে এবং অপর দিকে সে যদি নিম্নের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নের দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে পতিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আদর্শ উচ্চগামী হউক আর নিম্নগামীই হউক, সে তাহার নিজ নিজ গুণ মানুষের উপর প্রতিফলিত করিবেই করিবে। তাই মানুষের কর্ত্তব্য, উচ্চের দিকে, মহত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া গমন করা। কারণ, একবার মহত্ত্ব-শিখরে আরোহণ করিতে পারিলে সে তাঁহার অভীষ্টকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ

উচ্চ আদর্শের অনুগামী হইতে হইলে, উচ্চ আদর্শের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ, আদর্শের ক্রম অনুসারে উত্থান পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার দেখা যায়, এই আদর্শের ধারা নানা দিক দিয়া প্রবাহিত হয়। কখনও ঈশ্বর-প্রেমের দিক দিয়া, কখনও কর্ম্মের দিক দিয়া, কখনও মানব-হিতৈষণার দিক প্রভৃতি দিয়া। আবার নানারূপ পাপের মধ্য দিয়াও যে এই ধারা প্রবাহিত হয় না, তাহা নহে। যখন ইহা পাপকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন নানারূপ পঙ্কিল ভাব চিত্তকে কলুষিত করে—মন তখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু লীলাময়ের অপার ইচ্ছায় দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ মানব-মন ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উচ্চের দিকে গমন করিতে লালায়িত হয়। হয় ত সময় সময় সে গাঢ় অন্ধকারে পথিভ্রান্ত হইয়া চলিতে চলিতে স্খলিত-পদে নিম্নে পতিত হয়; কিন্তু তাহার সম্মুখে সমুজ্জ্বল আদর্শ উদ্ভাসিত থাকিলে, সে আবার উত্থিত হইয়া পুনরায় উচ্চলক্ষ্যের দিকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

তাই বোধ হয়, পরম কারুণিক ভগবান সময় সময় এরূপ কতকগুলি লোককে প্রেরণ করেন, যাঁহারা আপনাদের মহৎ চরিত্র, কর্ম্মপ্রবণতা প্রভৃতিকে আদর্শের উপকরণ-রূপে জগতে রক্ষা করিয়া অমর হইয়া প্রস্থান করেন। পরে তাঁহাদের এই অযাচিত মহৎ দান মনুষ্য সাধারণের নিকট তাহাদের জীবন-যাত্রার পাথেয় হয়। চতুর্দ্দিক যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুয়াসাপূর্ণ পথে যখন তাহারা নিঃসহায়, দূরে অবস্থিত পবিত্র হোমশিখার উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় মহতের উচ্চাদর্শ তখন প্রতিভাত হইতে থাকে। সেই আলোকের উপর লক্ষ্য বাঁধিয়া তাহারা পুনরায় আপনাদিগকে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। এই ভগবৎ-প্রেরিত পুরুষগণই আদর্শের আধার। তাই জীবনচরিত আলোচনা-কালে দেখিতে হয়, আলোচ্য জীবনের আদর্শের দ্বারা জগৎ কতটুকু লাভবান হইতেছে।

সময় সময় এরূপ কতকগুলি লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবন-চরিত আলোচিত

হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মানব জাতির সাধারণ গুণাবলী ব্যতীত আরও কতকগুলি অতিরিক্ত উচ্চতর অসাধারণ গুণে সমন্বিত হইয়া আগমন করিয়াছেন। এই অতিরিক্ত অসাধারণ গুণই মহত্ত্বের দ্যোতক। যাঁহারা সেই অসাধারণ গুণের অধিকারী, তাঁহারাই অসাধারণ পুরুষ কিম্বা মহৎ ব্যক্তিরূপেই পরিচিত হন। এই মহৎ ব্যক্তিগণই জগতের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদিগের মধ্যে ঐশী-শক্তির বিশেষ-রূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, তাঁহারা একাধারে সাধারণ এবং অসাধারণ গুণমণ্ডিত বলিয়া সাধারণ মানব হইতে তাঁহাদেব আসন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই নিমিত্ত যখন তাঁহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে দোষ দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সেই দোষ সাধারণ মানবের ধর্ম্ম, এবং তাহাই সর্ব্ব মনুষ্যে বিদ্যমান। কিন্তু যখন গুণানুসন্ধান করা যাইবে, তখন দেখা যাইবে, তাঁহাদেব মধ্যে এমন কতকগুলি অতিরিক্ত গুণের সমাবেশ রহিয়াছে যাহা সাধারণ মানবের মধ্যে দৃষ্ট হয় না, তাহাই অসাধারণ।

জীবনচরিত রচনা করিতে হইলে এই সকল মহৎ লোকের জীবনকথার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, মহতের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য লোক তাহাদের জীবনকে মহত্ত্বের পথে পরিচালিত করিতে পারিবে।

জীবন-কাহিনী অনুশীলনের কার্য্যই হইতেছে, কোন মহৎ ব্যক্তির বিদ্যা, কুল-শীল প্রভৃতি সাধারণ গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি দান না করিয়া, তাঁহার অতিরিক্ত অসাধারণ গুণকে লোক-লোচনের সম্মুখে স্থাপন করা।

এই অসাধারণ পুরুষগণ সর্ব্বসময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। ইহাঁদের জন্মগ্রহণ করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল বা জাতি নাই। কারণ, ইহাঁরা জাতি কুল বা স্থান বিশেষের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত।

ইহাঁদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা যেন মানব-হিতৈষণার জন্যই

জগতে আগমন করিয়াছেন। দুঃস্থ মানব-আত্মার প্রতি গভীর সহানুভূতিই হইতেছে তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এই অসাধারণ পুরুষগণের চরিত্র-বল, মানসিক বল, কর্ম্মপ্রবণতা প্রভৃতি সমস্তই যেন অপূর্ব্ব রকমের বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁরা যেন সর্ব্বদা মানুষের দুঃখ চিন্তার সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া মানুষের মঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল। ইহারা শুধু নিজের চিন্তায় ব্যস্ত না হইয়া শত শত লোককে শান্তির আশ্রয়ে আনয়ন করিতে আপনাকে ব্যাপৃত রাখেন। এই অসাধারণ পুরুষগণের স্বভাবে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য কিম্বা নৈতিক চরিত্রের হীনতা প্রভৃতি দোষ কখনই দৃষ্ট হয় না। ইহারা নিছক কল্পনাপ্রিয় নহেন, ইহাঁরা সত্যের উপরেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এই মহৎ লোকগণ কেবলমাত্র মানুষের হিত সাধন করিয়া ক্ষান্ত হন না, তাঁহারা তাঁহাদের মহৎ চরিত্রের এবং কর্ম্ম-প্রণালীর দ্বারা পরবর্ত্তী জগতে শিক্ষার জন্য সোপান নির্ম্মাণ করিয়া যান। উহা অবলম্বন করিয়া মানুষ অগ্রসর হইলে, তাহার সাংসারিক কিম্বা পারমার্থিক

লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইবে—অনায়াসে জীবনকে আদর্শের দিকে ধাবিত করিতে পারিবে।

এই অসাধারণ পুরুষগণ জগতাকাশের ধ্রুবতারা স্বরূপ। সীমাহীন সমুদ্রে ভাসমান নাবিক যেমন অসংখ্য নক্ষত্র খচিত আকাশের মধ্যে একমাত্র ধ্রুব-তারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কূল প্রাপ্তির আশায় তরণীকে পরিচালিত করে, সেইরূপ এই অসংখ্য লোক-পূর্ণ সংসারের মধ্যে মানুষ কেবল ঐ মহতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার জীবন যাত্রার গন্তব্য-পথ ঠিক করিয়া লয়। ধ্রুবতারার নিজ পরিচয় প্রদান করিবার আবশ্যক হয় না, তাহার উজ্জ্বলতাই তাহার পরিচয়। অসাধারণ মানুষেরও কোন পরিচয় আবশ্যক হয় না, তাঁহার কর্ম্ম, দৃঢ় হৃদয় বল, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিই তাঁহার পরিচয় জগতের সম্মুখে প্রদান করে। দেখা যায়, জগতে যে কোন মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে জগতের সম্মুখে তাহাদের আদর্শ বলিয়া স্থাপন করে নাই, এবং তিনিও কাহাকেও আপনাকে

আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন নাই। মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে তাহাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীতে তাঁহারা কেবল তাঁহাদের আদর্শ রক্ষা করিয়া অমর হইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রস্তারম্ভ ঃ

এস্থলে এরূপ একজন লোকের বিষয় অবতরণা করা যাইতেছে, যাঁহার উপর ঐশী শক্তির বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তিনি সাধারণ এবং অসাধারণ—একাধারে এই দুই গুণ যুক্ত হইয়া মরলোকে আগমন করিয়া তাঁহার আদর্শ রক্ষা করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার জীবন কাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী, তাঁহার মানবহিতৈষী চিত্ত, লোককে এই শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছে যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে ভয়াবহ তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-নদী মানুষ অবহেলায় পার হইয়া যাইতে পারে।

তিনি প্রথমে কর্ম্মের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, জগতে ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন কিম্বা দারিদ্র্য মানুষের নিজ কৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। কারণ, একজন যে জগতে ধনী হইল, একজন যে জগতে দরিদ্র হইল,

তাহা আর কিছুই নহে, যে ধনী হইয়াছে সে যেরূপ পরিশ্রম সহকারে, যেরূপ বুদ্ধির সহিত কার্য্য করিয়াছে, যে দরিদ্র হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই সেইরূপ বুদ্ধি ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করে নাই। অনেকে অপরের উন্নতি অবনতি দেখিয়া চিন্তা করে যে, আমি এত কঠিন পরিশ্রম করিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না; কিন্তু অমুক এত উন্নতি করিল কি প্রকারে? সে বুঝিতে পারে না যে, এই পরিশ্রমের সহিত তাহার আনুষঙ্গিক বুদ্ধি বিবেচনা ও ধৈর্য্যের প্রয়োগ সে করে নাই।

সমস্ত উপাদান উপযুক্তভাবে মিশ্রিত না হইলে কখনও রোগ নিবারক ঔষধ প্রস্তুত হয় না। যদি বহু দ্রব্য সংযুক্ত কোন ঔষধ প্রস্তুতের একটি উপকরণের অভাব থাকে, কিম্বা সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইলেও যদি নিয়মানুযায়িক ভাবে মিশ্রিত না হয়, তাহা হইলে তাহার কখনও রোগ-নিবারক ক্ষমতা জন্মায় না। কিন্তু সেই দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া যথাযথ নিয়মে যদি ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই রোগ

দূরীভূত করিবার ক্ষমতালাভ করিবে। সেইরূপ জগতে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে হইলে পরিশ্রম, বুদ্ধি, সাধুতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইয়া সেই গুলি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে এবং তাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। তাই তিনি তাঁহাব জীবনের কার্য্যাবলীর দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ধনী ও দরিদ্র বলিয়া কিছুই নাই; তুমি তোমার গুণগুলি কার্য্যে প্রয়োগ কর, তোমার সাধনা সিদ্ধ হইবে; একটু ত্রুটি থাকিলে হইবে না। তাই তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ কবিয়া পরিশেষে দরিদ্রের জীবন-দাতা রূপে পরিণত হইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ধন উপার্জ্জন নিজের জন্য নহে, পরের জন্য। মহাভারতে আছে, "যে ধন পরের জন্য না ব্যবহৃত হইল তাহা ধন নহে।" তিনি সেই মহৎ বাক্যের অনুসরণ করিয়াছেন, তাই যখন খুলনা জেলার দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় অসংখ্য বুভুক্ষু লোক ক্ষুধার তাড়নায় ইতস্ততঃ ছুটিতেছিল, সেই সময় তিনিই তাহাদিগকে সেই দারুণ

ক্ষুধার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ধন ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন পিতা সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থোপার্জ্জন করেন, সেইরূপ তিনি যেন সেই অসংখ্য বুভুক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্যই ধন উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে সময় তিনি দারুণ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে ক্লিষ্ট নর নারীকে রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সে সময় ত দেশে আরও কত শত ধনশালী লোক বর্ত্তমান ছিল ; কিন্তু কাহারও হৃদয় ত তাহাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া উঠে নাই ! দেখা যায়, কেবল মাত্র ক্ষুধার্ত্তের ব্যাকুল, করুণ ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহারই হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল।

তিনি আরও দেখাইয়া গিয়াছেন যে, পারলৌকিক কার্য্যের পুরস্কার মনুষ্যের হস্ত হইতে গ্রহণ করিও না। কারণ, যখন তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ দৃষ্টে রাজ সরকার হইতে তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দানের প্রস্তাব করা হয়, তখন তিনি তাহা বিনয় সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন।

তৎপরে তাঁহার নীরব দান। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, "তোমার দক্ষিণ হস্ত দান করিলে যেন তোমার বাম হস্ত তাহা না জানিতে পারে"। তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনকে দান কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের প্রতিকৃতি পর্য্যন্ত রাখিয়া যান নাই। তিনি বলিতেন, "ছবি" রাখিলে মনে গর্ব্বের ভাব সঞ্চারিত হয়। এই সমস্ত দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি মনুষ্যত্বের কত উচ্চ স্তরে সমাসীন হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্য-জীবন

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার শ্বেতপুরগ্রামে সৎচাষী বংশে, স্বর্গীয় কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয়ের ঔরসে ও স্বর্গীয়া কমলাবালা দাসীর গর্ভে ১২৫৪ সালের ৩রা কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্বে সেই পরিবার বিশেষ দরিদ্র ছিলেন না। নানারূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা তাঁহার পিতৃ-পিতামহ বিশেষ অবস্থাপন্ন ছিলেন। কারণ, হিন্দুর মধ্যে এই সৎচাষী সম্প্রদায় ব্যবসায়ী জাতি; ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায়ই সকলে কোন না কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং যিনি নিতান্ত দরিদ্র তিনিও কাহারও নিকট দাসত্ব না করিয়া প্রায় কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাহা হইলেও ইঁহারা ব্যবসায়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত।

শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণও ব্যবসায়-কার্য্যের দ্বারা একরূপ সুখে দিন অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু শ্যামাচরণ জন্মগ্রহণ করিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের ব্যবসায়ে নানারূপ ক্ষতি হয় এবং সেইজন্য তাঁহার পিতা কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় পতিত হন।

এই দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইবার কারণ—শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের পিতা কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান্, গভীর-বিশ্বাসী বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই হরিভক্ত ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার এই গভীর হরিভক্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি প্রায়ই সর্ব্বসময়ে হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। কোন স্থানে কীর্ত্তন হইতেছে—ইহা যদি তিনি শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে নিজের সাংসারিক যত কার্য্যই থাকুক, সে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইতেন এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাতে বিভোর হইয়া যাইতেন।

একবার বাটীতে তাঁহার প্রথম পুত্রের পীড়া হয়। তিনি সেই পুত্রের সেবার জন্য নিজের কারবার ফেলিয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিতভাবে বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। পুত্রটিও প্রায় আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এরূপ সময়ে নিকটস্থ একটি গ্রাম হইতে মধুর মৃদঙ্গধ্বনি সহ কীর্ত্তনের সুধাস্রাবী সঙ্গীত তরঙ্গ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, তাঁহাদের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বৃন্দাবন হইতে একজন সাধু আসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তের হৃদয় নাম-শ্রবণে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অমনই সংসারের সমস্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া ভক্ত কালাচাঁদের প্রাণ তাঁহার বাঞ্ছিতের দিকে ধাবিত হইল। তিনি তথায় গমন করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। পত্নী কমলাবালা উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্তা স্ত্রী। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামী হরিনাম-শ্রবণে উন্মত্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে এ সময়ে ধরিয়া রাখা কঠিন। তাই যখন ভক্ত কালাচাঁদ বলিলেন, "তুমি খোকাকে দেখাশুনা কর, আমি নামের

স্থান হইতে একটু ঘুরিয়া আসি”—তখন সাধ্বী তাহাতে কোন অমত করিলেন না; কেবল বলিয়া দিলেন, “যদি সম্ভব হয়, তুমি তথায় বিলম্ব করিও না।” কালাচাঁদও “তাহাই হইবে” বলিয়া হরিনামে বিভোর হইয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, একবার তথায় যাইয়া কিঞ্চিৎ দেখা শুনা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু সেই নামকীর্ত্তন-স্থলে উপস্থিত হইয়া হরিনাম-শ্রবণে ভক্ত কালাচাঁদ আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া একবারে নাম-কীর্ত্তনে বিভোর হইলেন। সেই স্থানের ভক্তগণও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। কারণ, পূর্ব্ব হইতে সকলেই তাঁহার আগমন কামনা করিতেছিলেন। কেবল সকলে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, বাটীতে তাঁহার পুত্রের বিশেষ অসুখ। সেই কারণ তাঁহাকে আহ্বান করিতে কেহই সাহস করেন নাই। কিন্তু ভক্ত ত থাকিতে পারে না; সে যে তাহার বাঞ্ছিতকে চাহে এবং ভগবানও যে ভক্তকে চান, তাই ভগবান এবং ভক্ত পরস্পর কেহ কাহাকেও রোধ

করিতে পারেন না। তাই, বোধ হয়, বৃন্দাবনে কালার বংশীধ্বনিতে গোপীগণ উন্মত্ত হইয়া যাইত। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া বংশীধারীর দিকে ধাবমান হইত।

কালাচাঁদ বল্লভও তাই নাম-বংশী শ্রবণে আর স্থির থাকিতে পারেন নাই; তাঁহার ভক্ত-হৃদয় ভাবোন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই তথায় উপস্থিত হইয়া নাম-বিভোর কালাচাঁদ, কালাচাঁদের প্রেমে তন্ময় হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন; আর তাঁহার সংসারের কথা—আসন্নমৃত্যু পুত্রের কথা কিছুই তাঁহার স্মরণ-পথে থাকিল না। তিনি কীর্ত্তনের স্থলে আগমন করিয়াছিলেন, তখন প্রভাত-কাল; কিন্তু যখন দ্বিপ্রহর, তখনও তাঁহার চৈতন্য নাই; তিনি হরিনামে মত্ত হইয়া—কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এদিকে বাটীতে তাঁহার পুত্র ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রী কমলাবালা উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বামীর জন্য পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু স্বামীর উপর কোন বিরক্তি-ভাব নাই।

ইতিমধ্যে পত্নী, তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য, দুইবার লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি যাইতেছি বলিয়া, আবার কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া যান; তাঁহার আর বাটীতে আগমন করা হইল না। এদিকে বেলা দ্বিপ্রহর-অন্তে বাটীতে তাঁহার পুত্রটির মৃত্যু হইল। তখনও কালাচাঁদ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া হরিনাম-রস পান করিতেছেন। তখনও তিনি অস্নাত—অভুক্ত। তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ-সহ যে ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য পুনরায় আগমন করিল, সেই ব্যক্তি সেই সময় সেই আপন-ভোলা কালাচাঁদকে আর কোন কথা না বলিয়া গোপনে গৃহস্বামীকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল এবং কালাচাঁদকে বাটীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল।

তখন সেই গৃহস্বামী কালাচাঁদকে কীর্ত্তনের স্থান হইতে কোনক্রমে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে বাটীতে যাইবার কথা ও বাটীতে তাঁহার বিপদের কথা সমস্ত বলিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, বাটীতে তাঁহার পুত্র আসন্ন মৃত্যুশয্যায়

শায়িত। গৃহস্বামী তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কেবল বাটীতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কালাচাঁদ যখন বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার পুত্রটির মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার মৃতদেহ অঙ্গনে তুলসীবৃক্ষের নিম্নে শায়িত অবস্থায় রহিয়াছে।

বাটীতে আগমনকালে দূর হইতে ক্রন্দনের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে বাটীতে আসিয়া তিনি ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া বিন্দুমাত্রও শোকার্ত্ত না হইয়া পুত্রের সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। মুখে কেবল বলিলেন, "তুমিই দিয়াছিলে, আবার তুমিই লইলে"। তাঁহার শোকপরায়ণা স্ত্রীকে তিনি বলিলেন, "বুক বাঁধো, তিনিই দিয়াছিলেন তিনিই লইলেন, ও তো গেল, ওকে তো ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না! এখন আমাদের বাকি কাজ শেষ কর। কাঁদিয়া কি হইবে, কাঁদিলে ত তাহাকে পাওয়া যাইবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি নিকটস্থ জনৈক আত্মীয়কে

বলিলেন, "কীর্ত্তনের দলকে একটু অনুরোধ করিতে পার, আমার পুত্রের সহিত নাম গাহিতে গাহিতে শ্মশান পর্য্যন্ত অনুগমন করে এবং অদ্য রাত্রে আমার বাটীতে একটু নাম গান করে?"

তাঁহার অনুরোধ সকলেই অতি আনন্দের সহিত পালন করিল। কালাচাঁদ শ্মশান হইতে পুত্রের দাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া কীর্ত্তনের দল সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের অঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। কথিত আছে, সেই রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে হরিনাম-কীর্ত্তনের জন্য এত লোক-সমাগম হইয়াছিল যে, সে অঞ্চলে কোন কীর্ত্তনে কখনও এত লোক-সমাগম, নিমন্ত্রণ করিয়াও হয় নাই। ভক্ত কালাচাঁদের মুখে মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইতেছিল, "তোমার দেওয়া জিনিস তুমি লই-য়াছ।" তাঁহার সাধ্বীপত্নী কমলাবালা সেই নিদারুণ পুত্রশোকের মধ্যেও উপস্থিত জনগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিতামাতার আদর্শ

কালাচাঁদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাইবার আর এক কারণ দানকার্য্য। সে সম্বন্ধে তাঁহারা পতি-পত্নীতে যেন পাল্লা দিতেন। কেহ এ সম্বন্ধে কম ছিলেন না। বাটীতে যদি কখনও কোন অতিথি আগমন করিত, তাহা হইলে এই গৃহস্থ-দম্পতি কিরূপে তাহার সেবা করিবেন, তাহা তাঁহারা যেন চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহাদের এই অতিথি-সৎকারের জন্য তৎকালে যে কোন সাধু বৈষ্ণব ঐ গ্রামে উপস্থিত হইতেন, তিনি কালাচাঁদ বল্লভের বাটীতেই পদধূলি দিতেন। কালাচাঁদ কখনও তাঁহাদের অনাদর করিতেন না। গ্রামের মধ্যে যে কোন দুঃস্থ স্ত্রীলোকের অন্নাভাব হইত, কালাচাঁদ-পত্নী কমলার নিকট আগমন করিলেই তাহার সেই দিবসের অন্নাভাব দূর হইত। কারণ, কালাচাঁদের পত্নী যে মুহূর্ত্তে শ্রবণ করিতেন যে, অমুকের অদ্য আহার হয় নাই, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠিত।

উত্তরকালে তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণ বল্লভ যে সময় ধনী হইয়া মুক্তহস্তে দানকার্য্য করেন, অনেকে বলেন, ইহা তাঁহার মাতারই ইচ্ছায়। সেই দয়াবতী মহিলা ক্ষুধার্থের মাতৃস্বরূপিণী হইয়া পুত্রের দ্বারা, ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের সময়, অনাহারক্লিষ্ট লোকগণকে অন্নদান করিয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই করুণাময়ী, উত্তরকালে পুত্র ধনী হইলে, তাঁহার পূর্ব্বের দানকার্য্যের ইচ্ছা ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাটীতে যদি কিছু ভাল খাদ্যদ্রব্য আসিত, তবে তিনি একাকী কখনও তাহা আহার করিতে পারিতেন না। অগ্রে প্রতিবাসিবর্গকে দিয়া তবে তিনি তাহা নিজ পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। এ অভ্যাস তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।

উত্তরকালে যখন তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণ ধনী হইয়া ধান্যকুড়িয়ায় প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং কলিকাতা হইতে নানারূপ ভোজ্য-সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন কিম্বা আনয়ন করি-

তেন, তখনই সেই মহীয়সী মহিলা যে রূপেই হউক, অগ্রে তাহা প্রতিবাসিবর্গের বাটীতে যাইয়া কিম্বা কোন লোক মারফত পাঠাইয়া দিয়া এবং বাটীর কর্ম্মচারিবর্গকে বিতরণ করিয়া, তৎপরে নিজ পরিবারের লোকজনকে প্রদান করিতেন। উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র, মাতার দানশীলতার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া বাটীতে যে সব খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিতেন, কিম্বা লোক-মারফত প্রেরণ করিতেন তাহার পরিমাণ খুব বেশী হইত। কারণ পুত্র জানিতেন, আমার মাতাকে আনন্দ দান করিতে হইলে তাঁহার দানকার্য্যে সহায়তা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কালাচাঁদ দম্পতির এইরূপ মুক্তহস্ততার সাক্ষীস্বরূপ এখনও বহু লোক জীবিত রহিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের পিতা কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় হরিনামে মত্ত এবং দানে মুক্তহস্ত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংসার চালাইবার একমাত্র উপায়—ব্যবসায়ে নানারূপ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল এবং তিনি দরিদ্র দশায় উপনীত হইলেন।

তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইল, কিন্তু দানকার্য্যের প্রবাহ-বেগ রুদ্ধ হইল না। তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, একদা তাঁহার বাটীতে হঠাৎ কতকগুলি অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বাটীতে সে সময় যে আহার্য্যদ্রব্য সঞ্চিত ছিল, তাহা কেবল সেই দিবস তাঁহাদের সংসারের লোক কয়টির সঙ্কুলানের মত, তাহার অতিরিক্ত লোক হইলে অনাটন হইবে। কালাচাঁদ ইচ্ছা করিলে অতিথি কয়টির জন্য অন্যত্র বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু অতিথি বিমুখ হইলে পাপভাগী হইতে হইবে—এই ভয়ে তাঁহারা পতি-পত্নীতে উপবাসী থাকিয়া তাঁহাদের নিজ অংশের খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা অতিথিগণকে পরিতোষরূপে তৃপ্তি সাধন করাইলেন এবং বোধ হয় তাহাতে তাঁহারাও তৃপ্ত হইলেন। তাঁহার অবারিত দান এবং হরিনামে মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক কার্য্যে অমনোযোগিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সকলেই এরূপ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিত; কিন্তু ভক্তের প্রাণ সে নিষেধে কখনই বাধা প্রাপ্ত হইত না।

এই কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় সৎচাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুলীন ছিলেন। সেই কারণে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া গ্রামের ৺রামকিশোর গাইন মহাশয় তাঁহার একমাত্র কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার পত্নী কমলাবালাই সেই রামকিশোর গাইন মহাশয়ের কন্যা।

৺রামকিশোর গাইন মহাশয়ের ছয় পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রগণ যথাক্রমে লালচাঁদ গাইন, চন্দ্রনাথ গাইন, গোবিন্দচন্দ্র গাইন, বদনচন্দ্র গাইন, মনোমোহন গাইন ও তিলকচন্দ্র গাইন। কালাচাঁদের দানকার্য্যে এবং হরিনামে মত্ত হওয়ার কার্য্যে বাধা-প্রদানকারীদিগের মধ্যে তাঁহার শ্বশুর ও শ্যালকগণ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। যাহাতে এইসকল কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যায়, তাঁহারা নানা রূপে সেরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না।

এই সূত্রে শ্বশুরবাটীর সকলের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য প্রবল আকার ধারণ করিল। তাঁহারা

তাঁহাদের কন্যাকেও নিবারণ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধ্বী কিছুতেই স্বামীর মতের বিরুদ্ধে গমন করেন নাই। তাঁহার মনের ভাব ছিল যে, তাঁহার স্বামীর যাহা ইচ্ছা তাঁহারও তাহাই ইচ্ছা। স্বামীর ইচ্ছায় তিনি আপন ইচ্ছাকে বিলীন করিয়াছিলেন। সেই কারণে কেহই তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্বামীর মতবিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত করিতে পারিত না এবং এইজন্যই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ যখন কিছুতেই তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং এই বিরক্তিই ক্রমে দারুণ কলহে পরিণত হইল।

কালাচাঁদের শ্বশুর ও শ্যালকগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহারা আর কিছুতেই কন্যা-জামাতার এবং ভগিনী-ভগিনীপতির কোন তত্ত্ব লইবেন না। তেজস্বিনী কন্যাও সেই সম্বাদ শ্রবণে বিন্দু মাত্র দুঃখিত হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি কখনও আমার পিতা ও ভ্রাতারা স্বয়ং আসিয়া এখান হইতে আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি পিত্রালয় ধান্যকুড়িয়ায় যাইব,

নচেৎ নহে। কালে তাঁহার প্রতিজ্ঞাই ফলবতী হইয়াছিল। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

যে সময়ে কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয়ের শ্বশুর ও শ্যালকগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞাতিগণও তাঁহাকে ঐ একই কারণে প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কলিকাতা শ্যামবাজারে যে তামাকের দোকান ছিল, তাহা হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই হরি-ভক্তি, বৈষ্ণব-সেবা কিম্বা তাঁহার অতিথি-সৎকার কিছুতেই নিবারিত হইল না। কমলাবালা উপযুক্তা স্বামীর উপযুক্ত পত্নী; তিনি স্বামীর কার্য্যে খুব বেশী করিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং মানুষ যদি কোন কার্য্যে তাহার পত্নী দ্বারা উৎসাহিত হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্যে তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ হয়।

একে কালাচাঁদ ঈশ্বর প্রেমে প্রেমিক, তাহাতে পত্নীর উৎসাহে উৎসাহিত, তখন তাঁহার ধর্ম্মানুশীলন রোধ করিতে পারে জগতে এমন কোন শক্তিই নাই। ফলে তাঁহার ঈশ্বর প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত

হইতে লাগিল এবং এদিকে যতই তাঁহার ঈশ্বর প্রেম বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাঁহার দরিদ্রতার সময় তাঁহার অন্য অন্য ভ্রাতা তাঁহাকে একরূপ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তাঁহার সাধ্বী পত্নী কমলাবালার হৃদয় কিছুতেই দমিত হইল না। তিনি স্বামীকে বলিলেন, "তুমি বাহির হইতে যাহা কিছু পার আনয়ন করিও, আমিও এদিকে যে প্রকারে পারি সংসার চালাইয়া লইব।" তখন অবসর সময়ে কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় সামান্য দ্রব্যাদি হাটে বিক্রয় করিতেন এবং সময় সময় তাঁহার পত্নীও প্রতিবাসীর বাটীতে ধান্য প্রভৃতি ভানিয়া সংসারে সাহায্য করিতেন।

প্রবাদ আছে যে, কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তিনি সত্যবাদী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে প্রতারণা, মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতি কোন রূপ দুষ্কার্য্য করিতে দেখেন নাই বা শ্রবণ করেন নাই। অতি দুঃখেও কেহ তাঁহাকে ম্রিয়মান হইতে দেখে নাই। তাঁহার সদা হাস্য-প্রফুল্ল বদন, বিনয়পূর্ণ ব্যবহার এবং

নম্র স্বভাব সেই গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিত। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, বর্ষার পূর্ব্বে তিনি ঘর ছাইতে পারেন নাই। সমস্ত রাত্রি গৃহে বর্ষার বারিধারা প্রবেশ করিয়াছে; পতি-পত্নীতে কোন ক্রমে সন্তানগুলিকে বারিধারা হইতে বক্ষপুটে রক্ষা করিয়া সমস্ত রাত্রি উপবেশন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহাদের হৃদয় কখনও ভগবৎ প্রেম হইতে চ্যুত হয় নাই। সদা হাস্য-প্রফুল্ল কালাচাঁদের মুখ কখন বিমর্ষ হয় নাই। বোধ হয়, কালাচাঁদের প্রাণ কালাচাঁদের প্রেমে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাই বাহিরের কোন জিনিস আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। সেই কারণেই কালাচাঁদ কালাচাঁদকে শ্যামাচরণ দান করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্য

এইরূপ ভীষণ দারিদ্র্যে যে সময় কালাচাঁদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার গৃহে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। তখন তাঁহার পুত্রের জাত-কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অর্থ নাই। পুত্রকে পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ পান করাইবার সঙ্গতি নাই। সেই সময় প্রতিবাসী দুই একজন প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার পত্নীকে এই সময় কিছুদিনের জন্য তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। কালাচাঁদেরও সে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তেজস্বিনী মহিলা সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার সেই এক কথা—"যদি আমার পিতা কিম্বা ভ্রাতারা নিজে এখানে আগমন করিয়া আমাকে লইয়া যান তবেই আমি পিত্রালয়ে যাইব, নচেৎ কখনই আমি পিত্রালয়ে যাইব না। ইহাতে আমার ভাগ্যে যাহা হয় হউক।"

কালাচাঁদ আর কি করিবেন? যখন ইহাতে তাঁহার পত্নীর অমত তখন তিনি তাঁহার মত-বিরোধী হইলেন না। পত্নীর সঙ্কল্পের মর্য্যাদাও তিনি বুঝিতেন এবং তাহা অটুট রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

যাহা হউক, এইরূপে দুঃখে কষ্টে—ঘোর অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যে শ্যামাচরণ পালিত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূবন বল্লভ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতার সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সংসারে কিছু স্বচ্ছলতা আসিয়াছিল।

কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয়ের দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠা প্রসন্নময়ী এবং কনিষ্ঠা ঘৃতকুমারী। তাহাদের বিবাহ ইতিপূর্ব্বেই কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় দিয়া দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ বারাসাতের অন্তর্গত মধ্যম গ্রামে এবং কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ কুলসূব গ্রামে দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কন্যাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন উদ্বেগ ছিল না।

কালাচাঁদ বল্লভ সৎচাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুলীন; সুতরাং সকলেই তাঁহার ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে উৎসুক ছিলেন। বিশেষতঃ সকলেই তাঁহাকে ধাম্মিক বলিয়া জানিতেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিতেন। কেহ কেহ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভুবন বল্লভকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যস্ত হইলেন।

সেই সময় ভুবন উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সামান্য সামান্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতেছিলেন। মধ্যে তাহাদের সংসারে যতটা অভাব ঘটিয়াছিল ততটা আর ছিল না। এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল অবস্থা আসিয়াছে বুঝিয়া কালাচাঁদ ও তাঁহার পত্নীরও পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা হইল।

তাঁহারা পুত্র ভুবনের সহিত বাহুগ্রাম নিবাসী ৺ নবীনচন্দ্র মণ্ডলের কন্যার বিবাহ দেন। পরে এই মহিলাই শ্যামাচরণ বল্লভের বৃহৎ সংসারের কর্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ইহার সদ্বিবেচনা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা, সৌজন্য এবং সকলের সহিত মধুর আলাপ ও ব্যবহারে

শ্যামাচরণের সংসারটি পুণ্যের সংসারে পরিণত হইয়াছিল। এরূপ বৃহৎ পরিবারের সমস্ত ভার স্কন্ধে লইয়া সংসারটিকে তিনি সুন্দররূপে পরিচালিত করেন।

যে সময়ে শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনের বিবাহ হয়, সে সময় শ্যামাচরণের বয়স দুই বৎসর। ইহার পর বৎসরে শ্যামাচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ বল্লভের জন্ম হয়। এই রঘুনাথ পরে প্রায় ২৫।২৬ বৎসর বয়সে গিরিবালা দাসী নাম্নী একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

এইরূপে সুখ ও দুঃখে আরও দুই বৎসর অতীত হইল। ভক্ত কালাচাঁদ সেই একই ভাবে তাঁহার ভক্তি-নম্র জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সেই হরিপ্রেমে বিভোর ভাব—কোন স্থানে হরি সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাতে যোগদান, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হওয়া, অতিথি সজ্জনের সেবা, সেই নিরহঙ্কার সরল জীবন যাপন।

সংসারে কোন কুটিলতার ভিতর কালাচাঁদ প্রবেশ করিতে পারিতেন না। সামান্য ব্যবসা করিয়া যৎ-

সামান্য আয় এবং জ্যেষ্ঠপুত্র ভুবনের কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন মিলাইয়া সেই অর্থে সংসার প্রতিপালন কার্য্য হইতেছিল। তাঁহার সাধ্বী পত্নীও তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। এই শান্তিপূর্ণ সংসারে এতদিন কোনরূপ অশান্তির ছায়া পতিত হয় নাই। সাংসারিক দুঃখ কষ্টের ঝঞ্ঝাবাত, ভগবানে স্থির-বিশ্বাসী এই দম্পতি হাস্যমুখে, অম্লানচিত্তে বহন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা কোনই কষ্ট অনুভব করেন নাই।

এরূপ অনেক সময় গিয়াছে, যখন নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তখন পুত্র কয়টি একবারে নাবালক শিশু এবং কালাচাঁদেরও পূর্ব্বোক্ত ভাব। তখন এক এক দিবস তাঁহাদের আহার জুটিত না। হয়ত সমস্ত দিন উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে। অনেক দিন এরূপ হইয়াছে, একদিকে কালাচাঁদ তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণসহ অন্নাভাবে উপবাসে দিন অতিবাহিত করিতেছেন, অন্যদিকে তাঁহারই পৃথকান্ন সহোদরগণ পুত্রকলত্রগণের সহিত অন্নাহার করিতেছেন; একবার তাঁহারা কখন জিজ্ঞাসা করিতেন না যে, কালাচাঁদের

কোন সাহায্য আবশ্যক কি না। কালাচাঁদের অভুক্ত শিশু সন্তানগুলিকে লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান করাও তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

কিন্তু কালাচাঁদ ইহাতে কখনও ভ্রাতৃগণের উপর বিরক্ত হয়েন নাই। তাঁহার পত্নী কমলাও কখনও তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন নাই। তিনি সেই একইভাবে তাঁহার চিরকল্যাণ-আশীষভরা কর-যুগল তাঁহাদের সাহায্যের জন্য অনুক্ষণই প্রস্তুত রাখিতেন। বাটীতে যখনই কোন ভাল দ্রব্য আসিয়াছে, তখনই তাহাদিগকে তাহা না দিয়া এই লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারী কখনই আপন সন্তান ও স্বামীকে তাহা খাইতে দেন নাই। উত্তরকালে যখন তাঁহার পুত্র কোটীপতি হইয়াছিলেন তখন জননী কমলা প্রথমেই তাঁহার পুত্রেব দ্বারা তাঁহার দেবরগণকে আনয়ন করেন। তারপর তাঁহার ধান্যকুড়িয়ার বাটীর নিকট তাঁহাদের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের যাহাতে

স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করিয়া দেন। এইরূপ মহীয়সী, মহৎ অন্তঃকরণ বিশিষ্টা, উদারচেতা মহিলা না হইলে, তাঁহার গর্ভে কখনও অতি-মানুষের জন্ম হয় না।

দেবি! তুমি অমরধামে চলিয়া গিয়াছ, কিন্তু তোমার কীর্ত্তি এখনও জগতে বর্ত্তমান। তুমিই দেখাইয়াছ কাহাকেও জয় করিতে হইলে, হিংসার পরিবর্ত্তে অজস্র স্নেহ ও প্রেমই অব্যর্থ অস্ত্র।

কালাচাঁদ বল্লভের পিতা রমানাথ বল্লভ মহাশয়ের পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ বংশীরাম বল্লভ, মধ্যম কালাচাঁদ বল্লভ, তৃতীয় মথুর বল্লভ, চতুর্থ মধুসূদন বল্লভ এবং পঞ্চম স্বরূপচাঁদ বল্লভ। পূর্ব্বে এই রমানাথ বল্লভের কলিকাতা শ্যামবাজারে, ঠিক বেলগেছিয়া হইতে খালের পুল পার হইয়া কলিকাতাভিমুখে আগমন করিতে পুলের নিম্নে দক্ষিণ দিকে, একখানি তামাকের দোকান ছিল। উহার আয় হইতে তাঁহাদের সংসার একরূপ স্বচ্ছল ভাবেই চলিত।

রমানাথ বল্লভ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সেই

পাঁচ পুত্র সেই দোকানখানি চালাইতেন এবং তাহার আ.
হইতে তাঁহারাও বেশ স্বচ্ছলভাবে দিন যাপন করিতেন।
কিন্তু যে সময়ে কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় পরম বৈষ্ণব
হইয়া হরি প্রেমে মাতোয়ারা হইলেন, এবং সংসারের
দারুণ কুটিলতার ভিতর হইতে মুক্ত হইলেন, সেই সময়
তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা বেশী লাভবান্ হইবার আশায়
সরল-হৃদয় সহোদর কালাচাঁদকে নানারূপ কৌশলে
দোকানের অংশ হইতে বঞ্চিত করিলেন। তাহাতেই
কালাচাঁদের এত আর্থিক কষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল। রাস্তার
দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত একটি সামান্য দোকান হইতে
বিতাড়িত হইয়া কালাচাঁদ বল্লভ অতি ঘোর দারিদ্র্য
ভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু
তাঁহারই পুত্র শ্যামাচরণ ঠিক সেই রাস্তারই উত্তর-প্রান্তে
বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস
করিয়াছিলেন। বাল্যে যে শ্যামাচরণকে তাঁহারা একমুষ্টি
অন্ন দেন নাই, কালে সেই শ্যামাচরণই তাঁহাদের
আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিতৃ-বিয়োগ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে সময়ে কালাচাঁদ এবং তাহার পত্নী নানারূপ সাংসারিক দুঃখ, কষ্টের পর জ্যেষ্ঠপুত্র উপার্জ্জনক্ষম হওয়াতে কিঞ্চিৎ সাংসারিক স্বচ্ছলতার ভিতর উপস্থিত হইয়াছেন, সেই সময় তাঁহাদের ভাগ্যাকাশে একখানি কাল মেঘের সঞ্চার হইল। সে সময় ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া নিজ আসন স্থায়িভাবে গ্রহণ করিয়াছে। উহার কৃপায় তখন বঙ্গদেশে গ্রামের পর গ্রাম লোকশূন্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্বেতপুর, হাবড়া, বসির-হাট, দোগাছিয়া, দত্তপুকুর প্রভৃতি স্থান ম্যালেরিয়া রোগের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের স্বাস্থ্যপূর্ণ গ্রাম সকল অস্বাস্থ্যের আকর স্বরূপ হইয়াছে। তথাকার সবল, সুস্থ, আনন্দময় অধিবাসীরা দারুণ ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইয়া অকালে জরাগ্রস্ত,

প্লীহা যকৃৎবাহী, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও নিরানন্দ হইয়া দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। এক কথায় গ্রাম সকল শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতেছে।

এই সময় সেই ম্যালেরিয়া এই ক্ষুদ্র শ্বেতপুর গ্রামে প্রবলভাবে তাহার অধিকার বিস্তার করিয়া লইল। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর ভীষণ দংষ্ট্রামুখে পতিত হইয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে লাগিল। পল্লীর কলহাস্যমুখর প্রাঙ্গণে, আনন্দময় কুটীর দ্বারে, নৈরাশ্যের ম্লান ছায়া, মৃত্যুর বিভীষিকা লইয়া ফিরিতে লাগিল। ভক্ত কালাচাঁদ বল্লভও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। দারুণ ম্যালেরিয়া ব্যাধি তাঁহার সুস্থ সবল দেহে অধিকার বিস্তার করিল। উহার সহিত ক্রমাগত প্রায় ছয় মাস যুদ্ধ করিবার পর তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। সে সময় তাঁহার পুত্র ভুবন বল্লভ প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর। প্রথমপুত্র গঙ্গারাম পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তৃতীয় রাম বল্লভ ৯।১০ বৎসরের

বালক। চতুর্থ শ্যামাচরণ বল্লভের বয়স ৫ বৎসর এবং কনিষ্ঠ রঘুনাথ ২ বৎসরের শিশু।

দীর্ঘ ছয়মাসকাল জীবন ও মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া ভক্ত কালাচাঁদের যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ব্যয় ছিল; কিন্তু উপার্জ্জনের পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অন্তিম শয্যায় যখন তিনি শায়িত, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহার পত্নীও এ সময় স্বামীর অসুখের সেবা করিয়া এবং কোলে একটি শিশু সন্তান ছিল বলিয়া, কোনওরূপ কার্য্যে সংসারে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারেন নাই। একমাত্র নির্ভর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবন। তিনি সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে অত বড় পরিবারের অন্নসংস্থান এবং পীড়িত পিতার চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। এই কারণে সেই সময় তাঁহাদের নিদারুণ অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ বিপদের সময়ে কালাচাঁদ বল্লভ তাঁহার ভ্রাতাদের নিকট হইতেও কোন রূপ সাহায্য পান নাই।

যাহা হউক, যে সময়ে ভক্ত কালাচাঁদের আসন্ন

কাল উপস্থিত হয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভুবনমোহন তাহার পূর্ব্বে কবিরাজের বাটীতে গিয়াছিলেন। কারণ, মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দপথে চলিতেছিল, তখন পিতৃবৎসল পুত্র স্থির থাকিতে না পারিয়া কবিরাজের বাটীতে গমন করেন। তৎকালে এ অঞ্চলে প্রায় ডাক্তার ছিল না এবং তখনকার বহু প্রবীণ ব্যক্তি বিলাতি ঔষধও অপবিত্র বিবেচনায় গ্রহণ করিতেন না। তখন গ্রামে গ্রামে কবিরাজী চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল। দেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলিয়া, রোগ-পীড়া কম হইত; যাহাও হইত, তাহা বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে নিরাময় হইয়া যাইত। এখনও এমন অনেক লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা বিলাতি ঔষধ স্পর্শ করেন না এবং প্রায়ই দেখা যায় তাঁহারাই বেশী স্বাস্থ্যবান্।

কালাচাঁদের শেষ সময় উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নী দারুণ শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো আমাকে কি দান করিয়া গেলে,

কাহার কাছে রাখিয়া গেলে।" তখন মৃত্যুপথ-যাত্রী কালাচাঁদ কোনও ক্রমে তাঁহার ক্ষীণ হস্ত দ্বারা, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট বালক শ্যামাচরণের হস্ত পত্নীর হস্তের উপর স্থাপন করিয়া দিলেন। সে সময় নিকটে আর কেহ ছিল না। কালাচাঁদের তৃতীয় পুত্র রাম বল্লভ প্রতিবাসিবর্গকে ডাকিতে গিয়াছে। কেবল মাতার বক্ষোলগ্ন শিশু রঘুনাথ। কিঞ্চিৎ পরেই রাম বল্লভ প্রতিবাসিবর্গকে ডাকিয়া আনিল, তখন কালাচাঁদের আসন্ন সময় উপস্থিত হইয়াছে।

প্রতিবাসিবর্গ পরমভক্ত সাধু কালাচাঁদকে ধরাধরি করিয়া অঙ্গনস্থিত তুলসী তলায় তাঁহার বাঞ্ছিতের পদতলে স্থাপন করিল, তাঁহার কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিল। সেই সময় তাঁহার মুখে জল দিবার প্রয়োজন হওয়ায়, সে কার্য্য নিকটে উপস্থিত শ্যামাচরণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কারণ, জ্যেষ্ঠ পুত্র তখনও পর্য্যন্ত কবিরাজের বাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। রাম বল্লভও অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত। যাহা হউক, এদিকে যে সময়ে ভুবন কবিরাজ লইয়া আগমন

করিলেন, তখন কালাচাঁদ সাধনোচিত ধামে যাত্রা করিয়াছেন। সাধু, পরম বৈষ্ণব, ভক্ত কালাচাঁদের আত্মা তখন অমরধামে উপস্থিত হইয়া বোধ হয় কালাচাঁদের পদতলে লীন হইয়াছে।

এইরূপে কালাচাঁদের পুণ্যময় জীবনের অবসান হইলে, তাঁহার আত্মীয়বর্গ শব দেহের সংকারের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাচাঁদের সাধ্বী পত্নী কমলা দারুণ শোকে মুহ্যমানা—আত্মবিস্মৃতা। প্রতি-বাসিনী মহিলাগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহে এমন অর্থ নাই যাহা দ্বারা মৃতের সংকার-কার্য্য সম্পন্ন হয়। শোকার্ত্তা সাধ্বী স্ত্রী সে সময়ে আরও বিপদে পতিত হইলেন। যদিও তিনি শোকমুগ্ধা. তথাপি তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বামীর সংকার ভালরূপ হইবে না, ইহা চিন্তা করিয়াই তিনি বিশেষ উদ্বিগ্না হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার শোক সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি গৃহস্থিত তৈজসাদি বন্ধক দিয়া স্বামীর সংকারের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ

করিলেন। সে দ্রব্য তিনি আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

যথাসময়ে প্রতিবাসিবর্গ সাধু কালাচাঁদের শব শ্মশানে সৎকার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সে সময় যদিও কালাচাঁদ-পত্নী স্বামী বিয়োগে অত্যন্ত শোকাকুলা, কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই! এই ভাবটি শ্যামাচরণের মাতাঠাকুরাণীর শেষ জীবন অবধি বর্ত্তমান ছিল। এরূপ প্রকাশ, তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি তিনি কখনও কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। নিজের দুঃখ কষ্ট, বিপদ আপদ ভুলিয়া কর্ত্তব্যকার্য্য তিনি হাসিমুখে সম্পাদন করিতেন। উত্তরকালে এই গুণ তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণে সম্পূর্ণ বর্ত্তিয়াছিল। বোধ হয়, এই গুণের ফলে তিনি সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, অবশ্য-কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

সাধারণ মানুষেও আমরা তাহা নিত্য দেখিতে পাই। সময় মত আহার করা কর্ত্তব্য। যদি আমরা আহারের সময় আহার না করিয়া, কিম্বা নিদ্রার সময়

নিদ্রা না যাইয়া--সেই সময় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট .য কোন কার্য্য করি না কেন—ঐ আহার না করা, নিদ্রা না যাওয়ার ফল আরব্ধ কার্য্য অপেক্ষা অতি ভীষণ কুফল প্রদান করিবে। প্রত্যেকের জীবনেই ইহা দেখা যায়।

যদি এরূপ মনে করা যায় যে, অর্থ ব্যয় করিয়া পুত্রকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত, কিম্বা কার্য্যক্ষম করিতে চেষ্টা না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই অর্থ রাখিয়া দেওয়া যাক--ভবিষ্যতে পুত্রকে দেওয়া যাইবে, তাহা হইলে এই কর্ত্তব্য-চ্যুতির ফল একদিন ভোগ করিতেই হইবে। অর্থাৎ পিতার কর্ত্তব্য পুত্রকে ভবিষ্যতের জন্য কর্ম্মক্ষম করিয়া দেওয়া; তাহা না করিলে পুত্রের জন্য যত অর্থই রাখিয়া দেওয়া যাউক, পুত্র তাহা দ্বারা কখনই সুখী হইতে পারিবে না। পিতাকেও তাহার জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে হইবে, ইহা কর্ত্তব্য-চ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্যামাচরণের সমস্ত জীবনের সমগ্র কার্য্যই গভীর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচায়ক। পৃথিবীর যে কোন মহৎ

ব্যক্তির জীবন কাহিনী বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কর্ত্তব্য-পরায়ণতাই তাঁহাদের প্রধান গুণ। ইহার দ্বারা তাঁহারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সময় শ্যামাচরণের মাতাঠাকুরাণী অগ্রে শোকার্ত্ত পুত্রগুলির আহারের ব্যবস্থা করিয়া, এবং তৎসহিত অন্য অন্য আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া বিষণ্ণ ভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবন সংগ্রাম

ক্রমে ক্রমে অশৌচান্ত হইয়া কোনওরূপে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। তখন ইঁহাদের সংসারে একমাত্র আশ্রয়-স্থল, উপার্জ্জনক্ষম পুত্র ভুবনচন্দ্র। আর অন্যান্য পুত্র সকলেই না-বালক এবং শিশু, তাহারা সংসারের সুখ দুঃখের মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং সাংসারিক কার্য্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অক্ষম।

শ্যামাচরণের পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার অগ্রজ ভুবনচন্দ্র যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন এবং তাঁহার মাতাঠাকুরাণী প্রতিবাসীদের বাটীতে ধান্য প্রভৃতি ভানিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে চাউল বা পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতেই কোনও প্রকারে সংসার চলিত। ইহাতে পেটের ভাত ও পরণের কাপড়ের অভাব হইত না।

ক্রমে শ্যামাচরণের মাতার হৃদয় হইতে শোকের প্রথম আবেগ হ্রাস পাইতে লাগিল। কারণ, তিনি

দেখিলেন, কেবল মাত্র শোকে মুহ্যমান হইয়া থাকিলে কোনও ফলই হইবে না—এই নাবালক শিশু গুলিকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি সেইজন্য অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এত বিপদের মধ্যেও এই তেজস্বিনী মহিলা তাঁহার পিত্রালয়ের সাহায্য-প্রার্থী হয়েন নাই।

কালাচাঁদের মৃত্যুরপর, এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইল। মাতা এবং পুত্র ভুবনের পরিশ্রমে একরূপ ভাবে সংসার চলিতে লাগিল। বিশেষ অভাব কিছুই রহিল না। তখন শ্যামাচরণের বয়স ৭ বৎসর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথের বযস ৪ বৎসর। সংসারে তখন পোষ্যগণের মধ্যে মাতা, শ্যামাচরণের ভ্রাতা ভুবন ও তাঁহার বালিকা পত্নী, রাম বল্লভ, শ্যামাচরণ ও শিশু রঘুনাথ। শ্যামাচরণের দুইটি ভগিনী ছিলেন। তাঁহারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে আগমন করিয়া মাতা এবং ভ্রাতা কয়টিকে দেখিয়া যাইতেন, কিন্তু বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থা হইতেন না।

শ্যামাচরণের মাতৃদেবীরও তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহ ছিল না। কন্যারা যে সুখে আছে, ইহাতেই তাঁহার প্রভূত আনন্দ ছিল।

যাহা হউক, এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইবার পর, শ্যামাচরণের জননীর জীবনাকাশে নিদারুণ বিপদের ঘন কৃষ্ণ মেঘজাল ছায়া বিস্তার করিল—বিপদের বজ্র গৰ্জ্জিয়া উঠিল। যে ম্যালেরিয়ার কঠোর পেষণে দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছিল, যে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দারুণ ম্যালেরিয়া এক্ষণে এই ক্ষুদ্র দরিদ্র সংসারের একমাত্র আশ্রয়, যাহার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া এতগুলি প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, শ্যামাচরণের ভ্রাতা ভুবনচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। প্রথম প্রথম অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। কিন্তু ভুবন তাহা তত গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার উপর সংসার চালাইবার ভার; সেইজন্য জ্বরের উপরই পরিশ্রম করিতে হইত। ফলে সেই জ্বর ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করিল। তখন তিনি কর্ম্মে অশক্ত হইয়া শয্যা-

শায়ী হইলেন। ইহাতে সংসারের অবস্থা ভীষণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

একে উপার্জ্জনক্ষম পুত্র রোগে শয্যাশায়ী, তাহার উপর এতগুলি লোকের গ্রাসাচ্ছাদন এবং সেই পীড়িত পুত্রের চিকিৎসা—কোথা হইতে এই এসমস্ত খরচ আসিবে—এই চিন্তায় জননী আকুল হইলেন, বালক শ্যামাচরণ তখনও শিশু; তখনও তাঁহার সাংসারিক কোন চিন্তা বা ভয় সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হয় নাই। কিন্তু বোধ হয়, তখন হইতেই তিনি মাতার উদ্বেগের বিষয় অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার মাতার শেষ বয়স পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টি ছিল—যাহাতে তাঁহার মাতা কখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্তা না হন। তিনি সর্ব্বদা এরূপভাবে কার্য্য করিতেন, যাহাতে তাঁহার মাতৃদেবী সর্ব্বদা তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকেন।

এইরূপ সময়ে তাঁহার মাতার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল—যে বিপদের ভয়ে তিনি শঙ্কিত হইয়াছিলেন, সেই বিপদের বোঝা তাঁহার মস্তকে পতিত হইল।

অতগুলি নিরীহ প্রাণীর একমাত্র আশ্রয়স্থল—যুবক ভুবনচন্দ্র, বিধবা মাতা, বালিকা পত্নী ও শিশু ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে শ্যামাচরণের মাতার মানসিক অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি তখন যেন অকূল সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকেই নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। তাঁহার শ্বশুরালয়ের দেবর ও ভাসুর প্রভৃতি কেহই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত নহেন। কেহই তাঁহার এই সমস্ত বিপদে সাহায্যের মঙ্গল হস্ত অগ্রসর করিয়া দেন নাই। এদিকে তাঁহার পিত্রালয় হইতেও উপযাচিকা হইয়া কোন সাহায্য তিনি গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু এরূপ বিপদের সময়েও এই অসীম ধৈর্য্যশীলা রমণী মুহ্যমানা না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যে মন নিবিষ্ট করিলেন। প্রবল মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া একমাত্র নিজের পরিশ্রম দ্বারা, তিনি কোন ক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এই সময় তাঁহার পুত্র রামবল্লভ প্রতিবাসীর বাটীতে সামান্য সামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিয়া কিছু কিছু

উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সংসারের কিছু কিছু সাহায্য হইতে লাগিল বটে; কিন্তু শ্যামাচরণের মাতার ভাগ্যে সে সময় সে সুখ টুকুও বেশী দিবস স্থায়ী হইল না। তাঁহার মস্তকে পুনরায় বিপদের বজ্র নিপতিত হইল। যে ম্যালেরিয়া রোগে শ্যামাচরণের পিতা কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় ও ভ্রাতা ভুবনচন্দ্র ইহ লোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার অপর ভ্রাতা রাম বল্লভও সেই দারুণ ব্যাধি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ভুবনচন্দ্রের মৃত্যুর ৮।৯ মাস মধ্যে তিনিও মৃত্যুর কবলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

ইহাতে শ্যামাচরণের মাতা যেন একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। নিদারুণ পুত্রশোকের উপর—বিষম চিন্তা,—এই কয়টি প্রাণীর জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করা। তিনি যে, সেই সময় কিকরিবেন, তাহার কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। তখন একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিজের শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কোন ক্রমে সকলের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান

করিতে লাগিলেন। শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা একমাত্র উপার্জ্জনের উপায় ধান ভানা।

যাহার বাটীতে ধান ভানিয়া চাউল করা আবশ্যক, তাহার বাটীতে গমন করিয়া, তাহাদের বাটীতে ধান ঢেঁকিতে ভানিয়া দেওয়া, কিম্বা অনেক সময় এরূপও হয় যে, কাহারও ধান্য বাটিতে আনয়ন করিয়া তাহা পরিশ্রম সহকারে চাউল প্রস্তুতের উপযুক্ত করিয়া, তৎপর তাহা হইতে চাউল বহির্গত করা। কেহ কেহ স্বগৃহে স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া ধান্যকে চাউল বহির্গত করিবার উপযুক্ত করিলে, কেবল তাহাদের বাটীতে গমন করিয়া তাহাদেরই ঢেঁকির দ্বারা চাউল বহির্গত করিয়া দিয়া আসা।

এরূপ প্রণালীতে লাভ অল্প, পরিশ্রমও অল্প। এতদঞ্চলে এই প্রকার ধান্যের কার্য্য দ্বারা বহু দরিদ্রা অনাথা স্ত্রীলোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এক্ষণে ক্রমশঃ চাউলের কল হওয়াতে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান্য হইতে চাউল বহির্গত করিবার প্রণালী প্রচলিত হওয়াতে এ দেশের অনেক দুঃস্থ দরিদ্রা

বিধবার জীবিকার উপায় বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে! ইহাতেও দেশের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে।

যাহা হউক, যে সময়ের কথা বলা হইতেছে অর্থাৎ শ্যামাচরণের বাল্যকালে—তখনও দেশ মধ্যে এরূপ ধান্য ছাঁটাই করিবার কল হয় নাই। এ সময় গ্রামের মধ্যে, গ্রামস্থ ধান্য ভানিয়া চাউল প্রস্তুত হইত এবং তাহাতে অনেক দুঃখী ও দরিদ্রার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। সেই কারণে তখন দারিদ্র্যের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

শ্যামাচরণের মাতার অন্য কোন উপায় আর ছিল না। সেই সময় এইরূপে ধান ভানিয়া তিনি অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সংসারে লোকের মধ্যে তিনি নিজে, তাঁহার একমাত্র বালিকা বিধবা পুত্রবধূ এবং তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণ ও কনিষ্ঠ পুত্র বালক রঘুনাথ। কিন্তু উপার্জ্জনকারিণী তিনি নিজে—একমাত্র উপজীবিকাও ধান্য ভানা।

কিন্তু এই তেজস্বিনী মহিলা এত বিপদের মধ্যেও— এত কষ্টের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচলিত, কোন দিবস তাঁহার আহার জুটে, কোন দিবস জুটে না। তাঁহাদের খড়ের ঘর আর মেরামত করা হয় না; তাহাতে বর্ষা কালে জল পড়ে। ধান ভানিয়া নিজেদের উদরান্নের সংস্থান করিবেন, না তাহা দ্বারা গৃহ মেরামত করিবেন? সেই জন্য তাঁহাদের বাসগৃহ সংস্কারভাবে ভগ্ন দশায় পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এরূপ সময়েও তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা, পূর্ব্বতেজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে লইতে কেহ আগমন না করিবে, তত দিবস তিনি পিত্রালয়ে গমন করিবেন না। বোধ হয়, উত্তরকালে তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণও যে, এইরূপ আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ছিলেন, তাহার শিক্ষা তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির

চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণের মাতাও সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কোনও ক্রমে আরও দুই বৎসর সেই নাবালক পুত্র দুইটি ও নিজ কন্যা স্থানীয়া বিধবা পুত্রবধূটিকে অতি কষ্টে, কেবল মাত্র নিজ পরিশ্রমলব্ধ যৎসামান্য উপার্জ্জন দ্বারা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চরম দুর্দ্দশা

সেই সময় তাঁহাদিগের আর একটি বিপদ উপস্থিত হইল। সে যুগে মধ্যে মধ্যে ঐ প্রদেশে বন্যা হইত। এই বান বর্ষাকালেই আসিত। যে বৎসর এই বন্যা প্রবল ভাবে ঐ প্রদেশ প্লাবিত করিত, সেবার ঐ প্রদেশে উপকার ছাড়া অপকার হইত না। কিন্তু ইহাতে দরিদ্রগণের সময় সময় বিশেষ কষ্ট হইত। তবে জনসাধারণের ক্ষেত্রজপণ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা কল্যাণ-প্রদই হইত। কারণ, এই বন্যার অবসানের পর ক্ষেত্রের উপর পলি পড়িত; তাহাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইহাতে শস্য খুব বেশী পরিমাণে জন্মিত। গ্রামের মধ্যে বন্যার জল প্রবেশ করিয়া গ্রামস্থ আবর্জ্জনা এবং দূষিত পদার্থ সকল ধৌত করিয়া লইয়া যাইত; তাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত।

যে দিন হইতে বঙ্গদেশের এই প্রান্তে রেলের বাঁধ দ্বারা এইরূপ জল প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া নদী খাল বিল প্রভৃতি মজিয়া উঠিয়াছে, সেই দিন হইতেই এই প্রদেশ অস্বাস্থ্যের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে এবং জমির উর্ব্বরতা-শক্তি হ্রাস পাইয়াছে ; ফলে লোকের অন্নকষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রামের মধ্যে বর্ষাকালে জল প্রবেশ করিলে দরিদ্র-দিগের কষ্ট হইত। অনেকের সে সময় কোন কার্য্য থাকিত না এবং তাহাদের কাহারও কাহারও জীর্ণ গৃহও পতিত হইত।

সে বৎসর এই বন্যা কিঞ্চিৎ প্রবল ভাবে শ্বেতপুর গ্রামে প্রবেশ করিল। তাহাতে অন্য কাহারও বিশেষ ক্ষতি হউক আর না হউক, দরিদ্র শ্যামাচরণের বিশেষ ক্ষতি হইল। সেই বন্যার প্লাবনে তাঁহাদিগের একমাত্র জীর্ণ গৃহ ভূপতিত হইল। এত দিবস তাঁহাদের অন্ন কষ্ট সত্ত্বেও একটু আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই আশ্রয় স্থানও নষ্ট হইল। বোধ হয়, ইহা সেই লীলা-ময়েরই ইচ্ছা। বোধ হয়, শ্যামাচরণকে শিক্ষা দিবার

জন্যই লীলাময় তাঁহাকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া দেখাইয়া দিলেন—নিরাশ্রয় লোকের কিরূপ কষ্ট হয়, গৃহহীন লোককে কিরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। তাই বোধ হয়, সেই শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া উত্তরকালে শ্যামাচরণ বহু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, বহু গৃহহীনের গৃহনির্ম্মাতা-রূপে মুক্তহস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

উত্তর কালে যে সময় তিনি কোটীপতি, সে সময় যে কেহ বিপদগ্রস্ত দরিদ্র, গৃহশূন্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন, তিনি মুক্ত-হস্তে তাহার গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি এ গুণ তাঁহার পুত্রগণেও বর্ত্তাইয়াছে। তাঁহার পুত্র রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর কিম্বা হরেন্দ্রনাথ বল্লভ প্রভৃতি, কোন স্থানে কোন গৃহশূন্য ব্যক্তির বিষয় যদি শ্রবণ করেন অর্থাৎ অগ্নিদাহে অথবা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে কাহারও গৃহ নষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিলে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা তাহাদের সাহায্যের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। এই সকল গুণ যে কৌলিক গুণ হিসাবে

তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র-স্বভাব পিতা হইতে অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

এই সময় শ্যামাচরণের মাতৃদেবী একবারে মুহ্যমানা হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বের ভীষণ বিপদও যাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুতা করিতে পারে নাই, এইবার তিনি একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। কারণ, গৃহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইতে হইল। হয়ত একাকিনী হইলে তাঁহার সেরূপ চিন্তা থাকিত না; কিন্তু তাঁহারা চারিটি প্রাণী কোথায় মাথা গুঁজিয়া থাকিবেন? কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পরগৃহবাসী হইতে হইল।

একে গৃহপতনের সহিত তাঁহাদের অনেক দ্রব্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; যাহা ছিল, তাহা পরের বাটীতে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু এভাবে কত দিবস আর অন্যের কাছে দ্রব্যাদি রাখা যায়, এবং তাহারাই বা চিরকাল রাখিবে কেন? তাহার উপর জীবিকারও কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই। পুত্রগণের বাল-সুলভ চপলতাও আছে, তাহাতেও অপরে বিরক্ত হয়। বিশেষতঃ দরিদ্রের

দোষই সাধারণের কাছে বড় হইয়া দেখা দেয়—ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম। কাজেই শ্যামাচরণের জননী পরগৃহবাসিনী হইলেও, তজ্জনিত দুঃখ এবং আপনার উপায়হীনতা প্রতিদিনই তাঁহার মর্ম্মস্থলকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

আশার আলোক

সেই সময় বোধ হয় দয়াময়ের আসন টলিয়া উঠিল। তিনি বোধহয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এতদিন অবধি এই আশ্রয়হীন বিধবার পিতৃকুলের কেহই তাঁহার কোন অনুসন্ধান করেন নাই। তিনিও আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিয়া কোনদিন পিতৃকুলের নিকট কোন সাহায্যপ্রার্থী হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে বোধহয় সেই দয়ামমের ইচ্ছায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ অবগত হইলেন যে, তাঁহাদের একমাত্র স্নেহের সহোদরা কিরূপ কষ্টে পতিত হইয়া নিদারুণ দুঃখে দিন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদের ভগিনী স্বামী ও পুত্রের শোকে অধীরা হইয়া প্রাণ ভানিয়া নাবালক পুত্রগণ সহ অতি শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছিলেন। অধুনা বন্যা-পীড়নে আশ্রয়-গৃহ হইতে বিচ্যুতা হইয়া নিরাশ্রয়া অবস্থায় পরগৃহবাসিনী।

এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রাতারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া গ্রামের ৺রামকুমার গাইন মহাশয় শ্যামাচরণের মাতামহ। এই রামকুমার গাইন মহাশয়ের ছয়টি পুত্র। শ্যামাচরণের মাতুলগণ যদিও সে সময় ধনকুবের ছিলেন না বটে, কিন্তু মোটামুটি গৃহস্থ হিসাবে তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। তাঁহারা সকলেই কোন না কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন।

ধান্যকুড়িয়ার প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এতদঞ্চলের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল, বাদুড়িয়া নামক স্থানে তাঁহাদের একখানি বৃহৎ দোকান ছিল। তখন এ প্রদেশে চরকার সূতার ও তাঁতের কাপড়ের বহুল প্রচলন ছিল। বিলাতী সূতা বা বস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল না। সেই চরকা ও তাঁতের প্রচলন ইদানীং বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এ প্রদেশের বহুলোক নিরন্ন হইয়া দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা সে যুগে তাঁত ও

চরকার সূতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছে—বিলাতী সূতা ও বস্ত্রের বহুল প্রচলন ফলে অধুনা তাহাদের বংশধরগণ কিরূপ দুর্দ্দশায় জীবন যাপন করিতেছে, তাহার প্রমাণ অসংখ্য ভাবে উপস্থাপিত করিতে পারা যায়।

সে সময়ে কতকগুলি লোক দূরবর্ত্তী কোন বড় হাট বা গঞ্জ হইতে তুলা খরিদ করিয়া আনিয়া তাহা গৃহস্থের বাটীতে বাটীতে দিয়া তদ্দ্বারা সূতা তৈয়ার করিয়া লইত। অনেক গরীব গৃহস্থ পরিবারের স্ত্রীলোক-গণ সে যুগে তাঁহাদের অবসর সময়ে চরকার দ্বারা সূত্র প্রস্তুতকার্য্যে লিপ্ত হইতেন। এই উপায়ে তাঁহাদের যে অর্থার্জ্জন হইত, তাহা দ্বারা তাঁহারা সংসারের অনেক সাহায্য করিতে পারিতেন। এমন কি অনেক স্ত্রীলোক এই একমাত্র চরকার সাহায্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, তীর্থ ভ্রমণ, দান প্রভৃতি বহু পুণ্য কর্ম্ম করিয়াও গিয়াছেন।

অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার অবস্থা-বৈগুণ্যে দুর্দ্দশার চরম স্তরে উপনীত হইয়া যখন জীবিকা

নির্ব্বাহের কোন উপায় দেখিতে পাইতেন না, তখন পরিবারস্থ সকলে একমাত্র চরকাকে অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ শত শত স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেজন্য বাঙ্গালার প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে—

"চরকা আমার স্বামী পুত্র চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী।"

চরকার দ্বারাই দেশের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি ও অভাব পূরণ এদেশে ঘটিয়াছে। এদেশের কোটি কোটি টাকা তখন বিদেশের ধন ভাণ্ডার স্ফীত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিত না। আমাদের বস্ত্র-শিল্প তখন ম্যানচেষ্টারের কবলে পড়িয়া আত্মহত্যা করে নাই।

যাহা হউক, ঐ সময়ে শ্যামাচরণের মাতুলগণের চরকার সূতার ও অপর একটি ব্যবসায় ছিল। দূর দেশ হইতে তূলা ক্রয় করিয়া আনিয়া তাঁহারা ঐরূপ সূতা প্রস্তুত কারিণীদিগের নিকট হইতে সূতা প্রস্তুত করাইয়া সেই সূতা পুনরায় বিক্রয় করিতেন।

তাহাতেও তাঁহাদের কিছু আয় ছিল। এইরূপ নানা প্রকার ব্যবসা দ্বারা তাঁহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল।

সহোদরা ও ভাগিনেয়গণের দারুণ শোচনীয় সাংসারিক অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে ধান্যকুড়িয়ায় নিজেদের নিকট আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এতদিনে শ্যামাচরণের মাতার প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ হইল। তাঁহাদের প্রেরিত লোকের সহিত শ্যামাচরণের মাতা তাঁহার দুই পুত্র শ্যামাচরণ ও রঘুনাথকে লইয়া পিত্রালয় ধান্যকুড়িয়ায় আগমন করিলেন।

উত্তরকালে এই ধান্যকুড়িয়াই শ্যামাচরণের বাসভূমি এবং কর্ম্ম ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এই ধান্যকুড়িয়া গ্রামে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী পুত্রসহ শ্যামাচরণ তাঁহার কর্ম্মময় আদর্শ-জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এই খানেই অন্তিম-শয্যায় শয়ন করিয়া শ্যামাচরণ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন। যে দিন হইতে আত্মনির্ভরশীল,

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, বিবিধ সৎগুণ মণ্ডিত, নিরহঙ্কার, নিষ্পাপ, লোভশূন্য শ্যামাচরণ এই স্থানে আগমন করিয়া এই ক্ষুদ্রগ্রাম ধান্যকুড়িয়াকে নিজ কর্ম্মভূমি ও বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই এই গ্রাম ২৪পরগণা জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছে। মহতের পাদস্পর্শে নগণ্য স্থানও প্রখ্যাত হইয়া উঠে, ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম।

শ্যামাচরণের বাল্যকালে তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কেহ দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, শ্যামাচরণের পিতা কালাচাঁদ বল্লভের জীবিত কালে, যখন তাঁহারা নানারূপ সাংসারিক দুঃখে যাপন করিতেন, সেই সময় বিবিধ সাংসারিক অনাটনে কালাচাঁদপত্নী কখনও কখনও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। কালাচাঁদ একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ভগবানকে চাহিলে না। আমি বলিতেছি তোমার দুঃখ থাকিবে না, তুমি রাজমাতা হইবে।"

দেখা যায়, ভবিষ্যতে তাঁহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল। উত্তরকালে কালাচাঁদের পত্নী,

শ্যামাচরণের মাতা, রাজমাতার ন্যায় সুখে এবং সম্মানে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদিন যাঁহাকে আশ্রয় অভাবে পরগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল, আবার সেই নারী একদিন নিজ পুত্রের দ্বারা নির্ম্মিত বিরাট অট্টালিকায়, চতুর্দ্দিকে দাসদাসী পরিবৃত হইয়া রাজ-মাতার ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। একদিন যে নারী পরের দ্বারে ধান্য ভানিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তিনিই আবার নানারূপ অমৃততুল্য সুখাদ্য দ্বারা নিজের এবং পরের তৃপ্তি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্যামাচরণ সম্বন্ধে আর একটা ভবিষ্যৎ বাণী আছে। যে সময় তাঁহারা শ্বেতপুর গ্রাম হইতে ধান্যকুড়িয়ায় আগমন করেন, তখন তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মাতুলালয়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, উক্ত গ্রামের বহু পুরাতন অধিবাসী মণ্ডল দিগের স্থাপিত গ্রাম্য-দেবতা মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতে যান। সেই সময় বহুদূরাগত সংসারত্যাগী এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব অতিথি-রূপে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন।

দেবতাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই বৈষ্ণবের উপর শ্যামাচরণের মাতার দৃষ্টি পড়িল। তখন তিনি পুত্র-গণকে উক্ত সাধুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। মাতৃ আদেশে শ্যামাচরণ সেই বৈষ্ণবকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সাধু তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য বদনে শ্যামাচরণের মাতার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "মা আমি বলিতেছি তোমার এই পুত্রটি অতি সুলক্ষণ যুক্ত। ভবিষ্যতে এই পুত্র সুখী হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা

মাতুলালয়ে আগমনকালে শ্যামাচরণের বয়স নয় কিংবা দশ বৎসর মাত্র হইবে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথের তখন বয়ঃক্রম প্রায় সাত বৎসর। যাহা হউক, মাতুলালয়ে আগমন করিয়া বালক শ্যামাচরণ তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ধান্যকুড়িয়ার নিকটস্থ নদীয়া নামক গ্রামে পীতাম্বর সরকার মহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিবার জন্য প্রেরিত হইলেন।

তখন এ প্রদেশে বালকগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোন স্কুল ছিল না। গ্রামে গ্রামে গুরুমহাশয়দিগের দ্বারা চালিত এক একটি পাঠশালা ছিল। সাধারণ লোক তাহাতেই সামান্য কিছু বাঙ্গালা সাহিত্য এবং শুভঙ্করীর অঙ্ক শিক্ষা করিয়া একরূপ শিক্ষিত হইত। যদি কেহ উচ্চশিক্ষা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহা হইলে তাহাকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে

হইত। উচ্চ শিক্ষালাভ-প্রচেষ্টা সে যুগে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সৎচাষী সম্প্রদায় সে সময় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসায় বুদ্ধিই বিশেষ প্রখর ছিল। উহাই তাঁহারা ভাল বুঝিতেন এবং এই দেশের প্রায় সমস্ত ব্যবসাই তাঁহাদের হস্তগত ছিল। ইহা দ্বারা তাঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

সৎচাষী সম্প্রদায় ব্যবসায়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও অধুনা মাড়োয়ারীগণের আগমনে এই সম্প্রদায়ের অনেকে স্বাধীন ব্যবসা কার্য্য ত্যাগ করিয়া বিশ্ব বিদ্যা-লয়ের ডিগ্রির মোহে মুগ্ধ হইয়া পিতৃ পিতামহের অবলম্বিত কার্য্য ছাড়িয়া দিতেছেন—এখন তাঁহারা দাসখত লিখিয়া পরের কাছে আত্মবিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্যামাচরণ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমি শ্বেতপুর গ্রামে অবস্থানকালে সেখানেও নিকটস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। তথায় সামান্য অক্ষর পরিচয় হইয়া-

ছিল এবং সটকিয়া কড়াঙ্কিয়া প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মাতুলালয়ে আসিবার পরে শ্যামাচরণ ২।৩ বৎসরের বেশী পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার জীবনে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা এই পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত যে শিক্ষার বিকাশ তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল, মনুষ্যদত্ত শিক্ষা তাহার কাছে অতি তুচ্ছ।

হিন্দু জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে। পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলে মানুষ পরজন্মে কোন বিশিষ্ট শিক্ষার অভাবেও জগতে স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত অজস্র রহিয়াছে। সেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে, শ্যামা-চরণ লৌকিক উচ্চ শিক্ষার অভাবেও ইহজগতে স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই তিনি সদাচারী, বিনয়ী, চরিত্রবান, ধর্ম্মশীল, পরিশ্রমী হইয়া ছিলেন। আত্মনির্ভরশীলতা, প্রিয়বাদিতা, দয়া, মমতা স্বতঃই তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছিল। এজন্য বিদ্যা-লয়ের শিক্ষার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় নাই। প্রত্যেক মনীষী, অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনের

এই বৈচিত্র্য জন্মান্তর বাদের সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়া থাকে।

মহাপুরুষগণের জাবন চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভে ধন্য হইয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। আধুনিক জগতে বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে উপাধি দান করিতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে সকলেই উচ্চাঙ্গের প্রতিভার অধিকারী ইহা কি স্বীকার করা যায়? পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের দ্বারাই এক একজন বিশ্ব-বিশ্রুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, নানক, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত নহেন। এমন কি ইঁহাদের মধ্যে অনেকে একরূপ নিরক্ষর। কিন্তু তাঁহারাই জগতের আদর্শ মহাপুরুষ। আজ পৃথিবীর কোটি কোটি মানব সেই নিরক্ষরদিগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ধন্য হইতেছে।

শ্যামাচরণ বাল্যকাল হইতে সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। অবশ্য রাগ রাগিণী, তাল মান লয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি

রীতিমত কোন শিক্ষা লাভ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ নিসৃত সঙ্গীতে মানুষ মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার সমবয়স্ক বৃদ্ধগণের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে যখন বালকগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্ত-নের অনুকরণে গান করিত, শ্যামাচরণ সেই দলে থাকিলে তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত সঙ্গীতে বয়স্কগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িতেন।

এ স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, সৎচাষী সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। মহাপ্রভু প্রচারিত নাম কীর্ত্তন ইঁহাদের ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। এজন্য অবসবকালে বয়স্কগণ ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত হরি সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বালকগণও বয়োজ্যেষ্ঠ-দিগের অনুকরণে প্রায়ই সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিত।

এই গুণ শ্যামাচরণের অনুজ রঘুনাথেও বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় শোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত বালক শ্যামাচরণের অবয়বে এমন একটা লাবণ্যের জ্যোতিঃ ছিল যে, দর্শক

তাহাকে দেখিবামাত্রই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তাঁহার কমনীয়তা ও সুকণ্ঠের জন্য সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিত, বালবাসিত।

তাঁহার বাল্যের এই দৈহিক কমনীয়তা বার্দ্ধক্যেও ম্লান হয় নাই। তাঁহার দৃষ্টি শক্তিতে এমন একটা আকর্ষণ ছিল, এমন একটা পবিত্রতা নয়নে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত যে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে গিয়া কেহ তাঁহার দৃষ্টি-শক্তির প্রভাব-মুক্ত হইতে পারিতেন না। এমনও শুনা গিয়াছে যে, তাঁহার শত্রুও শ্যামাচরণের সেই দীপ্তিশালী নয়নের কমনীয় দৃষ্টিপাতে বিমুগ্ধ হইয়া শত্রুতা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে পরম মিত্রভাবে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

আর একটি গুণ বাল্যকাল হইতেই শ্যামাচরণের কার্য্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার করণীয় কোন কর্ত্তব্য অসম্পাদিত থাকিতে তিনি কখনও বৃথা সময় অতিবাহিত করেন নাই। অগ্রে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া তারপর ক্রীড়া কৌতুকাদি কার্য্যে যোগ

দিতেন। পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসকালে যখন অন্যান্য বালক স্ব স্ব অবশ্য-কর্ত্তব্য পাঠে অবহেলা করিয়া অবসর কালে ক্রীড়ায় মত্ত হইত, বালক শ্যামাচরণ সেই সময়ে নিজের কর্ত্তব্য নিবিষ্ট মনে সমাপন করিতেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পন্ন না হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বালকের দলে যোগদান করিয়া ক্রীড়া করিতেন না।

উত্তরকালেও যখন তিনি উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি কখনও কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া কোনরূপ আনন্দে যোগদান করেন নাই। বোধহয়, এইরূপ একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ-তাই তাঁহাকে উত্তরকালে উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিল। শ্যামাচরণের আরও একটি গুণ ছিল, তিনি যখন যে কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, তাহা গভীর নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। কখনও তাহা চঞ্চল মনে 'যেন তেন প্রকারেণ' ভাবে সম্পন্ন করিতেন না। তন্ময়তা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে আত্ম-প্রকাশ করিত।

পাঠশালা পরিত্যাগের পর কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের আশায় যখন তিনি চট নির্ম্মাণ-কল্পে পাট হইতে সূতা তৈয়ার করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই তন্ময়তা তাঁহাকে সাফল্য দান করিয়াছিল। তৎকালে বঙ্গদেশে কোনস্থানে চটের কল ছিল না। সে সময়ে লোক পাট হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহা দ্বারা গৃহে তাঁতে চট প্রস্তুত করিত। এদেশে কল হইবার পূর্ব্বে, এই হস্তচালিত তাঁতে হস্তদ্বারা রচিত পাটের সূত্র সহযোগে চট নিৰ্ম্মিত হইয়া দেশ বিদেশে রপ্তানী হইত। তাহাতে এ দেশের বহুলোকের অন্ন সংস্থানের উপায় ছিল। এই কুটীর শিল্পের সাহায্যে অনেকে তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিত।

বালক শ্যামাচরণও সেই সময় মাতুল পরিবারের সাহায্যকল্পে এই পাটের সূত্র নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহকর্ম্মী যাঁহারা ছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহাদের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা সকলে একত্রে সূত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও শ্যামাচরণের

সূত্র তাঁহাদের রচিত সূত্র অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইত। তাঁহাদের নির্ম্মিত সূত্রের তুলনায় শ্যামাচরণের হস্তপ্রস্তুত সূত্র অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

অন্য অন্য ব্যক্তি সূত্র নির্ম্মাণকালে নানারূপ গল্প করিত; কিন্তু দেখা যাইত, বালক শ্যামাচরণ একাগ্র মনে, নিবিষ্ট-চিত্তে সূত্রবয়ন কার্য্যে নিযুক্ত। পার্শ্ববর্ত্তী কর্ম্মীদিগের হাস্যপরিহাস, গল্পগুজব সে সময় যে তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার তন্ময়তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেছে, তাহার কোন বাহ্য প্রকাশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ব্বাভাস

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মাতুলালয়ে আশ্রয়লাভ করিবার পরেও শ্যামাচরণ ভালরূপে বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা পান নাই। তাঁহার জননী দেখিলেন যে, তাঁহার সহোদরগণ তাঁহাকে যত্ন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, কিন্তু ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহার আগমনে তেমন সন্তুষ্ট নহেন।

বুদ্ধিমতী শ্যামাচরণের জননী আরও বুঝিতে পারিলেন যে, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইবার বীজ ধীরে ধীরে পিতৃ-সংসারে অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবিত হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে। দীর্ঘকাল ভ্রাতৃত্বের মধুর বন্ধন আর তাঁহার সহোদরগণের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিবে না বলিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

দূরদর্শিনী, বুদ্ধিমতী নারী বুঝিতে পারিলেন, এখন হইতে সাবধান না হইলে, ভবিষ্যতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথকান্ন হইলে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। বিশেষতঃ কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয়ও নহে। সেইজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়া পুত্রকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিতে চেষ্টা কবিতেছিলেন।

বুদ্ধিমান বালক শ্যামাচরণও তাঁহার মাতার অভি-প্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং তিনিও মনে মনে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার নিমিত্ত পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের নিমিত্ত অথকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিবাব জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কারণেই ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইতে পারে নাই।

তাঁহার মাতুলগণও মনে কবিয়াছিলেন যে, ইহাকে আব অনর্থক পাঠশালায় পাঠাইয়া কোন লাভ নাই। তাহা অপেক্ষা ইহার দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করাইয়া লইলে সংসারের সাহায্য হইবে।

দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তৎকালে সৎচাষী সমাজে লেখাপড়া শিক্ষার তাদৃশ প্রচলন ছিল না। এই সমাজের লোকগণ বালকগণকে কোনরূপে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে ব্যবসা কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিত। এই সম্প্রদায়ের লোকগণ বাল্যকাল হইতেই ব্যবসাক্ষেত্রে কিম্বা কৃষিকার্য্যে অবতীর্ণ হইত বলিয়াই তাহারা ভবিষ্যতে ভাল ব্যবসাদার কিম্বা উৎকৃষ্ট কৃষকরূপে জীবন সংগ্রামে সাফল্যলাভও করিত। তবে সে সময়ে পাঠশালার শেষ শিক্ষা অনেক বালকই সমাপ্ত করিত। কিন্তু উল্লিখিত নানা কারণে শ্যামাচরণের ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তখন শ্যামাচরণের মাতুলগণ যদিও গৃহে একান্নবর্ত্তী পরিবাররূপে বাস করিতেন; কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে সকলেই তখন পৃথক। পাটের সূতা এবং তাহা হইতে চট প্রস্তুত করিবার ব্যবসাটি ছিল তাঁহাদের পৈতৃক। বাহুড়িয়া গঞ্জে তাঁহাদের যে বড় দোকান ছিল, তাহা প্রথমে সকল

ভ্রাতার সমবেত চেষ্টার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে ভ্রাতৃগণের মনোমালিন্য ঘটিলে তাহা হইতে কেহ কেহ পৃথক্ হইয়া যান।

বিশেষতঃ শ্যামাচরণের মাতুলগণের মধ্যে গোবিন্দ চন্দ্র গাইন মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং উন্নতিকামী ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ভ্রাতাদিগের মনোভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। তাহা ছাড়া বাদুড়িয়া গঞ্জস্থিত মাত্র একখানি দোকানের আয়ের দ্বারা সকলের স্বচ্ছলরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ হওয়াও সম্ভবপর নহে।

আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি পূর্ব্ব হইতেই সংকল্প স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই তিনি বাদুড়িয়া দোকান হইবার কিছুদিন পরেই তাঁহার অংশের সমস্ত অর্থ পৃথক করিয়া লইয়া, স্বতন্ত্রভাবে যদুরহাটী নামক গ্রাম নিবাসী কায়স্থ বংশীয় বাবু নিমাই চরণ দের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতায় কারবার করিতে গমন করেন।

শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি পাটের আড়ত স্থাপন করিয়া সেই সঙ্গে তাঁহারা ভুষি মালের কারবার প্রভৃতিও করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তাঁহারা ক্রমশঃ বেশ লাভবান হইতে লাগিলেন। এদিকে গোবিন্দ-চন্দ্রের অন্য অন্য ভ্রাতা বাছুড়িয়া মোকামের দোকানের কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের যাহা খরচ আবশ্যক, তাহা সকল ভ্রাতাই সমভাবে বহন করিতে লাগিলেন।

এ স্থানে ধান্যকুড়িয়া গ্রামের অপর একটি বংশের এক ব্যক্তির বিষয় আলোচনা অত্যাবশ্যক। শ্যামা-চরণের জীবন-কাহিনী বুঝিতে হইলে ধান্যকুড়িয়া গ্রামের অপর দুইজন লোকের সম্বন্ধে অল্প বিস্তর আলোচনা না করিলে শ্যামাচরণের জীবনকাহিনী সুসম্পন্ন হইবে না। এই তিনটি পরিবারের ভাগ্যলক্ষ্মী সমসূত্রে গ্রথিত।

এই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন শ্যামাচরণ স্বয়ং দ্বিতীয় গোবিন্দচন্দ্র গাইন এবং তৃতীয় ব্যক্তি, পতিত পাবন সাউ। এই তিন ব্যক্তির ভাগ্যসূত্র এক সঙ্গে গ্রথিত হইয়া তাঁহাদিগকে উন্নতির শিখরে তুলিয়াছিল।

তবে সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমসূত্রে অদৃষ্ট লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদপূত অন্য দুইজন ভাগ্যমান ব্যক্তি নির্লোভ শ্যামাচরণকে প্রাপ্ত হইয়া আরও উন্নত হইয়াছেন। যথাস্থানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। পতিতপাবন এই ধান্যকুড়িয়া গ্রামের একজন অধিবাসী। তাঁহার আকৃতি অতি মনোরম। প্রিয়দর্শন বলিয়া গ্রামের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাল্যকাল হইতেই চরিত্রবান, ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধি আছে।

পতিতপাবন যেমন সুদর্শন তেমনই বুদ্ধিমান ছিলেন। মানুষকে দেখিয়া তাহার অন্তরের কথা পাঠ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। বালক শ্যামাচরণের ভিতর ভবিষ্যৎ উন্নতির লক্ষণ বিদ্যমান, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পতিতপাবন সাউ প্রথম বয়সে আড়বেলিয়া বসুবাবুদিগের জমিদারীতে খাজানা আদায়কারী কর্ম্মচারী

ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের সাধুতা দর্শনে আড়বেলিয়ার বসু বাবুরা তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, ভাল বাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। কখনও আলস্যপরতন্ত্র হইয়া কালযাপন করা পতিতপাবনের প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না। তাঁহার নিরূপিত কার্য্যের অবকাশকালে, তিনি অন্য লোকের ন্যায় আলস্যে কালহরণ না করিয়া সামান্য সামান্য ব্যবসা দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। চরকার সূতাই ছিল তাঁহার এই ব্যবসায়ের মূল উপাদান। এইরূপে তিনি মধ্যবিত্ত সম্পন্ন গৃহস্থ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

তৎপরে সে যুগের দেশীয় পাট ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী, কলিকাতা কপালিটোলার ললিত-মোহন দাস মহাশয় ধান্যকুড়িয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বাদুড়িয়া গঞ্জে পাট খরিদের জন্য একটি মোকাম প্রতিষ্ঠা করায়, পতিতপাবন সামান্য পরিমাণ পাট খরিদ করিয়া ললিত বাবুর মোকামে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজ সঞ্চিত অর্থে সঙ্কুলান না হইলে পতিতপাবন ললিত বাবুর গদি হইতে সামান্য

পরিমাণ টাকা ঋণস্বরূপ লইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন যে, যথাসময়ে গদিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট সরবরাহ করিতে না পারিলে, অথবা যদি পাট সংগ্রহ মোটেই না হইত, তাহা হইলে সমস্ত টাকা গদিতে জমা করিয়া দিতেন। এইরূপ সদ্ভাবে এবং বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য সম্পাদন করাতে ক্রমশঃ ললিতবাবুর গদিতে পতিতপাবনের সুনাম ও যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তখন সামান্য পরিমাণ টাকার পরিবর্ত্তে ইচ্ছামত মোটা টাকা তিনি অগ্রিম পাইতে লাগিলেন। এমন কি প্রয়োজন মত, দশ হাজার কিম্বা বিশ হাজার পর্য্যন্ত টাকাও পতিত বাবু ললিত বাবুর গদি হইতে লইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থের মোহ কোনও দিন তাঁহার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে নাই। পূর্ব্ব বিশ্বাস ও ধর্ম্ম তিনি অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিলেন।

এইরূপে পতিতপাবন ক্রমে বেশ লাভবান হইয়া কিছু অর্থশালী হইলেন। তখন তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিছু দিবস পরে কোন কারণে ললিত বাবুর বাদুড়িয়ার মোকাম বন্ধ হইয়া

গেল। ক্রমশঃ তাঁহার যেখানে যত পাটের মোকাম ছিল সমস্তই অচল হইল। ললিতমোহন দাসের পাটের কারবার উঠিয়া যাওয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন পতিতবাবু।

এদিকে উক্ত হইয়াছে, গোবিন্দচন্দ্র গাইন মহাশয় যত্নুরহাটী গ্রাম নিবাসী বাবু নিমাইচরণ দের সহিত সম্মিলিত ভাবে যে কারবার করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহারা বেশ লাভবান হইতেছিলেন। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ নিমাই বাবু পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার হঠাৎ পরলোক গমনে তাঁহার পুত্র পরের কথায় প্ররোচিত হইয়া গোবিন্দবাবুর নিকট হইতে নিমাই বাবুর অংশের সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়া পৃথকভাবে কারবার আরম্ভ করিলেন।

তখন গোবিন্দ গাইন মহাশয় বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইলেন। কাবণ, তাঁহার কারবারের মূলধন হইতে অর্দ্ধেক টাকা বহির্গত হইয়া গেল। তাহাতে তাঁহার কারবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। গোবিন্দ গাইন মহাশয় ইচ্ছা করিলে, সে সময়ে নিমাই বাবুর

পুত্রকে ফাঁকি দিতে পারিতেন। কারণ, তাঁহাদিগের ভিতর লেখা পড়া কিছুই ছিল না এবং এই কারবার একমাত্র গোবিন্দ গাইন মহাশয়ের নামানুসারে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ধর্ম্মভীরু ব্যবসায়ী, সেরূপ অধর্ম্মের কার্য্য না করিয়া নিমাই বাবুর পুত্রকে তাঁহার অংশ মত সমস্ত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের কারবারের যে সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ছিল, তাহাও অংশ মত নিমাই বাবুর পুত্রকে গোবিন্দচন্দ্র অর্পণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবার পর, গোবিন্দ বাবু বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। কি প্রকারে অন্য অংশী ও তৎসহ মূলধন সংগ্রহ করিয়া কারবারটিকে বজায় রাখিবেন, এই দুশ্চিন্তায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। এদিকে যে সময় গোবিন্দ বাবুর এইরূপ অবস্থা, সে সময় ললিতমোহন দাসের কারবার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পতিত বাবুও কি করিবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল।

এই সময় উভয়ই পরস্পরকে স্মরণ করিলেন। গোবিন্দ বাবু দেখিলেন যে, পতিতপাবন অতি সচ্চরিত্র

ব্যক্তি; ললিত বাবুর সহিত দীর্ঘকাল কারবারসূত্রে থাকিয়া কখনও কোনরূপ প্রবঞ্চনা, শঠতা বা অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। পতিত বাবুও দেখিলেন যে, গোবিন্দ গাইন মহাশয় অতি সাধু ব্যবসাদার। তিনি ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে তাঁহার অনভিজ্ঞ অংশীদারের পুত্রকে ফাঁকি দিয়া নিজে বহু অর্থের মালিক হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া, তাঁহার মৃত ভাগীদারের প্রাপ্য মূলধনাদি পুত্রকে প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর পতিতপাবন গোবিন্দ গাইন মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থ গোবিন্দ গাইনের কারবারে নিযুক্ত হইল, পতিতপাবন গাইন মহাশয়ের অংশী হইলেন। জননী সমভিব্যাহারে শ্যামাচরণ মাতুলালয়ে আসিবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সময়ে ধান্যকুড়িয়া গ্রামের মধ্যে পতিত বাবুই অর্থশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গোবিন্দ গাইন মহাশয়ের কারবারে তাঁহার যে পরিমাণ মূলধন ছিল, পতিতপাবনের নিযুক্ত অর্থ

তাহার তুলনায় অধিক। সুতরাং উক্ত কারবারে পতিতপাবনের অংশের পরিমাণমূল্য অধিক হইয়াছিল।

কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কারবার চলিতে থাকিলেও কোনপক্ষ হইতে কোন-প্রকার রেজেষ্ট্রি দলিল দ্বারা অথবা লিখিত বিবরণ পত্রের দ্বারা, কাহার কি অংশ হইল তাহার ব্যবস্থা হয় নাই। শুধু মুখের কথায় স্ব স্ব অংশ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পতিতপাবন ও গোবিন্দ গাইন মহাশয়ের জীবদ্দশায় এবং তাহারও পরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই মৌখিক চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে যাহার অংশমত টাকা লইয়াছেন। ইহা লইয়া কোনওদিন তাঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মনোমালিন্য ঘটে নাই—বিবাদ বিসম্বাদ ত দূরের কথা।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, কারবারের মধ্যে ধর্ম্মভাব না রাখিলে কারবারে কখনও উন্নতি হয় না, উহা স্থায়ীও থাকে না। গোবিন্দচন্দ্র ও পতিতপাবনের সম্মিলিত ক্ষুদ্র কারবারই ভবিষ্যতে একমাত্র শ্যামা-চরণের তীক্ষবুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতাতেই এখনও পর্য্যন্ত

পি, জি, ডবলু সাউ নামক প্রায় কোটী টাকা মূলধনের বৃহৎ কারবারে পরিণত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রগণ কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে শতবর্ষ-ব্যাপী উন্নতিশীল বিরাট কারবারের সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রভাগে গণনীয়। এই যৌথ কারবার বাঙ্গালী জাতির যে গৌরব স্থল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কারবারের উন্নতির মূলীভূত কারণ, সেই পিতৃগৃহচ্যুত নিঃস্ব, দরিদ্র, পরান্নপ্রতিপালিত শ্যামাচরণ। তিনিই তাঁহার কর্ম্মজীবন দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, নিয়মানুসারে পরিশ্রম এবং সৎস্বভাব দ্বারা কার্য্য করিলে কিরূপে ক্ষুদ্র জিনিষকে বৃহত্তর ব্যাপারে পরিণত করা যায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আত্মনিয়ন্ত্রণের সূচনা

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে শ্যামাচরণের আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ব্বাভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এখন কিরূপে কর্ম্মবীর শ্যামাচরণ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ করিবার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহারই কথা বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শ্যামাচরণের মাতুলবর্গের চট প্রস্তুতের কারবারটি পৈতৃক অনুষ্ঠান। তাই যে সময়ে শ্যামাচরণ পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিত হইলেন, সেই সময়ে তাঁহার মাতুলবর্গ নিজ নিজ কারবারে নিযুক্ত হওয়াতে লোকাভাব বশতঃ শ্যামাচরণকে তাঁহারা ঐ কারবার পরিদর্শনের ভার অর্পণ করেন। তাঁহার মাতুলবর্গ স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের অনুরোধে গৃহে অনুপস্থিত থাকা প্রযুক্ত, সেই সম্মিলিত

বৃহৎ পরিবারের সাংসারিক সমস্ত কার্য্যই শ্যামাচরণকে দেখিতে হইত।

হাট বাজার করা, গৃহস্থিত গরুগুলির সেবা, তাহাদিগকে গোচারণ মাঠে চরাইয়া আনা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ভার বালক শ্যামাচরণের উপর পতিত হইয়াছিল। শ্যামাচরণ অতি সুশৃঙ্খলে এবং হৃষ্টচিত্তে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতায় এই সংসারের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা ছিল না। শ্যামাচরণ সাংসারিক কার্য্যের অবসরে পাটের সূত্রও প্রস্তুত করিতেন।

তাঁহার সমবয়স্ক যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, শ্যামাচরণ কখনও বৃথা কার্য্যে সময় ব্যয় করেন নাই। বৃথা আনন্দে কালহরণ তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাস পাসা খেলিবার স্থানে কেহ কখনও তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অটুট ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই কর্ম্মময় জগতে বৃথা আলস্যে যাপন করা মহাপাপ। পৃথিবীতে যাঁহারা

বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন, কর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা বিরাট পৃথিবীতলে অসামান্য কীর্ত্তি ও যশের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই অলস ছিলেন না। ইহ-লৌকিক উন্নতি বা পারমার্থিক ঐৎকর্ষ্য লাভ করিতে গেলে কর্ম্মের আরাধনা, একনিষ্ঠ ভাবে, তন্ময়তার সহিত উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা অনিবার্য্য। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। আলস্য সাধনা ও সিদ্ধির পরিপন্থী। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। আলস্যে দিন যাপন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম চ্যুত হইলে, কোন বিষয়েই তাহার উন্নতি ঘটিবে না।

শ্যামাচরণের সাংসারিক জ্ঞান এবং মিতব্যয়িতা মাতুলদিগের বৃহৎ সংসার পরিচালনের ভার লইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। উত্তর কালে তিনি যে একজন আদর্শ গৃহী-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাহার শিক্ষা মাতুলালয়েই আরম্ভ হয়। মনীষী ব্যক্তিরা সকল স্থান হইতেই শিক্ষণীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সামান্য বা ঘৃণ্য বলিয়া তাঁহাদের নিকট কোন

বস্তু বা ব্যক্তি উপেক্ষিত হয় না। তাই পরমহংস দেব বলিয়াছেন যে, অবধূত চিল এবং বকের নিকট হইতেও শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। চিল ও বক এক হিসাবে তাঁহার গুরু। তিনি চিলের নিকট হইতে স্থির লক্ষ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। যে জিনিষকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন তাহার দিকে লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। সাধনার ধনকে পাইতে গেলে ধৈর্য্য ধারণ অত্যাবশ্যক। ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিলে ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। নিকৃষ্ট জীব হইতে অবধূত এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল তিনি যখন যে অবস্থায় যে কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন তাহা হইতে জীবনের শিক্ষা আয়ত্ত করিতেন। জগতের সকল কর্ম্মক্ষেত্রই যেন তাঁহার নিকট শিক্ষালয় বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রত্যেক আদর্শ মানুষের জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে এই গুণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে

শ্যামাচরণ তাঁহার মাতুলদিগের সংসার পরিচালন করিবার সময় লক্ষ্য করিলেন যে, অনেক দ্রব্য বিনা প্রয়োজনে কিম্বা প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে খরিদ করা হয়। তিনি যদিও সে সময় বালক, কিন্তু তথাপি সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এজন্য যেখানে গলদ আছে, তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাহা তৎপরতার সহিত দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতেন। তখন দেখা যাইত যে, ইহাতে সুফলই প্রসূত হইয়াছে। এই গুণ-প্রভাবে তিনি তাঁহার মাতুলদিগের সাংসারিক ব্যাপার এরূপ সুশৃঙ্খলে এবং মিতব্যয়িতার সহিত পরিচালন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য নিয়মিত ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইতে

লাগিল। সেই উদ্বৃত্ত টাকা সংসার খরচের তহবিলে জমিতে লাগিল।

এঘটনা প্রকাশ পায় প্রায় দুইবৎসর পরে। তখন এই উদ্বৃত্ত অর্থ প্রায় দেড়শত টাকার উপর হইয়াছে। এক সময়ে শ্যামাচরণের মাতুল গোবিন্দ গাইন পতিত পাবনের সহিত কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা হইতে তাঁহাদের দেশস্থ বাটী ধান্যকুড়িয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। এক দিন শ্যামাচরণের মাতুল গোবিন্দ গাইন মহাশয়ের কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কিছু টাকার হঠাৎ আবশ্যক হয়। তাঁহারা যে টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা এখানে আসিয়া খরচ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছু অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। টাকার জন্য অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। নিকটে কাহারও কাছে সে সময় টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

শ্যামাচরণ কার্য্যবশতঃ তখন সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহাঁদের দুই জনের আলোচনা প্রসঙ্গে

শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মাতুলের কিছু টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। কলিকাতায় না গমন করিলে টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সেপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

শ্যামাচরণ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাতুলকে বলিলেন, "আপনার টাকার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আমি আপনাকে দেড়শত টাকা দিতেছি, আমার নিকট টাকা আছে।" তখন তিনি বিস্মিত হইয়া শ্যামচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই টাকা কোথায় প্রাপ্ত হইলে?" উত্তরে শ্যামাচরণ বলিলেন যে, উক্ত টাকা সংসার খরচের উদ্বৃত্ত হইতে সঞ্চিত।

গোবিন্দ গাইন মহাশয় তখন ভাগিনেয়কে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, কি উপায়ে শ্যামাচরণ এই অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। অনাবশ্যক ব্যয় বন্ধ করিয়া, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সংসারের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াও যে, অর্থ সঞ্চয় করা যায়, এই পরমতত্ত্ব

অনেকের জানা নাই। গোবিন্দচন্দ্র অল্পবয়স্ক ভাগিনেয়ের দূরদর্শিতা, মিতব্যয়িতা এবং বিচক্ষণতা দর্শনে যে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্যামাচরণের পূর্ব্বে তাঁহার মাতুলদিগের সংসারে সংসার খরচের জমা খরচের জন্য হিসাবের কোন খাতা ছিল না। সে প্রণালী শ্যামাচরণই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি উত্তরকালে প্রায়ই বলিতেন যে, সমস্ত বিষয়ের লিখিত হিসাব থাকা সাংসারিক লোকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তাহা হইলে সেই হিসাব-দৃষ্টে সেই সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়।

এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সংসার খরচের হিসাব রাখাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে হিসাব রক্ষা করিলে, তাঁহারা কতদূর মিতব্যয়ী হইতে পারেন। এরূপ অনেক ব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন, যাঁহারা আপনাকে কৃপণ বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করেন। তাহা ভাল; কিন্তু তাঁহারা জানেন না, মিতব্যয়ী এবং কৃপণ উভয়ের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পার্থক্য বিদ্যমান। কৃপণ তাঁহার ধন

ন্যায়-সঙ্গতভাবে ব্যয় না করিয়া জমাইয়া রাখেন। মিতব্যয়ী প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেন না।

শ্যামাচরণ তাঁহার সমস্ত জীবনে কখনও কৃপণ ছিলেন না, অমিতব্যয়ীও ছিলেন না। তাই তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার বিরাট দান-যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে পরিয়াছিলেন।

যাহা হউক, যে সময়ে শ্যামাচরণ সেই সঞ্চিত অর্থ তাঁহার মাতুল গোবিন্দচন্দ্রকে প্রদান করিলেন, তখন তথায় উপবিষ্ট পতিতপাবন সাউ মহাশয় বালক শ্যামাচরণের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, কালে এই বালক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইবেন। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, বাল্যকাল হইতে এইরূপ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করিলে কখনই জীবনে সফলতা লাভ করা যায় না।

তিনি বালকের গুণে মুগ্ধ হইলেন। এই বয়সে যে লোভ দমন করিতে পারে, সে সামান্য ব্যক্তি নহে। তাহার পরিণাম সমুজ্জ্বল। বালক শ্যামাচরণ অনায়াসে এই সংসার খরচের উদ্বৃত্ত অর্থ আত্মসাৎ করিতে

পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া রীতিমত ব্যবসায়ীর ন্যায় তাহা জমা করিয়া রাখিয়াছেন। লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ পতিতপাবন এজন্য শ্যামাচরণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

শ্যামাচরণের সঞ্চিত অর্থে গোবিন্দচন্দ্রের প্রয়োজনীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়া সেই অর্থ শ্যামাচরণকে প্রেরণ করিলেন।

তিন বৎসর ধরিয়া শ্যামাচরণ তাঁহার মাতুলদিগের সংসারের যাবতীয় কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতুলদিগের চট বয়নের কার্য্যের সকল ভারই তাঁহার উপরই ছিল। কিন্তু মাতুলদিগের সহানুভূতি এবং দৃষ্টির অভাবে পৈতৃক ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

সকলেই মনে মনে চিন্তা করিতেন, পৈতৃক ব্যবসায়ে ৬ ভ্রাতার সমান অংশ ; কিন্তু একজন যদি উহার উন্নতিকল্পে শ্রম ও উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় নিয়োগ করেন, আর সকলে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে লভ্যাংশের

বেলা সমান ভাগে বাটোয়ারা করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে যদি স্ব স্ব ব্যবসায়ের জন্য সে পরিশ্রম ও উৎসাহের প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে লাভ বেশী হইবে। সুতরাং এজমালী ব্যবসায়ের দিকে কেহই বিশেষ দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পৈতৃক ব্যবসায় কাজেই বন্ধ হইয়া গেল। শ্যামা-চরণ তখন শুধু সাংসারিক কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে তাঁহার মাতুলবর্গের বাহুড়িয়া গঞ্জে যে দোকান ছিল, তাহাতে একজন অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই দোকানের অবস্থা তখন আশাপ্রদ নহে। ভ্রাতাদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইতেছিল। দোকানের কর্ম্ম পরিচালনের জন্য, তাঁহার মাতুলগণ স্থির করিলেন যে, বাটী হইতে শ্যামাচরণকে আনয়ন করাই সঙ্গত। কারণ বাহিরের লোক যত্ন করিয়া কাজ দেখিবে না। অধিকন্তু সেজন্য একটা অতিরিক্ত পারিশ্রমিকও দিতে হইবে। শ্যামাচরণকে আনিলে সে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে

হইবে না। অধিকন্তু দোকান পরিচালনের কার্য্য শ্যামাচরণের শিক্ষা করা হইবে।

বাহুড়িয়ার দোকানে শ্যামাচরণকে যোগ দিতে হইল। তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন যে, দোকানের কার্য্য অপেক্ষা তাঁহাকে আহার্য্যের তত্ত্বাবধান কার্য্যেই অধিক সময় নিযুক্ত থাকিতে হয়। সাত আট জনের উপযুক্ত আহার্য্য প্রতি বেলা পাক করিয়া উহা পরিবেষণ করিতে দিন ও রাত্রির অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। অবসকালে দোকানের প্রয়োজনীয় কার্য্য দেখিতে হয়।

শ্যামাচরণের পক্ষে পাকশালার কার্য্য অতি বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন, মসলা পেষণ, মৎস্য ও তরকারী প্রভৃতিকে ব্যঞ্জনের উপযোগী করিয়া লওয়া প্রভৃতি কোনও কিশোরেব পক্ষে অবশ্যই প্রীতিকর নহে। তাহা ছাড়া দুইবেলা অগ্নির উত্তাপ কোনমতেই রুচিকর হইতে পারে না। উত্তরকালে—ইন্দিরার আশীর্ব্বাদলাভে যখন তিনি ধন্য হইয়াছিলেন, তখন মাঝে মাঝে রহস্যচ্ছলে তিনি বলিতেন যে, তিনি

সকল প্রকার কাজই জানেন, দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেও পারেন; কিন্তু পাকশালার কাজ তাঁহার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। অনেক সময় এমনও ঘটিয়াছে যে, কার্য্যোপলক্ষে কোন স্থানে গমন করিয়া রন্ধন করিবার ভয়ে জলযোগ করিয়াই তিনি দিন যাপন করিয়াছেন।

বাদুড়িয়াগঞ্জের দোকানে আসিয়া হিসাবপত্র রাখিবার কার্য্য তিনি আয়ত্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীর খাতা-পত্র কি ভাবে লিখিতে হয়, রোকড়, খতিয়ান কেমন ভাবে লিখিলে লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ অনায়াসে বোধগম্য হয়, এসকল বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান তাঁহার জন্মিতে লাগিল।

উত্তরকালে তিনি অনেক সময় বলিতেন যে, "যদি আমি মামাদের বাদুড়ের দোকানে না যাইতাম তাহা হইলে কখনই খাতার কার্য্যের বিষয় শিক্ষা করিতে পারিতাম না। সেই স্থানে গমন করিয়া আমার উপকার হইয়াছিল। আমি সেখানে হিসাবের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি।"

তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ হিসাবরক্ষক, ইহার পরিচয় তাঁহার বিরাট কারবারের সাফল্য দর্শনে বুঝিতে পারা যায়। বিপুল কারবারের প্রায় সমুদয় হিসাব তাঁহার নখদর্পণে ছিল। খাতার কোন্ স্থানে কোন্ হিসাব আছে, তাহা যেন সর্ব্বদাই তাঁহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত থাকিত। উচ্চ বেতনের হিসাবরক্ষক মুহুরীগণ অনেক সময় তাঁহার এই বিচক্ষণতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। একরূপ নিরক্ষর মনিব কি প্রকারে এমন হিসাব-নিকাশে দক্ষ হইয়া উঠিলেন তাহা তাহারা অনুমান করিতে পারিত না।

হিসাবের খাতা গরমিল করিয়া কেহ যে কিছু চুরি করিবে, তাহার কোন উপায়ই ছিল না। শ্যামাচরণ স্বতঃসিদ্ধ বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যাবতীয় ব্যবসাকার্য্যে সুসঙ্গতভাবে হিসাব-পত্রের খাতা রাখিতে না জানিলে আয়ব্যয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করিবার প্রণালী যথানিয়মে অবগত না হইয়া ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলে, উহাতে সাফল্যলাভ করা যায় না।

আজ যে বাঙ্গালী জাতিকে অব্যবসায়ী বলিয়া মানুষ বিদ্রূপ করে তাহার প্রধান কারণ, যে সব বাঙ্গালী ভদ্রলোক কোন ব্যবসাকার্য্যে অবতীর্ণ হন, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে অবহিত হইলেও কারবারের প্রধান অঙ্গ, হিসাবের খাতার দিকে লক্ষ্য রাখা সকল সময় প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে কত টাকা মজুত রহিল এবং কত ব্যয় হইল ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এদিকে হিসাব-পত্রের খাতার ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিবার বিশেষ চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন না। বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের বিফলতার ইহাই অন্যতম বিশিষ্ট কারণ।

পৃথিবীতে যাঁহারা ব্যবসায়িজাতি বলিয়া খ্যাত— যাঁহারা ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ পাইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব-ব্যবসায়ের খাতাপত্র সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছেন। যে মাড়োয়ারিগণ সুদূর মাড়বার প্রদেশ

হইতে আসিয়া সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের বক্ষের উপর বসিয়া ব্যবসা দ্বারা কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, দেখা যায় তাহাদের সকলেরই প্রধান দৃষ্টি হিসাবের খাতার উপর। শ্যামাচরণেরও তাহাই ছিল। তিনি নিজে হিসাব-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন।

বাহুড়িয়ার দোকানে অবস্থানকালে শ্যামাচরণ বিরক্তিজনক রন্ধনকার্য্যের অবকাশে কারবারের হিসাব রক্ষার কার্য্যে অভিজ্ঞতালাভ করিতে লাগিলেন। শেষে এমন হইল যে, তাঁহার হিসাবের খাতায় বিন্দু-মাত্র ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইত না। তাঁহার মাতুলগণ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই কঠিন কার্য্য এত অল্প সময়ের মধ্যে শ্যামাচরণ কিরূপে অভ্যাস করিয়া লইলেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন।

বাহুড়িয়ার দোকানে শুধু হিসাবকার্য্য নহে, খরিদ বিক্রয় কার্য্যেও তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগি-লেন। দুই বৎসরকাল ধরিয়া ক্রমাগত রন্ধন-কার্য্যের ফলে আগুনের তাপে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়।

তাঁহার মাতুলগণ দেখিলেন যে, শ্যামাচরণের দ্বারা কার্য্য চলিতেছেনা। তিনি পুনঃ পুনঃ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে ধান্যকুড়িয়ার বাটীতে প্রেরণ কবিলেন। শ্যামাচরণেরও এখানে আর ভাল লাগিতেছিল না।

বাটীতে আসিয়া কিছুদিবস বিশ্রামের পর ক্রমশঃ তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। এদিকে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের অগ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। বাদুড়িয়ার দোকানের অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিল।

তাঁহার মাতুলগণ ক্রমশঃ স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে মনো-নিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি দেখিলেন যে, যদিও বাদুড়িয়ার দোকান বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পরমায়ু ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ওখানে ফিরিয়া গেলে বিশেষ কিছুই লাভ হইবে না। তখন আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

একবার তিনি ভাবিলেন যে, চট ব্যবসায় তিনি আত্মনিয়োগ করিবেন; কিন্তু তাঁহার মাতুলগণ

সে ব্যবসায় তখন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাতুড়িয়ার দোকানের উপরও নির্ভর করা চলে না। ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি প্রকৃতই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই মানসিক চাঞ্চল্যের কথা তিনি জননীর নিকট প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী জননী সকল অবস্থা বুঝিয়া পুত্রের ন্যায়ই চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন।

এদিকে শ্যামাচরণ যখন বাতুড়িয়ার দোকানে কার্য্য করিতে গমন করেন, সেই সময় তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ মাতুলদিগের সংসারের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রঘুনাথ বাল্যাবধি লেখাপড়ার দিকে অবহিত ছিলেন না। সামান্য দিন মাত্র পাঠশালায় গমনের পর উহা ত্যাগ করিয়া একরূপ আলস্যেই দিন অতিবাহিত করিতেন। শ্যামাচরণ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে পরিশ্রান্ত দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। ভ্রাতার শ্রমলাঘবের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

উত্তরকালে শ্যামাচরণ ধনী হইলে রঘুনাথকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়াছিলেন যে, বোধ হয় কোন রাজপুত্রও

তাঁহার সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইতেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদা বাল্যের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা জাগ্রত ছিল। অভাবের পীড়নে, দুঃখ দুর্দ্দশার নিষ্পেষণে কনিষ্ঠ সহোদর কখনও সুখের মুখ দেখিতে পান নাই, এই দুঃখ শ্যামাচরণের হৃদয়ে শেলাঘাত করিত। তাঁহার বিরাট হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে কনিষ্ঠের জন্য যে, স্নেহ-শীতল আসন আস্তৃত ছিল, যে ভ্রাতৃপ্রেমের অমৃত প্রবাহ সর্ব্বদা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাহার পবিত্র ধারায় কনিষ্ঠকে তিনি অভিষিক্ত করিতে চাহিতেন।

সেইজন্য তিনি ভ্রাতাকে যতদূর সম্ভব সুখে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রঘুনাথের কোন সাধই তিনি কখনই অপূর্ণ রাখিতেন না। শ্যামাচরণ নিজে যে মূল্যের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, তদপেক্ষা মূল্যবান বস্ত্রাদি রঘুনাথকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে দিতেন। কনিষ্ঠের বিবাহের পর তাঁহার স্ত্রীকে শ্যামাচরণ নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি এখনও জীবিতা রহিয়াছেন। শ্যামাচরণের পুত্রগণ এখনও তাঁহাকে জননীর মত সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন।

তিনিই এখন এই বৃহৎ পরিবারের গৃহিণীস্বরূপা হইয়া রহিয়াছেন। শ্যামাচরণ অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। পরে যথাস্থানে এ সম্বন্ধে বর্ণনা করা যাইবে।

শ্যামাচরণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ ভুবনের পত্নী সম্বন্ধে এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্রথমতঃ ধান্যকুড়িয়ায় তাঁহার শ্বশ্রূমাতার সহিত অবস্থান করিতেন। পরে শ্যামাচরণের মাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহার উপর কোন প্রকারে সদয় থাকিলেও তাঁহার বিধবা পুত্রবধূর উপর বিশেষ প্রসন্ন নহেন।

ভ্রাতৃবধূগণের মনোভাব বুঝিয়া শ্যামাচরণের জননী স্থির করিলেন, ভাগ্যহীনা বিধবা পুত্রবধূকে তিনি নির্য্যাতিতা হইতে দিবেন না। তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই পুত্রবধূকে কেহ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাঁহাকে হীনভাবে উপেক্ষা করিলে, তিনি কখনই তাহা সহ্য করিতে পরিবেন না। সুতরাং তিনি বধূর পিত্রালয় বাহু গ্রামে বধূর পিতামাতাকে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেও

সে চেষ্টা বহুবার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সেবা-পরায়ণা নারী কোনক্রমে তাঁহার বিধবা শোকাতুরা শ্বশ্রূকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পিত্রালয়ে গমন করিতে হইল।

তথাপি যতদিন শ্যামাচরণ মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন এই মমতাময়ী, কর্ত্তব্য ও স্নেহ-পরায়ণা নারী মধ্যে মধ্যে শ্বশ্রূকে দেখিয়া যাইতেন। উত্তরকালে যেদিন হইতে শ্যামাচরণ নিজ উপার্জ্জনের দ্বারা স্বাধীন হইয়া মাতাকে পৃথক স্থানে লইয়া গিয়া-ছিলেন, সেই দিন হইতে এই নারী শ্যামাচরণের সংসারে কর্ত্রীরূপে—মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায় আমরণ পরিচর্য্যা দ্বারা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ

শ্যামাচরণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি কোনরূপে তিনি কলিকাতায় যাইতে পারেন, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে তিনি নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু কলিকাতায় যাইবার উপায় কি, এবং কোথায় থাকিয়া তিনি জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন?

অবশ্য তথায় তাঁহার মাতুলের কারবার ও গদি রহিয়াছে; কিন্তু মাতুলের অনভিমতে তথায় কি প্রকারে যাইবেন? বাদুড়িয়ার দোকানে অবস্থানকালে দুই একবার শ্যামাচরণ তথায় গমন করিয়াছিলেন। কার্য্যোপলক্ষে দুই একদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতুলের বিনা অনুমতিতে একবারে পাকাপোক্ত ভাবে কলিকাতায় বাস করিতে গেলে তিনি হয়ত বিরক্ত হইতেও পারেন।

জননীরও অভিপ্রায় যে, শ্যামাচরণ কলিকাতায় গিয়া উন্নতির চেষ্টা করেন। গোবিন্দ গাইন মহাশয় গ্রামে আসিলে, জননী প্রকারান্তরে ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে সে বিষয়ে প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। অবশ্য স্পষ্টভাবে কোন কথা বলেন নাই। বুদ্ধিমান গোবিন্দ ভগিনীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও স্পষ্ট-ভাবে কোন কথা বলেন নাই। ভ্রাতার মনের কথা বুঝিতে না পারায়, শ্যামাচরণের জননী এ বিষয় আর তাঁহার কাছে উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই।

কিন্তু এবার আর কোন উপায় নাই। মাতা পুত্রে পরামর্শ স্থির হইল, এবার শ্যামাচরণের মাতুল গোবিন্দ গাইন মহাশয় বাটীতে আসিলে তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। গোবিন্দ গাইন মহাশয় অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, শ্যামাচরণ অতি বুদ্ধিমান এবং সচ্চরিত্র। সঞ্চিত অর্থের দ্বারা যেদিন শ্যামাচরণ তাঁহার সাহায্য করিয়া-ছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার দৃষ্টি এই তরুণ বয়স্ক ভাগিনেয়ের উপর অবিচলিত ছিল।

পতিতপাবন বাবুর ন্যায় তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এই বালক নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ করিবে। ইহাকে কলিকাতার কারবারে লইয়া যাইতে পারিলে, ইহার দ্বারা কারবারের উন্নতি ছাড়া অবনতি হইবে না, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। কারণ, শ্যামাচরণ গোবিন্দ বাবুকে টাকা সাহায্য করিবার অল্পদিন পরেই শ্যামাচরণের অন্য মাতুলগণ তাঁহাকে বাদুড়িয়ার দোকানে লইয়া যান। তিনি যদি তখন ভাগিনেয়কে বাদুড়িয়ার দোকান হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

কিন্তু সে কারণও তত প্রবল নহে। গোবিন্দচন্দ্র জানিতেন, যদিও তাঁহার ভাগিনেয় উপযুক্ত, তথাপি তাঁহাদিগের কারবার তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তাহাতে অন্য অংশী রহিয়াছেন। তিনি যদি নিজের আত্মীয় কোন লোককে কারবারে গ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতে সেই লোকের দ্বারা যদি কোন অনিষ্ট

হয়, তাহা হইলে সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহার। তবে অংশী যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া গোবিন্দবাবুর কোন আত্মীয়কে কারবারে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন কথা উঠিবে না।

সেইজন্য তিনি ইচ্ছাসত্ত্বেও শ্যামাচরণকে কারবারের মধ্যে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এদিকে পণ্ডিত বাবুরও চিত্ত শ্যামাচরণের সেই এক দিবসের মিত-ব্যয়িতা সম্বন্ধে কার্য্যাবলী দৃষ্টে, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাব একান্ত ইচ্ছা, শ্যামাচরণকে তিনি কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজ কারবারের মধ্যে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু চক্ষুলজ্জার জন্য সে কথা তিনি বলিতে পারিতেছিলেন না। শ্যামাচরণ গোবিন্দ বাবুর ভাগিনেয়; গোবিন্দ বাবু যদি নিজ ভাগিনেয়ের মঙ্গল না দেখেন, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন? সেইজন্য তিনি মনের ইচ্ছা মনেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শ্যামাচরণ যখন নিজের ভবিষ্যতের চিন্তায় অভিভূত, তাঁহার মাতাঠাকুরাণীও পুত্রের জন্য দুশ্চিন্তান্বিত, সেই সময়ে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে

পতিতবাবু ও গোবিন্দবাবু দুইজনে একত্রে কলিকাতা হইতে ধান্যকুড়িয়ায় আগমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দুইজনের একত্রে ধান্যকুড়িয়ায় আগমন প্রায়ই ঘটিত না। কারবার উপলক্ষে একজনকে কলিকাতায় থাকিতেই হইত। এবার শ্যামাচরণের সৌভাগ্যের জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, বিশেষ কারণ বশতঃ দুই অংশী একত্র মিলিত হইয়া বাটীতে আগমন করিলেন।

এদিকে মাতা পুত্রে পরামর্শ স্থির করিলেন যে, এরূপ সুযোগ আর ছাড়া হইবে না। শ্যামাচরণকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব তাঁহাদিগের নিকট উত্থাপন করিতেই হইবে। একদিন যখন পতিতপাবন ও গোবিন্দবাবু একস্থানে উপবিষ্ট, সেই সময় শ্যামাচরণের মাতা অতি কুণ্ঠিতভাবে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

এ অনুরোধ উভয়েরই কাছে প্রার্থনীয়। শুধু সঙ্কোচ বশতঃ প্রকাশ্যভাবে কেহই স্বয়ং এ প্রস্তাব করিতে পারিতেছিলেন না। এক্ষণে দুইজনেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে কলি-

কাতায় লইয়া যাইবার জন্য দুইজনেই এক মত হইয়া প্রস্তাব করিলেন।

তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে শ্যামা-চরণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। যেদিন পতিত-পাবন ও গোবিন্দবাবু তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন, সেই দিন হইতেই শ্যামাচরণের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ২০ বৎসর।

উত্তরকালে শ্যামাচরণ বলিতেন, যখন তিনি প্রথম দেশের বাটী হইতে মাতুলের সহিত কলিকাতায় গমন করেন, তখন কলিকাতায় জনবহুলতা দর্শনে এবং মাতুলের কারবারের কর্ম্মচারিবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়া যেন একরূপ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিবার পর মাঝে মাঝে মাতার জন্য তাঁহার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিত। কারবারের অন্যতম মালিক পতিতবাবু, শ্যামাচরণকে স্নেহ করি-তেন। অনুক্ষণ তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি শ্যামাচরণের সুখ সুবিধার প্রতি নিক্ষিপ্ত থাকিত। শ্যামাচরণ কথাচ্ছলে

পরে অনেকবার বলিয়াছেন, সে সময়ে যদি পতিতবাবু তথায় না থাকিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতে পারিতেন না।

পতিতবাবুর কারবারের দালাল বিপিন বিহারী দপ্তরী পতিতবাবুর খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। উত্তরকালে এই বিপিন দপ্তরীর দ্বারা শ্যামাচরণ বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্যামবাবু বলিতেন, বিপিন দপ্তরীই তাঁহার এক প্রকার শিক্ষাগুরু। ইঁহার নিকট হইতেই তিনি অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এজন্য শ্যাম বল্লভ আমরণ বিপিন দপ্তরীর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। পুরাতন কারবার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে তিনি প্রথমেই বিপিন বাবুর নাম করিতেন।

শ্যামাবাবু বলিতেন, পতিতবাবু কলিকাতায় তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কারবারে অনেক লোক কাজ করিত। পাছে আহারাদির কোন কষ্ট হয়, এজন্য পতিতপাবন সর্ব্বদাই শ্যামাচরণের সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া জানিতেন, তাঁহার কোনও অসুবিধা হইতেছে কিনা। শুধু তাহাই নহে, যুবকের সুখস্বাচ্ছ-

ন্দ্যের দিকেও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কোন অভাব বা অভিযোগ থাকিলে, অনতিবিলম্বে তাহার প্রতিকারও করিতেন। কর্ম্মচারিবর্গের উপর তাঁহার আদেশ ছিল, যাহাতে সকলেই শ্যামাচরণের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে।

বড় বাজারে গোবিন্দচন্দ্র ও পতিতপাবনের ঘৃত ও চিনির আড়ত ছিল। নিমাইবাবুর পুত্রের প্রাপ্য অংশ মিটাইয়া দিবার পর, পতিতপাবনের সহিত মিলিত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র যখন কারবার করিতে আরম্ভ করেন, তখন পাটের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাজারের অবস্থা সুবিধাজনক নহে—পাটের চাহিদাও তখন য়ুরোপে ছিল না, একারণ অনেকেই পাটের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্র এবং পতিতপাবনও পাটের ব্যবসা না চালাইয়া ঘৃত চিনির কারবার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্যামাচরণকে তাঁহারা এইখানে আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিলেন।

পাটের ব্যবসা ত্যাগ করিলেও তাঁহাদের ভূষীমালের কারবার, পুরাতন স্থানে—১৪৮নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের

বাড়ীতে চলিতেছিল; ভূষীমাল অর্থে সরিষা, তিসি, ডাইল প্রভৃতি বুঝায়। সেই একই বাড়ীতে এখনও পর্য্যন্ত পি, জি ডব্‌ল্‌ সাউয়ের কারবারের গদি রহিয়াছে। শ্যামাচরণের প্রভূত চেষ্টায় এই ব্যবসায় পরিণামে বিরাট আকার ধারণ করিলেও শ্যামাচরণের নাম এই কারবারের বিজ্ঞপ্তিতে নাই। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

শ্যামাচরণ কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কলিকাতায় ঘৃত চিনির কারবারে নিয়োজিত হইলেন। তিনি কারবারে প্রবেশ করিয়া কি করিবেন, প্রথমে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। দুই চারিদিন তথায় যাতায়াতের ফলে ক্রমে কারবার সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, “যখন আমি প্রথম বড় বাজারের কারবারে নিযুক্ত হই, তখন আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। পূর্ব্বে যখন বাদুড়িয়ার দোকানে থাকিতাম তত্রত্য কার্য্যপদ্ধতি অন্যপ্রকার ছিল। সে কারবার ও এই কারবারে অনেক পার্থক্য দেখিলাম। সেখানে খরিদ্দার আসিলে

তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য লইয়া দ্রব্য দিয়া দিতাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, খরিদ্দারকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতাম যে, এ দ্রব্য নাই তুমি অন্যত্র খরিদ কর।

"কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা দেখিলাম স্বতন্ত্র। হয়ত ঘরে মাত্র ২০ মণ ঘৃত রহিয়াছে ও এরূপ সময়ে হয়ত একটি ৫০ পঞ্চাশ মণ ঘৃতের খরিদ্দার আসিল। দেখিতাম, তাহাকে আড়তে বসাইয়া রাখিয়া দোকানের একজন লোক তখনই বাজারে বহির্গত হইল। অন্য দোকানে মাল ঠিক করিয়া আসিয়া খরিদ্দারকে সেই মাল বিক্রয় করা হইল, তাহাতে লভ্যাংশও রহিয়া গেল।

"বাজারে কাহার আড়তে কোন্ মাল কি পরিমাণ আছে এবং তাহার মূল্যই বা কত এসম্বন্ধে প্রত্যহ সন্ধান রাখা প্রয়োজন। চিনির সম্বন্ধে ঠিক তাহাই। তৎকালে বিলাতী চিনির বিশেষ আমদানী ছিল না। বরং এদেশ হইতে চিনি অন্য দেশে রপ্তানি হইত। সে সময় দেখিতাম, সাহেবদের কিম্বা বড় বড় মাড়োয়ারী

ধনীদিগের দালালরা দোকানে চিনির দর যাচাই করিয়া ফিরিত। হয়ত তখন ঘরে একটুকুও চিনি নাই, কিন্তু চিনির দর দেওয়া হইত। কিছু পরে হয়ত ১০০ শত মণ চিনির বায়না আসিয়া উপস্থিত হইল। দুইদিন চারিদিনের মধ্যে দেখিলাম, হয়ত সেই চিনি বোঝাই হইয়া চলিয়া গেল।

"প্রথম প্রথম এইসব বিষয় আঁমাকে রুদ্ধবাক করিয়া দিত। রহস্য জানিবার জন্য ক্রমে আমার আগ্রহ জন্মিল। কি প্রকারে এইসব মাল আসে, তাহার সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিবার জন্য আমি নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলাম।

"বিপিন দপ্তরী মহাশয় অতি আগ্রহে আমাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। ক্রমেই ব্যবসায়ের সকল বিষয় জানিবার দুর্নিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। রহস্যের মূলে পৌছিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।"

শ্যামাচরণ আগ্রহাতিশয়ে অধীর হইয়া একদা বিপিন দপ্তরীকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সঙ্গে

করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কোথায় কোন্ মাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিরূপভাবে দরদস্তুর করিতে হয়, এসকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। বিপিন দপ্তরীরও ইচ্ছা তাঁহাকে লইয়া বাজারে বাহির হয়েন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের অমতে তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইতে সাহসী হইতেছিলেন না।

শ্যামাচরণের নির্দ্দেশমতে বিপিনবিহারী একবার পতিত বাবুকে এবিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামাচরণ বাজারের কার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন জানিতে পারিয়া পতিতপাবন অত্যন্ত আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। শুধু তাহাই নহে, শ্যামাচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি বিপিনের সহিত যাও। পরে আমি যে দিবস বাজারে বহির্গত হইব, সেদিন আমার সহিত তুমি যাইবে। তাহাতে সাহেবদের অফিস প্রভৃতি তোমার পরিচিত হইবে।"

শ্যামাচরণ এইরূপে বাজারে বাহির হইবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এবং প্রত্যহ বিপিন বাবুর সহিত বাহিরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের

অবকাশ লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন, কিরূপে মালের সন্ধান রাখিতে হয়, কিভাবে উহা খরিদ বিক্রয় করিতে হয়, বাজারে কখন কোন মালের আবশ্যক, কোন সময়ে কোন মালের দর চড়া কিম্বা কম হয়।

এইরূপে প্রায় সমস্ত বিষয়ই ক্রমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন আর বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ তাঁহার নিকট রহিল না। অবশেষে এমন হইল, তিনি স্বয়ং স্বাধীনভাবে, দালাল বিপিন দপ্তরীর সাহায্য ব্যতিরেকে দুই একটি দোকানের মাল বেচা-কেনা করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে দোকানের বেশ লাভও হইল।

ক্রমশঃ তাঁহার সাহস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতেন, "প্রথম প্রথম আমি আহারাদি করিয়া দশটার সময় দোকানে আসিয়া সাধারণভাবে দোকানের কার্য্য দেখিয়া, বিপিন বাবুর সহিত বাজারে মাল খরিদ-বিক্রয়ের জন্য বহির্গত হইতাম। ইহার মধ্যে আবশ্যক হইলে, অর্থাৎ মালিকদের সহিত কোন

পরামর্শ ইত্যাদি থাকিলে, দোকানে আগমন করিতে হইত। আবার পুনরায় বহির্গত হইতে হইত। তৎপরে দোকানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৪টা ৫টা সময় হইতে দোকানের খাতাপত্র লইয়া বসিতাম। তাহাতে রাত্রি আন্দাজ ১০টা বাজিয়া যাইত। তৎপরে কার্য্য বন্ধ করিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিতাম।

"অনেক সময় এরূপ হইত, বিপিনবাবু সকালে একবার বাহির হইতেন। সে সময়ে মহাজনদিগের গদিতে যাইতেন না। প্রায় তাঁহাদের বাটীতে গমন করিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। আমিও তাহা বুঝিতে পারিয়া সকালেই তাঁহার সহিত বহির্গত হইতাম। তৎপরে সেখান হইতে ফিরিয়া ১০টার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্য্য করিয়া রাত্রিতে বাসায় আসিতাম। ইহাতে পতিতবাবু প্রভৃতি বিশেষ খুসী হইতেন। বিপিনবাবুও আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য কোনরূপ কার্পণ্য করিতেন না। এমন কি আমি যে সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না, তিনি তাহা আমাকে অযাচিতভাবে সমস্তই বলিয়া দিতেন।"

তৎকালে বড়বাজারে ঘৃত চিনির দালালদিগের মধ্যে বিপিনবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। অনেক বড় বড় ধনী মারবাড়ী ব্যবসায়ী তাঁহার বাধ্য ছিল। সুতরাং বিপিনবাবুর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শ্যামাচরণ নানাবিষয়ে পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উন্নতির প্রথম স্তর

শ্যামাচরণের সমগ্র জীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনও কার্য্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি পূর্ণ অভিজ্ঞতা না লইয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

বাল্যকাল হইতেই স্বতঃসিদ্ধ বুদ্ধিবলে তিনি হঠকারিতার মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। হঠকারিতা অনেক বুদ্ধিমানের ব্যর্থতার কারণ। শ্যামাচরণের জীবনে এই হঠকারিতার কোন স্থান ছিল না। ব্যবসা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পতিতপাবন অথবা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার কোন প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে কোনদিন কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই।

দুই বৎসর ধরিয়া বড়বাজার স্থিত ঘৃত চিনির আড়তে কাজ করিয়া শ্যামাচরণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। পতিতবাবু শ্যামাচরণের সমস্ত কার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি দেখিতেন, এই যুবক যেমন উৎসাহী, পরিশ্রমী এবং শিক্ষাতৎপর তেমনই সরল ও সত্যবাদী। শুধু তাহাই নহে, শ্যামাচরণের ন্যায় বিশ্বাসভাজন নির্লোভ যুবক তিনি অল্পই দেখিয়াছেন। সামান্য একটি কপর্দ্দকের প্রয়োজন হইলে শ্যামাচরণ কাহারও অজ্ঞাতসারে অথবা অনভিমতে কোনও দিন তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই গুণ সাধারণতঃ দুর্লভ।

কারবারের যাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, অথবা মূল ধনীদিগের কোনও প্রকার লোক্সান হয়, এমন কোন কার্য্য শ্যামাচরণের দ্বারা একদিনের জন্যও অনুষ্ঠিত হয় নাই। বরং কিসে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে, শ্যামাচরণের কার্য্যপদ্ধতিতে তাহাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত।

পতিতবাবু তাঁহার এই সমস্ত সদ্‌গুণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বড়বাজারের ঘৃত চিনির আড়ত হইতে

তাঁহাদের হাটখোলার তিসির আড়তে আনয়ন করেন। তৎকালে পতিতবাবুর ও গোবিন্দবাবুর তিসির কারবারই সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তখন শ্যামাচরণের বয়ক্রম প্রায় বাইশ বৎসর হইবে।

শ্যামাচরণকে এই স্থানে আনয়ন করিবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। পতিপাবন ও গোবিন্দচন্দ্রের যৌথ তিসির কারবারে যিনি প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। তাঁহার নাম সাধুচরণ। তাঁহাদিগের গ্রামের নিকটস্থ যতুর আটিগ্রামে ইঁহার বাড়ী। গোবিন্দবাবু এবং নিমাইবাবু উভয়ে মিলিয়া যখন প্রথম কারবার আরম্ভ করেন, তখন হইতে সাধুচরণ তাঁহাদের কারবারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে সাধুচরণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দারিদ্র্যের পেষণে তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। দয়ার্দ্রচেতা গোবিন্দ গাইন মহাশয় তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শনে বিচলিত হইয়া আপনাদের কার-বারে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

ক্রমশঃ সাধুচরণের অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া উঠে। অনেকে বলেন, নিমাই বাবুর পুত্রের সহিত গোবিন্দ বাবুর যে মনোমালিন্য হয়, তাহাতে সাধুচরণের হাত ছিল। নিমাই বাবুর পুত্রকে নানাভাবে উত্তেজিত করিয়া সাধুচরণ গোবিন্দবাবুর সহিত তাঁহার কারবার পৃথক করিয়া দেন। সরল-চিত্ত গোবিন্দবাবু সাধুচরণের এই সকল কীর্ত্তির কথা জানিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন।

সাধুচরণ বুঝিতে পারিলেন যে, গোবিন্দবাবুর অন্য যত গুণই থাকুক, তিনি অত্যন্ত সরলচিত্ত, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞ এবং অপরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গোবিন্দবাবু যতদিন নিমাই বাবুর সহিত সমবেতভাবে কারবারে লিপ্ত ছিলেন, সাধুচরণ ততদিন বিশেষ কিছুই আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হন নাই। তাই নিমাইবাবুর মৃত্যুর পর তিনি চেষ্টা করিয়া নিমাইবাবুর পুত্রকে কুপরামর্শ দ্বারা উত্তেজিত করিয়া পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সরল বিশ্বাসী গোবিন্দচন্দ্রকে ফাঁকি দিয়া নিজের উন্নতিসাধন।

কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। কারণ, গোবিন্দবাবুর কারবার হইতে নিমাইবাবুর পুত্র পৃথক হইবার পর, যে ব্যক্তি আসিয়া ব্যবসায়ে যোগদান করিলেন, তিনি শুধু বুদ্ধিমান নহেন, গভীরভাবে লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞ। পতিতপাবনের আগমনে সাধুচরণের মনের সমস্ত সাধু-সঙ্কল্প স্বপ্নে পরিণত হইল! সাধুচরণ দেখিলেন, পতিতপাবনের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে কোন অনাচরণীয় কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। পতিত বাবু কারবারে যোগ দিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাধুচরণ নামক কর্ম্মচারীটি তাঁহার নামের অনুযায়ী নহেন—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নামে সাধু হইলেও কার্য্যে সর্ব্বদাই অসাধু-সঙ্কল্পপরায়ণ।

পতিতবাবু সেই জন্য তাঁহার কার্য্যের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। লোকটি কার্য্যক্ষেত্রে অত্যন্ত কর্ম্মঠ বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, উপযুক্ত বিশ্বাসী এবং কর্ম্মঠ লোক পাইলেই তিনি তাঁহাকে দূরীভূত করিবেন।

এতদিন তিনি সেরূপ কোন লোক প্রাপ্ত হন নাই। সাধুচরণকে বিতাড়িত করিবারও কোন বিশেষ সূত্রও তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। কারণ, সাধুচরণ অত্যন্ত কূট-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল। সে প্রত্যেক কার্য্য এরূপ সুকৌশলে সম্পন্ন করিত যে, তাহাকে কোন কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত বলিয়া ধরা যাইত না। কিন্তু সাধুচরণ বুঝিতে পারিতেন যে, পতিতবাবু তাঁহার উপর সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বদা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

পতিতপাবন থাকিতে সাধুচরণের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া সাধুচরণ অবশেষে উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। উপকারী, দুর্দ্দিনের সহায় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া সমব্যবসায়ী আর একজনের কারবারে চলিয়া গেলেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে—কৃতঘ্নতার এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অনুক্ষণই দৃষ্ট হয়।

তাহারা দেখিল, বড় কারবারের একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহাদের কার-

বারের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা। কারণ, সাধুচরণের দ্বারা বড় কারবারের খরিদ্দার প্রভৃতি সমস্তই সংগৃহীত হইতে পারিবে। এবং উক্ত ব্যবসায়ের গোপনীয় সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

সাধুচরণের কার্য্যত্যাগ ফলে উঁহাদের কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু পরে বিশেষ ক্ষতিও তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কারণ, সাধুচরণ অতি পুরাতন কর্ম্মচারী, কারবার সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধানই তিনি অবগত ছিলেন। অনেক সময়ে ইহার উপর নির্ভর করিয়া স্বত্বাধিকারীরা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন। তাঁহার অভাবে এ বিষয়ে স্বত্বাধিকারীরা নানাবিধ অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেকে পরামর্শ দান করিল যে, সাধুচরণকে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় স্বপদে নিযুক্ত করা হউক।

সরলচিত্ত গোবিন্দবাবুর এ প্রস্তাবে মত হইয়াছিল; কিন্তু বুদ্ধিমান এবং তেজস্বী পতিতবাবু সাধুচরণের অকৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর এমন বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই তিনি তাহাতে সম্মতিদান

করিলেন না। তিনি বলিলেন যদি আমাদের কারবার উঠিয়াও যায়, তাহা হইলেও ঐ প্রকার অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনই পুনরায় নিয়োজিত করিব না।

গোবিন্দবাবু চিরকাল পতিতবাবুর মতে মতে দান করিতেন। সুতরাং পতিতবাবুর ঘোর অমত দেখিয়া শেষে তিনিও তাহাতে মত দিলেন। সকলে যখন একজন উপযুক্ত লোকের অন্বেষণে ব্যস্ত, সেই সময় লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ পতিতবাবু কাহারও কথা না মানিয়া শ্যামাচরণকে বড়বাজারের ঘৃত চিনির আড়ত হইতে এই স্থলে আনয়ন করিলেন।

এই ব্যাপারে অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিল। অনেকের মনে এমন আশঙ্কাও জন্মিয়াছিল যে, এই তরুণ-বয়স্ক শ্যামাচরণের দ্বারা এমন কঠিন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। বরং ইহার দ্বারা পরিণামে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ কর্ম্মঠ-পুরুষ পতিতপাবন কাহারও কথায় বিচলিত হন নাই। তিনি গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, “তোমরা দেখিতে পাইবে, আমার কখনও ভুল হয় নাই।” তাঁহার উক্তি

বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি মানুষ চিনিতেন। যাঁহার উপর গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পণ করিলেন, তিনি যে সাধারণ মানুষের মত ছিলেন না—অতিমাত্রায় কর্ম্মকুশল, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী, ইহা পতিতপাবন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া ছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উন্নতির দ্রুত পরিণতি

হাটখোলার তিসির কারবারে যোগ দিয়াই শ্যামাচরণের সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্ম-শক্তি যেন স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। চরিত্রগত সাধুতার-বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া ব্যবসায়ের প্রলোভনপূর্ণ দায়িত্বময় পথে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইলেন। বিষ্ণুপদ নিঃসৃত জাহ্নবীধারার প্রবল স্রোতোবেগ কোনও বাধাবন্ধ না মানিয়া যেমন আপনার পথ মুক্ত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তেমনই ভাবে শ্যামাচরণের কর্ম্মশক্তি তাঁহাকে চরম লক্ষ্যের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

হাটখোলার তিসির আড়তে যোগ দিবার পর, শ্যামাচরণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, কর্ম্ম-তৎপরতা ও ব্যবসায় বুদ্ধির এমন একটা বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল যে,

তাহাতে সমগ্র ব্যবসায়ের জীবন-প্রবাহে অভিনব-শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, এবং সকলেই তাঁহার প্রতিভার গুণ-মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

তিসির আড়তে শ্যামাচরণ যখন নবাগত, সেই সময় জনৈক ইহুদী উক্ত আড়ত হইতে ২৪ হাজার টাকা তিসি ক্রয় করেন। এইরূপ খরিদ বিক্রয়ের কার্য্য প্রায় দালালের মধ্যস্থতাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মূল ক্রেতার সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। দালালের মারফৎ মালের দর দস্তুর ঠিক হইয়া বায়না স্বরূপ দালাল কিছু টাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মাল জাহাজে বোঝাই-য়ের জন্য জেটিতে পাঠাইয়া দিয়া তৎপর নিরূপিত দিবসে বিল লইয়া ক্রেতার নিকট উপস্থিত হইলে টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এইরূপ সর্ত্তে মাল বিক্রীত হইয়াছিল।

এই ইহুদী পূর্ব্বে আরও দুই একবার তাঁহাদের সহিত কারবার করিয়াছিল। তাঁহারা সেই বিশ্বাসে এবারও মাল পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা নিরূপিত

দিবসে ক্রেতার নিকট হইতে মালের মূল্য বাবদ টাকা আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, সেই ইহুদী দেশ ছাড়িয়া ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদে পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্র বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহারা অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, উক্ত ইহুদীক্রেতা এ দেশে স্থায়ি-ভাবে বাস করে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎপন্ন পণ্য ক্রয় করিয়া দেশান্তরে চালান দেওয়াই তাহার কার্য্য। অন্য দেশের মালও সেই ব্যক্তি এদেশে চালান দিয়া থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তি যখন অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ভাল নহে, এবং তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবারও কোন উপায় নাই।

এইরূপ ব্যাপারে পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্রের তিসির কারবার একবারে বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, এই ব্যাপারে সাধুচরণের বিশেষ কেরামতী ছিল। কারণ তিনি তখন সবে মাত্র ইঁহাদের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গদিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই ইহুদী ক্রেতার সহিত সাধুচরণের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল; তাহার দালালও সাধুচরণের সুপরিচিত। পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্রের কারবারকে নষ্ট করিতে পারিলে নূতন মনিবের উন্নতির সম্ভাবনা। সুতরাং ইহুদী ও তাহার দালালকে নানারূপে আকৃষ্ট করিয়া সাধুচরণ তাঁহার দীর্ঘকালের প্রাপ্ত উপকার ও কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

সাধুচরণ যতদিন হাটখোলার তিসির আড়তে কাজ করিয়াছিলেন, ততদিন পুরাতন ও দক্ষ-কর্ম্মচারী বলিয়া আড়তের সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতেন। উল্লিখিত ইহুদী ক্রেতার সহিত তিনি ছাড়া আর কাহারও কোন-রূপ পরিচয় ছিল না। পূর্ব্ববারের ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে সাধুচরণই ইহুদীর কাছে যাইতেন, টাকা কড়ি লইয়া আসিতেন। সুতরাং তিনি ছাড়া এই ইহুদীর পরিচয় এই কারবারের আর কাহারও জানা ছিল না।

সকলেই বুঝিতে পারিল, ইহার মধ্যে সাধুচরণের ষড়যন্ত্র বিদ্যমান। এইরূপ মোটা টাকা জুয়াচোরের

চক্রান্তে নষ্ট হওয়ায়, পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্র বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাদিগের কারবার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু দুই একজন বন্ধু তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কারবার বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারও অবশেষে বুঝিলেন যে, বন্ধুগণের উপদেশ নিরর্থক নহে। কথায় আছে—"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে।" সুতরাং ব্যবসায় বন্ধ না করিয়া কোনমতে তাঁহারা উহা সচল রাখিলেন।

সে সময়ে তাঁহাদের মূল ধনের পরিমাণ অধিক ছিল না। সেই টাকার মধ্য হইতে এতগুলি টাকা এমনভাবে লোকসান হওয়ায় তাঁহারা প্রকৃতই বিপদ-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, এইরূপ অবস্থায় তাঁহাদের কারবার আরও এক বৎসর চলিল। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতে লাগিল। মূল ধনের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় সুপ্রণালীতে কারবার পরিচালনে তাঁহারা অক্ষম হইয়া পড়িতে-ছিলেন।

এমন সময় হঠাৎ একটি অভাবনীয় ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। সেই ব্যাপারে শ্যামাচরণের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে সেই কারবার পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতাবস্থায় দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। একদিন জনৈক য়ুরোপীয় পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি সেই আড়তে আসিয়া বহু সহস্র টাকার তিসি খরিদ করিলেন। সমস্ত মাল ওজন হইয়া বস্তাবন্দী হইলে, মাল চালান দিবার সময়, শ্যামাচরণ বলিয়া বসিলেন যে, গদিতে মালের মূল্যবাবদ সমস্ত টাকা নগদ জমা না দিলে, মাল ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। কারণ, কোন অপরিচিত ... লোকের সহিত নগদ টাকা ভিন্ন কারবার করা হয় না।

ইতিপূর্ব্বে সেই শ্বেতাঙ্গ এই মালের বায়না বাবদ অনেক অর্থ জমা দিয়াছিলেন। লোকটি আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, সেই মালের মূল্যবাবদ বাকী টাকা নগদ মিটাইয়া দিলেন। টাকা বুঝিয়া লইয়া নিরাপদস্থানে রক্ষা করিয়া, শ্যামাচরণ শ্বেতাঙ্গকে নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাকে স্পষ্ট-

ভাষায় বলিলেন যে, বিগত বৎসরে চব্বিশ হাজার টাকার তিসি তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য এখনও বাকী। তাহা এখনই দিতে হইবে। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্বেতাঙ্গ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

সেই সময় শ্যামাচরণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, অদ্যই টাকা পরিশোধ না করিলে চলিবে না। শ্বেতাঙ্গ বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার নিকট এমন অর্থ নাই যে, পূর্ব্বের প্রাপ্য শোধ করিতে পারেন; কল্য লোক পাঠাইলে তাহার কাছে তিনি পূর্ব্ব বৎসরের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবেন।

শ্যামাচরণ সে কথায় কোনও উত্তর না দিয়া গদিতে ফিরিয়া গেলেন এবং কুলিদিগকে হুকুম করিলেন, তাহারা অবিলম্বে যেন বিক্রীত মালগুলি বস্তা খুলিয়া গুদামে লইয়া যায়। শ্বেতাঙ্গ শ্যামাচরণের সঙ্গে সঙ্গেই গদিতে আসিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব, টাকাটা আমরা পূর্ব্ব বৎসরের প্রাপ্য, মায় সুদ কাটিয়া লইলাম। এখন এই মালের দাম নগদ মিটাইয়া দিলে তবে এই মাল আপনি পাইবেন।"

তথায় পতিতবাবু ও গোবিন্দচন্দ্র উভয়েই উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা এই ব্যাপারে বিস্ময়াভিভূত হইয়া শ্যামাচরণকে ব্যাপার কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তখন শ্যামাচরণের নিকট হইতে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, এই শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিই পূর্ব্ব বৎসরের মাল লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা শ্যামাচরণের কার্য্যের অনুমোদন করিলেন।

এদিকে ঐ ব্যক্তিরও সেই দিবস সেই মাল জাহাজে পৌঁছান আবশ্যক। নচেৎ জাহাজ ছাড়িয়া গেলে তাঁহার বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। বিলম্ব করিবার কোন উপায়ই ছিল না। তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ বলিলেন যে, তিনি কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর অফিসে হুণ্ডি লিখিয়া দিতেছেন, মাল ছাড়িয়া দেওয়া হউক। শ্যামাচরণ সম্মত হইলেন না। তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, যতক্ষণ না এই হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এস্থান হইতে মাল ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না।

শ্যামাচরণ তখন নিজেই সেই হুণ্ডি লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন এবং সেই হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া অর্থ আনয়ন করিয়া সাহেবকে মাল ছাড়িয়াদিলেন। শ্যামাচরণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে একদিনেই পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্রের মৃতপ্রায় ব্যবসায়ে আবার প্রাণসঞ্চার হইল—পুনরায় নবোদ্যমে কার্য্যারম্ভ হইল।

পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্র উক্ত ২৪ হাজার টাকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশা-শূন্য হইয়াই পড়িয়াছিলেন। মূলধনের অভাবে ব্যবসারটির ভবিষ্যৎ ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল বুঝিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে তাহারা কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্যামাচরণের বুদ্ধিপ্রভাবে অতর্কিতভাবে সুদসহ সমগ্র মূলধন ফিরিয়া পাইয়া তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না।

ক্রমে কারবারটিকে দাঁড় করাইবার যথাবিহিত ব্যবস্থা হইল। এই ঘটনা যেন দৈবী ব্যাপার বলিয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন। যে দালাল অন্যান্য

বৎসর উক্ত ইহুদীকে মাল খরিদ করিয়া দিত, এবৎসর সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। অথবা অন্য যে কোন কারণই থাকুক, কোন দালাল ইহুদীর তরফ হইতে মাল খরিদ করিতে আসে নাই। উক্ত ইহুদীও পূর্ব্ব বৎসরে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া বিশেষ প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবেন। তিনি জানিতেন যে, কারবারের মালিক বা কর্ম্মচারীরা কেহই তাহাকে চিনেন না। সুতরাং ভিন্ন নামে যদি এবার মাল ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে কেহই সন্দেহ করিবে না যে, উভয় ব্যক্তি একই। আরও একটা কথা, ইহুদী হয়ত ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন না যে, পূর্ব্ব বৎসরে কোন্ কোন্ স্থান হইতে মাল খরিদ করা হইয়াছিল। যাহাই হউক, ইহুদীর মনে অসদভিপ্রায় যে ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন যে, ইহুদীকে চিনিবার তাঁহার কারণ হইয়াছিল। যে সময় পতিতবাবুদিগের আড়তের গুদাম হইতে চব্বিশ হাজার টাকার মাল জেঠিতে প্রেরিত হয়, সেই সময় তিনি এবং গদির

আরও তুইজন কর্ম্মচারী দেখিতে গিয়াছিলেন, মাল যথাস্থানে পৌঁছিতেছে কি না। সেই সময় তিনি দেখিয়াছিলেন, একজন শ্বেতাঙ্গ সেই মাল সম্বন্ধে গাড়োয়ানকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া প্রস্থান করিলেন। পর বৎসর মাল খরিদ করিতে যখন জনৈক শ্বেতাঙ্গ তাঁহাদের গদিতে আগমন করিলেন, তিনি সেই সময় হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই পূর্ব্ব বৎসরের পলাতক ক্রেতা।

কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া প্রথমে নির্জ্জন স্থানে উঁহাকে লইয়া গিয়া বাক্যালাপ করেন। কথোপকথনের অবকাশে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এই সেই পলাতক ব্যক্তি, তখন তিনি সে শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। অনাদায়ী অজস্র অর্থ তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারশক্তির প্রভাবে আবার কারবারের উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইবার সুযোগ পাইল।

শ্যামাচরণের বুদ্ধিপ্রভাবে নষ্ট বিত্তের পুনঃ প্রাপ্তিতে পতিতপাবন এই যুবকের প্রতি আরও অনুরাগী হইয়া

পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জেঠিতে আরও দুইজন কর্ম্মচারী শ্যামাচরণের সহিত মাল পরিদর্শনে গমন করিয়াছিল, তাহারাও উক্ত শ্বেতাঙ্গকে চকিতবৎ একবার দেখিয়াও ছিল; কিন্তু শ্যামাচরণ তাহাকে ভুলেন নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে এই ব্যক্তির অবয়বের একটা স্বরূপ মুছিয়া যায় নাই। তাই মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্টিপাতে শ্বেতাঙ্গকে একবৎসর পরে দেখিয়াও শ্যামাচরণের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, আর কাহারও মনে তাহা জাগে নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দিরার প্রসন্নদৃষ্টি

পতিতপাবনের মনে শ্যামাচরণের প্রতি আসক্তির আরও কারণ ছিল। তিনি দেখিলেন যে, এই যুবক শুধু, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী, মেধাবী প্রভৃতি গুণের অধিকারী নহে; এই যুবকের কর্ম্মতৎপরতার ফলে ভূষীমালের ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

পতিতপাবন আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, শ্যামাচরণ যে কার্য্য করেন, তাহা গভীর বিবেচনা সহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই—অবসাদ বলিয়া কোন অবস্থা এই যুবকের কার্য্যে প্রকাশ পাইতে তিনি দেখেন নাই। সেই কারণে পতিতবাবু তাঁহাদের কারবারের অনেকগুলি বিষয় শ্যামাচরণের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণও কি প্রকারে ন্যস্ত কার্য্যভার সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিবেন সর্ব্বদা তাহা চিন্তা করিতেন।

এই সময় তাঁহার জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে পতিতবাবুর হৃদয় শ্যামাচরণের উপর আরও গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়। যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, তখনকার কলিকাতার সহিত বর্ত্তমান কলিকাতার বিভিন্নতা অপরিসীম। সে যুগের কোন লোক যদি এখন কলিকাতায় পুনরাগমন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিবে। তখন কলের জলের নল শুধু ধনীর গৃহ ব্যতীত সাধারণ গৃহীর গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জলও সকল সময় নিয়মিতভাবে মিলিত না। এমনও শুনা যায়, নলপথে জলধারা নির্গত হইতে হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কলিকাতায় তখন ট্রামগাড়ী হয় নাই। সাধারণ-লোক প্রায় পদব্রজেই গমনাগমন করিত। সে যুগে পাল্কীর ব্যবহারই বেশী ছিল। ধনীরা অশ্বযান ব্যবহার করিতেন। সে সময় কলিকাতার রাজপথ সমূহে সর্ব্বত্র গ্যাসের আলোক ছিল না। যাহা ছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগের মত এমন উন্নত প্রণালীর নহে। বৈদ্যুতিক

আলোকের বার্ত্তা জন সাধারণের অগোচর ছিল। তখনকার জনসাধারণ কল্পনা করিতেই পারিত না যে, বৈদ্যুতিকশক্তির দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য সম্ভবপর। বৈদ্যুতিক পাখা কি প্রকার পদার্থ, অশিক্ষিত নাগরিকগণ তাহার কোন সন্ধানই রাখিত না।

সেই সময় কলিকাতায় অধিকাংশ গৃহস্থের গৃহে কূপ ছিল এবং পানীয় জলের জন্য গঙ্গা হইতে উড়িয়া ভারিগণ গঙ্গাজল আনয়ন করিত। গঙ্গার তীরবর্ত্তী লোক গঙ্গায় অবগাহন করিত। দূরবর্ত্তী স্থানের লোক কূপের জলে কিম্বা পুষ্করিণীতে স্নানকার্য্য সমাপ্ত করিত।

তৎকালে নদীতীরবর্ত্তী স্থানেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ছিল। কিন্তু এ কালে রেলের নিকট-স্থানেই ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান নিরূপিত হয়। তখন এদেশে রেলপথ এরূপ ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হয় নাই। তখন নদী-পথই গমনাগমনের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। এখনও পর্য্যন্ত নদীতীরবর্ত্তী স্থানে বড় বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়

সেই কারণেই সে যুগে কলিকাতার গঙ্গাতীরবর্ত্তী হাট-খোলা, শোভাবাজার, বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে দেশীয় লোকের কারবারের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

পতিতবাবুদিগের আড়তও গঙ্গার তীরবর্ত্তী হাট-খোলায় ছিল। সেই আড়তেই কর্ম্মচারী প্রভৃতি অবস্থান করিত। তাহাদের স্নানাহারের ব্যবস্থা আড়তেই ছিল। সেই সময় এক দিবস শ্যামাচরণ দ্বিপ্রহরে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্যামাচরণ যখনই যেখানে যাইতেন সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেন, প্রত্যেক বিষয় জানিবার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, "Eyes and no eyes," অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিতেও অনেকে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে জানে না। যাহাদের সে দৃষ্টি আছে, তাহারা সাধারণ মানব হইতে উন্নত-শক্তিশালী।

শ্যামাচরণের দেখিবার শক্তি ছিল। তাই তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়াও দৃষ্টিপথে যাহা কিছু পড়িত, সকল বিষয় দেখিতেন এবং সন্ধান লইতেন। অনাবশ্যক

কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। সে যুগে নৌকাযোগে নানাস্থান হইতে বিক্রেয় পণ্য কলিকাতার বাজারে আসিত। কোন্ ঘাটে কোন্ কোন্ মালের নৌকা আসিয়াছে, ইহা সন্ধান লইবার প্রধান হেতু এই যে, তিনি যে আড়তের সহিত সংশ্লিষ্ট, বিক্রেয় পণ্যের সন্ধান পাইলে, তাহার সুবিধা হইবে।

সেদিন গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া অনেকগুলি মাল-পূর্ণ নৌকা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তাঁহার সঙ্গিগণ স্নান সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু শ্যামা-চরণ স্থান ত্যাগ করিলেন না। তিনি নৌকাগুলিতে কি কি মাল, কি পরিমাণ আছে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন!

এখানে শ্যামাচরণের এই অনুসন্ধিৎসা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথার উল্লেখ করিলে, সম্ভবতঃ তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার এই অনুসন্ধিৎসা কিরূপ সুফলপ্রদ হইয়াছিল তাহার আভাস তাঁহার প্রথম জীবনেই দেখা গিয়াছিল।

যখন শ্যামাচরণ রমার প্রিয়পুত্ররূপে ব্যবসায়ী সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তখন এই অনুসন্ধিৎসা আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পাটের ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কৃষক-কুলকে হস্তগত করিতে পারিলে তাঁহার ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইবে। তাই তিনি তাহাদিগকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে দাদন প্রথা প্রচলিত করেন।

তিনি সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালায় কৃষিকুলের অর্থের নিদারুণ অভাব; তাহারা মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে টাকা ধার করিয়া থাকে। তিনি তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অগ্রভাবে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্ত্তছিল, বাজারদরে তাহারা যাবতীয় উৎপন্ন পাট তাঁহারই কাছে বিক্রয় করিবে। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

আলোচ্য দিনে শ্যামাচরণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, ঘাটে তিন নৌকা বোঝাই তিসি সেই দিনই আসিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্য কোন মহাজন সে সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ অবগত নহে।

শ্যামাচরণ আর কাল বিলম্ব করিলেন না। ব্যাপারীদিগের সহিত দর দাম ঠিক করিয়া তিনি বায়না স্বরূপ আপনার অঙ্গুরীয়কটি তাহাদের নিকট অর্পণ করিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আড়তে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন তাঁহার মাতুল গোবিন্দচন্দ্রই আড়তে ছিলেন, পতিতপাবন অনুপস্থিত। শ্যামাচরণ মাতুল মহাশয়কে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, এই মাল উঠাইতে পারিলে, বর্ত্তমানে বাজারের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদের লাভের বিশেষ সম্ভাবনা। গোবিন্দচন্দ্র পতিতপাবনের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রায় কোন কাজই করিতেন না। সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে না রাখিয়া, তিনি প্রধান অংশী পতিতপাবনের অনুমোদন লইয়া সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। যদি পতিতপাবন কোন কাজ করিতে অসম্মত হইতেন, গোবিন্দচন্দ্র সে কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না।

শ্যামাচরণ যে সময় উক্ত ব্যাপারের প্রস্তাব করেন, তখন কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ পতিতপাবন অন্যত্র

গিয়াছিলেন। কাজেই গোবিন্দবাবু কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না। তিন নৌকা তিসি বায়না করার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভাবিলেন, শ্যামাচরণ বয়সদোষে হয়ত হঠকারিতা করিয়া ফেলিয়াছেন। সেজন্য তিনি বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কিছু তিরস্কারও করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহার বা তদীয় কোন আত্মীয়ের দ্বারা ব্যবসায়ের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। বাস্তবিক এ বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার স্থির-দৃষ্টি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ক্ষতির আশঙ্কা করিয়াই শ্যামাচরণকে তিরস্কার করিয়া থাকিবেন।

শ্যামাচরণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার শুভেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্যের জন্য তিনি মাতুলের নিকট তিরস্কারভাজন হইলেন, তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সিক্ত বস্ত্রেই গঙ্গাতীরে ফিরিয়া গেলেন। ব্যাপারীর নিকট বায়নাস্বরূপ যে অঙ্গুরীয় জমা রাখিয়াছিলেন, উহা তাহার নিকট হইতে ফেরত

লইয়া বায়না নাকচ করিবেন ইহাই তখন তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, জনৈক মাড়বারী মহাজন সেই মাল খরিদ করিবার জন্য সেই নৌকার মহাজনকে পীড়াপীড়ি করিতেছে। মহাজন তাহাকে বলিতেছিল যে, উক্ত মাল বায়না হইয়া গিয়াছে; এবং বায়নাস্বরূপ সে যখন সুবর্ণখণ্ড হস্তে করিয়া লইয়াছে, তখন সে কোনমতেই আর সেই মাল অন্যত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ নহে।

এইরূপ সময়ে শ্যামাচরণ সিক্ত বস্ত্রেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নৌকার মহাজন তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া সেই মাড়বারীকে বলিল যে, এই ব্যক্তিই তাহার মাল বায়না করিয়াছেন। সে ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট হইতে মাল খরিদ করিতে পারে। তখন সেই মাড়বারীর সহিত সেই মালের মূল্য স্থির হইয়া গেল। শ্যামাচরণকে তিন সহস্র টাকা লভ্যাংশ দিয়া মাড়বারী মাল লইবে বলিয়া বন্দোবস্ত করিল।

তখন সেই মাড়বারী তাঁহাকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সে তাহার নিজ গদিতে টাকা আনয়ন করিতে গমন করিল; কিন্তু কোনরূপ বায়না করিয়া গেল না। শ্যামাচরণ সেই সিক্ত বস্ত্রেই তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন মাড়বারী পূর্ব্বোক্ত মালের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যখন অবগত হইল যে, সেই মাল বিক্রীত হইয়া গিয়াছে এবং শ্যামাচরণই উহার ক্রেতা। তখন সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উহা বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল; কিন্তু যুবক শ্যামাচরণ তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন উহাতে তাঁহার কোন অধিকার নাই। তখন নবাগত মাড়বারী তাঁহাকে বলিল, "আপনি ত তাহার নিকট হইতে এখনও পর্য্যন্ত কোন বায়না প্রভৃতি কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। তবে অন্যকে বিক্রয় করিতে বাধা কি? আমি তাহা অপেক্ষা আরও এক হাজার টাকা অধিক লাভ আপনাকে দিতেছি।"

যুবক শ্যামাচরণ তাহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "না তাহা হইবে না। আপনি আমাকে আর সে অনুরোধ করিবেন না। এই মালে আমার যত টাকাই লাভ হউক, আমি তাহাকে কথা দিয়াছি, সে কথা আর অন্যথা হইবে না। আপনি পারেন ত তাহার নিকট হইতে খরিদ করিবেন।"

যখন সেই মাড়বারী দেখিল যে, এই যুবককে কিছুতেই আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করিতে পারিবে না, তখন অগত্যা স্থির হইয়া প্রথম মাড়বারী মহাজনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরেই প্রথম মাড়বারী টাকা লইয়া তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং শ্যামাচরণকে তাঁহার লভ্যাংশ তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিল। শ্যামাচরণ সিক্ত বস্ত্রেই গদিতে উপস্থিত হইয়া সেই তিন সহস্র টাকা তাঁহার মাতুলের নিকট প্রদান করিলেন।

গোবিন্দবাবু সেই আকস্মিক অর্থ-প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইলেন। যখন তাঁহারা টাকা গণনা করিয়া

উঠাইতে ব্যস্ত, সেই সময়ে পতিতবাবু তথায় ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পতিতপাবন শ্যামাচরণের সাধুতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন ভাগ্যলক্ষ্মী যুবকের প্রতি সুপ্রসন্ন।

তিনি তখন সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে শ্যামাচরণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিন হাজার টাকা এই যুবক যদি গ্রহণ করিতেন, তাহাতে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারিত না। সে টাকা ন্যায় ও বিধি-সঙ্গতভাবে শ্যামাচরণেরই প্রাপ্য; কিন্তু এই নির্লোভ, সাধুচিত্ত, ধর্ম্মপরায়ণ যুবক তাহা না করিয়া কারবারে উহা জমা করিয়া দিলেন, ইহা সাধারণ মহত্ত্বের ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক নহে—এমন করিয়া লোভকে জয় করিতে পারা যে অসাধারণ শক্তির দ্যোতক তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

তাঁহার জীবনে বহুবার লোভ দমন করিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লোভ তাঁহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে নাই। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে, কোন মাল খরিদের সময় অনেক দুশ্চরিত্র ব্যবসা-

দার তাঁহাকে ওজন অথবা মূল্য সম্বন্ধে তঞ্চকতা করিতে অনুরোধ করিত। তাঁহাকে সেজন্য বহু অর্থের প্রলোভনও দেখাইত, কিন্তু তিনি ঘৃণা-সহকারে সেরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেন।

শ্যামাচরণ তখন পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্রের কারবারে অংশী হইয়া উঠেন নাই। নিজ খরচ বাবদ কারবার হইতে কখনও কখনও যৎসামান্য অর্থ গ্রহণ করিতেন। তাহাতে তাঁহার প্রয়োজনীয় অভাব কখনই মিটিতে পারে না। কিন্তু বিশ্বস্ততা বিসর্জ্জন দিয়া, হীন উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিবার প্রকৃতি লইয়া শ্যামাচরণ এই পৃথিবীতে আসেন নাই। তাই কাহারও প্রলোভনে তাঁহার বিশুদ্ধচিত্ত মলিন হইতে পারে নাই।

এখনও এমন অনেক লোক বাঁচিয়া আছেন, যাঁহারা শ্যামাচরণের সহকর্ম্মী ছিলেন, অথবা কেহ কেহ তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে এই বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু সকল ঘটনা, বাহুল্য ভয়ে বিবৃত করা যায় না। এইখানে শুধু একটি ঘটনার কথা লিখিত হইল।

একবার কোন ব্যবসায়ীর নিকট পতিতপাবন ও গোবিন্দচন্দ্র বহু পরিমাণে কোন মাল খরিদ করেন। শ্যামাচরণ সেই মাল ওজন করিয়া আনিবার ভার লইয়াছিলেন। তথায় সেই মহাজনের কোন কর্ম্মচারী তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। ওজনের সময় হেরফের করিয়া দিলে তাঁহাকে দুইশত মুদ্রা দেওয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি এরূপ ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি পতিতবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ঐ প্রকার অধার্ম্মিক ব্যবসাদারের নিকট হইতে যেন ভবিষ্যতে মাল খরিদ করা না হয়।

এইরূপে বহুস্থানে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কখনও কেহই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় নাই। উত্তরকালে যখন তিনি স্বয়ং ব্যবসায়িরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। তিনি জানিতেন সকল কর্ম্মচারী প্রলোভনের অতীত নহে। আপাতমনোরম প্রবল আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া দুর্ব্বলচেতা মানুষ অনেক সময় মনিবের অনিষ্ট সাধন করিয়া ফেলে, সেই কারণে

তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মচারিবর্গের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় কোনও মাল তাঁহার কার-বারে কখনও ওজনে কম বেশী হয় নাই এবং এজন্য তাঁহাকে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীলাভ

শ্যামাচরণের বয়স যখন প্রায় ২৬ বৎসর তখনও তাঁহার মাতা এবং ভ্রাতা ধান্যকুড়িয়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কর্ম্মের অবকাশে শ্যামাচরণ ধান্যকুড়িয়ায় আসিয়া মাতা ও ভ্রাতাকে দেখিয়া যাইতেন।

এই সময়ে তাঁহার জননী শ্যামাচরণের বিবাহের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। নানাস্থানে তিনি কন্যার অনুসন্ধানও করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সকলেই ইতস্ততঃ করিতেছিল। কারণ, একে তাঁহারা পরগৃহবাসী, ভূ-সম্পত্তি শূন্য; তাহার উপর তাঁহার পুত্রও নিজে কোনরূপ ব্যবসায়ের মালিক নহেন। শুধু তিনি মাতুলের কারবার পরিচালনে সাহায্য করিয়া প্রয়োজনানুরূপ কখনও কখনও সামান্য টাকা লইয়া থাকেন।

ধরিতে গেলে সে সময়ে জগতে শ্যামাচরণের নিজস্ব বলিয়া কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র স্বজাতি-বর্গের মধ্যে তিনি উচ্চ শ্রেণীর কুলীন ছিলেন; কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য তাঁহার কৌলিন্যকে সে সময় রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল কারণে শ্যামাচরণের মাতা কোন স্থানেই শ্যামাচরণের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন নাই।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামের মধ্যে পতিতপাবন বাবুর আর্থিক অবস্থা সে সময় সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল এবং তিনিই গ্রামের মধ্যে ধনী বলিয়া আখ্যাত। তাঁহার পরেই গোবিন্দ বাবু। তখন পতিতপাবনের এক পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কন্যার নাম দাক্ষ্যায়ণী, পুত্রের নাম উপেন্দ্রনাথ। ভবিষ্যতে এই উপেন্দ্রনাথই নানাপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জন সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং বসিরহাট মহকুমার মধ্যে প্রথম গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত রায় বাহাদুর উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, পতিতবাবু শ্যামাচরণের অশেষ গুণ-রাশি দর্শনে দিন দিন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একমাত্র আদরিণী কন্যাকে শ্যামাচরণের হস্তে দান করেন। কেবল কথা উত্থাপনের কোন উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত না হইয়া তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বংশমর্য্যাদা হিসাবে শ্যামাচরণের হস্তে কন্যা সম্প্রদান প্রশস্ত। সেজন্য সমাজে তাঁহাকে অপদস্থ হওয়া দূরে থাকুক বরং তাঁহার মুখ এবং কুল আরও উজ্জ্বল হইবে। শ্যামাচরণ শুধু দরিদ্র, তাহা ছাড়া সর্ব্বাংশেই পাত্রটি উপযুক্ত। এই যুবক যেরূপ গুণ সম্পন্ন, তাহাতে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সোনার ঝাঁপি উজাড় করিয়া শ্যামাচরণের শিরে সাফল্যের আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিবেন। যাহার ধর্ম্মে অচলা মতি আছে, যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত এবং প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান, ইন্দিরা কখনই তাঁহার ললাটে জয়টীকা অঙ্কিত করিতে বিস্মৃত হন না।

আর যদি তর্কের অনুরোধে ধরা যায় যে, শ্যামাচরণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। তাহা হইলেও

পতিতপাবনের যাহা কিছু বিত্ত আছে, তাহা হইতে কিছু এই যুবককে দান করিলে, তদ্দ্বারা শ্যামাচরণ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবেন। দূরদর্শী পতিতপাবন এইরূপে সকল দিক বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন যে, শ্যামাচরণের হস্তেই তাঁহার প্রাণসমা দুহিতাকে সমর্পণ করিবেনই।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি একদিন শ্যামাচরণের মাতার সম্মতি লইবার অভিপ্রায়ে ধান্যকুড়িয়ায় আগমন করেন। তাঁহার মনের এই গোপন অভিপ্রায় তিনি ঘুণাক্ষরেও কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। কেহ কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, পতিত-পাবনের ন্যায় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কপর্দ্দক হীন, বাসগৃহ শূন্য দরিদ্র যুবকের হস্তে একমাত্র কন্যা সমর্পণ করিতে পারেন।

যেদিন পতিতপাবন ধান্যকুড়িয়ার বাটীতে আগমন করেন, সেই দিনই শ্যামাচরণের মাতা গ্রামস্থ কোন প্রতিবেশী গৃহস্থের অনূঢ়া কন্যার সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ প্রস্তাব করিতে গিয়া অত্যন্ত লাঞ্ছিতা হইয়া-

ছিলেন। শ্যামাচরণের মাতা উক্ত প্রতিবেশীর কন্যার সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেই অপর পক্ষ নির্ম্মমভাবেই তাঁহাকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার অত্যন্ত দুঃসাহস, তাই তিনি তাঁহার কন্যার সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ দিতে চাহেন। যাহার কিছুই নাই, সে কি করিয়া এমন প্রস্তাব করিতে পারে? বিবাহের পর পুত্রবধূকে দাঁড় করাইবার মত যাহার আশ্রয় নাই, তাহার এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার মত উপহাস্য নহে?

মর্ম্মাহতা বিধবা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিবেশীর রূঢ়, কঠোর ধিক্কার তাঁহার চিত্তকে বিচলিত, পীড়িত এবং ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া তিনি পতিপাবনকে দেখিতে পাইলেন। আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া, তিনি পতিতপাবনের কাছে বলিয়া ফেলিলেন, পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিতে গিয়া কি ভাবে তিনি প্রতিবেশীর নিকট অপমানিত হইয়াছেন। এরূপ রূঢ়ভাবে তাঁহাকে মর্ম্মবেদনা দেওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য হয় নাই। তিনি দরিদ্র হইতে পারেন, কিন্তু

তাই বলিয়া তাঁহাকে এমনভাবে মর্ম্মবেদনা দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

পতিতপাবন সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "কেহ যখন তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত নহে, তখন আমিই আমার কন্যা দাক্ষায়ণীকে তোমার পুত্রের হস্তে দান করিব, ইহা নিশ্চয়।"

শ্যামাচরণের জননী প্রথমে পতিতপাবনের এই কথা বিশ্বাস করিতেই পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। নয়ত পতিত বাবু দরিদ্র বলিয়া তাঁহার সহিত বিদ্রূপ করিতেছেন; কিম্বা মিথ্যা বাক্যে আশ্বাসিত করিতেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি পতিত বাবু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। পতিত বাবু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন বিদ্রূপের সম্পর্ক তাঁহার সহিত নাই। বিশেষতঃ মিথ্যা বাক্য পতিত বাবুর মুখ হইতে কখনও উচ্চারিত হয় না। তবে একথা বলিবার অর্থ কি ?

তাঁহার এইরূপ স্তম্ভিত ভাব লক্ষ্য করিয়া পতিত-পাবন তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি

বলিলেন, "তুমি মনে করিতেছ, আমি বিদ্রূপ কিম্বা মিথ্যা বলিতেছি, কিন্তু তাহা নহে। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এই মাসেই আমি এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিব এবং সেই জন্যই আমি দেশের বাটীতে আগমন করিয়াছি। অন্য অন্য বন্দোবস্ত আমি সব ঠিক করিয়াছি, সে জন্য কিছুই চিন্তার আবশ্যক নাই। কেবল তোমার মতের অপেক্ষা।"

শ্যামাচরণের মাতা আনন্দে অধীর হইয়া তখনই মত দিলেন। ক্রমে এই কথা সমস্ত গ্রামের মধ্যে রাষ্ট হইয়া পড়িল। সকলেই অবগত হইল, গ্রামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও মানী পতিত বাবু তাঁহার একমাত্র কন্যাকে একটি নিরাশ্রয় সহায় সম্বল হীন দরিদ্র যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিবেন। অনেকে সে সময়ে পতিত বাবুকে নানা রূপে নিবারণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। পতিত বাবু দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা আমি এই বিবাহ দিব। যদি আমার কন্যা কষ্ট পায়, তাহা হইলে আমার যাহা কিছু আছে তাহাতেই তাহাদের চলিয়া যাইবে।"

আপত্তিকারীরা নির্ব্বাক হইয়া গেল। পিতা স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করিবেন, ইহাতে কথা কহিবার কিই বা আছে। বিশেষতঃ তৎকালে পতিত বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলিতে সেই গ্রামের মধ্যে কেহই সমর্থ ছিল না। তখন সকলে সেই বিবাহে এক বাক্যে অনুমোদন করিল। গোবিন্দচন্দ্র ইহাতে আন্তরিক আনন্দ লাভ করিলেন। শ্যামাচরণকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার কর্ম্ম কুশলতা ও চরিত্রের বিশিষ্টতায় তিনি ভাগিনেয়ের বিশেষ গুণমুগ্ধও হইয়াছিলেন। পতিতপাবন শ্যামাচরণের হস্তে স্বেচ্ছায় কন্যাদান করিতেছেন, ইহা তিনি শুভলক্ষণ বলিয়াই মনে করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন।

পতিত বাবু যখন দেখিলেন, এই বিবাহে কোনদিক হইতে আর কোন গোলমালের সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি তাঁহার একমাত্র স্নেহের কন্যা দাক্ষায়ণীর সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ দিলেন। এই বালিকাই পরে আদর্শ নারী রূপে, স্নেহ ও কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী রূপে,

মমতাময়ী সুগৃহিণী রূপে, স্নেহশীলা জননী রূপে শ্যাম বল্লভের গৃহে চির কল্যাণময়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের জীবনের সাফল্য বোধহয় দাক্ষায়ণীর সাহায্যে ও প্রেমের ফলেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এইরূপ উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী না পাইলে হয়ত শ্যামা-চরণের সাফল্য এমন পরিপুষ্টতা লাভ করিত না।

দাক্ষায়ণী স্বামীর সকল সৌভাগ্যের সোপান ছিলেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্যামা-চরণের গৃহলক্ষ্মী রূপে যখন তিনি প্রথম স্বামিগৃহে গমন করিলেন, তখন শ্যামাচরণের দরিদ্র দশা। কিন্তু প্রিয়ভাষিণী, সেবাপরায়ণা এই নারী হাস্যমুখে স্বামীর সকল দুঃখের অংশ স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিনের জন্যও এই ধনিকন্যার আনন, দরিদ্র স্বামীর ক্ষুণ্ণ অবস্থায় ম্লান হইয়া পড়ে নাই।

আবার উত্তরকালে যখন শ্যামাচরণ সৌভাগ্যের উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া অসামান্য বিত্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, তখনও সদানন্দময়ী দাক্ষায়ণী বিন্দুমাত্র বিচলিতা হন নাই। সুখে দুঃখে, সম্পদে

বিপদে সর্ব্বদাই এই মহিলা আপনার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন।

দাক্ষায়ণীর দানশীলতার প্রসিদ্ধি আছে। দুস্থ, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত তাঁহার দ্বার হইতে কখনও বিরস মুখে ফিরিয়া যায় নাই। মূর্ত্তিমতী মমতার ন্যায় তিনি সকল সময়ই জননীরূপে সকলকে স্নেহসুধা দানে ধন্য করিতেন। তাঁহার গর্ভজ সন্তানগণ যেমন তাঁহার কাছে প্রিয় ছিল, দরিদ্র সাধারণের প্রতিও ঠিক অনুরূপ সন্তান-বাৎসল্য তাঁহার কার্য্য ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সংঘর্ষের সূত্রপাত

বিবাহকালে শ্যামাচরণের বয়স ছাব্বিশ সাতাইশ বৎসর হইয়াছিল। বিবাহের উৎসবাদির পর শ্যামাচরণ পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার জীবন সমভাবেই চলিতে লাগিল। তিনি পূর্ব্ববৎ পতিত বাবু এবং তাঁহার মাতুলের কারবারে লিপ্ত রহিলেন। নিজের বলিতে তখনও তাঁহার কিছুই ছিল না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে শ্যামাচরণের মাতুলবর্গ বিভিন্ন কারবার করিতেন; কিন্তু সংসারে তাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার হইয়া অবস্থান করিতেন। সে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন এযাবৎ হয় নাই। শ্যামাচরণের বিবাহের তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ শ্যামাচরণের কলিকাতার কারবারে যোগ দিবার দুই এক বৎসর পরেই তাঁহার মাতুলবর্গ আর একান্নবর্ত্তী হইয়া

থাকিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সকলেই ভিন্ন ভাবে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের মাতা গোবিন্দ বাবুর সংসার ভুক্ত হইয়াই অবস্থান করিতেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি পৃথক ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তবে তখন তিনি নিরুপায়। ইচ্ছা থাকিলেও স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতিবার কোন উপকরণই তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কাজেই গোবিন্দচন্দ্রের পরিবারভুক্ত হইয়া কোনরূপে তিনি দিনযাপন করিতে-ছিলেন।

শ্যামাচরণের বিবাহের পর, ভ্রাতার সংসারে অবস্থান করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা ছিল না। স্বতন্ত্র ভাবে গৃহস্থালী পাতিতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কারণ, তাঁহার পুত্র ধনীর কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, আবার শীঘ্রই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথের বিবাহ হইবে। তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আগমন করিলেও ভ্রাতার সংসারে তাঁহাকে স্থায়িভাবে রাখিবার সুবিধা নাই। কন্যা-

প্রতিমা বধূকে তিনি আপনার কাছে রাখিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়ের কথা শ্যামা-চরণের নিকট প্রকাশ করিলেন। শ্যামাচরণ মাতার অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া বিশেষ বিচলিত হইলেন। সাংসারিক জ্ঞান তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তিনি মাতুলের কারবারে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন। সেই ব্যবসায়কে সফল করিয়া তুলিবার জন্য একাগ্রমনে তপস্যা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু পারিশ্রমিক বলিয়া কিছুই তিনি লয়েন নাই। তাঁহারাও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে কিছুই দেন নাই;

তিনি জানিতেন, মামা পরমাত্মীয়, তাঁহার নিকট হইতে কিছু লওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাতুল গোবিন্দ বাবুও ভাবিতেন, ভাগিনেয় পুত্রবৎ প্রতিপাল্য, তাহাকে আবার পৃথক রূপে কি দিব? শ্যামাচরণের প্রায় বিশেষ কিছুই নিজস্ব খরচের আবশ্যক হইত না, সামান্য দুই একখানি পরিধেয় বস্ত্র, কিম্বা উত্তরীয় হইলেই তখনকার ভদ্রতা রক্ষা হইত।

সে যুগে জামা জুতার বাহুল্যের প্রয়োজন সাধারণতঃ অনুভূত হইত না। জন সাধারণ সাধাসিধা ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ধনী বিলাসীরাই কেবল বিলাসের উপকরণ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। সাধারণ গৃহস্থ লোকের ধুতি, চাদর এবং সামান্য মূল্যের এক জোড়া জুতা হইলেই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সে যুগের লোক বুঝিত, "দীয়তাং ভূজ্যতাং"। আত্মীয় কুটুম্বকে আদর করা, কোন পর্ব্ব উপলক্ষে ব্যয় করা, দেবার্চ্চনা এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবাকেই জীবনের বিলাস বলিয়া মনে করিত।

শ্যামাচরণের তখন নিজের সংসার বলিতে বিশেষ কিছুই ছিল না। আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোপণের কোন প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নাই। অঙ্গাচ্ছাদনের মোটামুটী বস্ত্রাদি তিনি কারবার হইতেই পাইতেন। মাতা এবং ভ্রাতার জন্যও বিশেষ চিন্তা ছিল না। কারণ, তাঁহারা মাতুলের সংসারে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের যাহা আবশ্যক, তাহা তাঁহার মাতুলই সরবরাহ করিতেন। সুতরাং সংসারের বিশেষ

প্রয়োজনীয় দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

কিন্তু মাতার নিকট হইতে আভাস পাইয়া তাঁহার জ্ঞাননেত্র সহসা উন্মীলিত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, আর সেরূপ ভাবে এখন নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এখন তিনি বিবাহিত, অচিরে তাঁহার সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার উপর শীঘ্রই তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ দিতে হইবে। ক্রমেই সংসারে পোষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তখন তাহাদিগকে কিরূপে প্রতিপালন করিবেন? কোন্ স্থানেই বা তাহারা মাথা গুঁজিয়া থাকিবে?

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিলেন, এক্ষণে তাঁহার নিজের অর্থের আবশ্যক। কিন্তু এ অর্থই বা তাঁহার কোথা হইতে আসিবে? মাতুল কিম্বা শ্বশুরের নিকট তিনি উহা হাত পাতিয়া চাহিতে পারিবেন না, চাহিলেও যে তাহা মিলিবে, সে সম্ভাবনা কোথায়?

তাঁহার মাতুল এবং শ্বশুর উভয়েরই ইচ্ছা যে, কর্ম্মকুশল শ্যামাচরণ যেরূপ অবস্থায় আছেন সেইরূপ অবস্থায় থাকুন। যাহা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তাহা তাঁহারা দিবেন। অর্থাৎ শ্বশুর ঠিক করিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যা এক্ষণে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবে, শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে সেখানে যাইবেন। কন্যার ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিবেন। এদিকে শ্যামাচরণের পরিশ্রম এবং বুদ্ধির প্রভাবে তাঁহাদিগের কারবার ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে।

মাতুলেরও ঠিক সেইরূপই অভিপ্রায়। শ্যামাচরণের পত্নীর ভার এক্ষণে তাঁহাকে লইতে হইবে না। কেবল মাতা ও ভ্রাতা—তাহা যেমন ভাবে চলিতেছে তেমনই চলিতে থাকুক; কিন্তু শ্যামাচরণ এমনভাবে আর অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত জীবন যাপন করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার মনে এমন ইচ্ছাও জন্মিয়াছিল যে, ইহারা যদি নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক স্বরূপ তাঁহাকে মাসে মাসে কিছু অর্থ দেন, তাহা হইলে

তাঁহার পক্ষে সুবিধা হয়। তিনি সেই অর্থের দ্বারা মাতা, ভ্রাতা এবং পত্নীর ভরণ-পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, কেহই সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। তাঁহাদের যে সেরূপ অভিপ্রায় আছে, তাহাও তাঁহাদের ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না।

বিবাহের পর প্রায় এক বৎসর সমভাবেই অতীত হইল। তখন দুই পক্ষই অর্থাৎ পতিতপাবন এবং শ্যামাচরণের পক্ষ বিবাহের আনন্দেই বিভোর ছিলেন। তাহার পরে কিছু দিবস অন্তে শ্যামাচরণ কোন লোকের দ্বারা পতিত বাবুর নিকট পারিশ্রমিক সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। পতিত বাবু সে কথা শুনিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দেন।

তিনি বলেন যে, তাঁহার জামাতার অভাব কিসের? শ্যামাচরণ তখন কারবার হইতে নিজের জন্য সামান্য কিছু অর্থ লইতেছিলেন। এইরূপে আরও কিছু দিবস অতীত হইল, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ লইতে আরম্ভ করায় শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিলেন, পতিতপাবন, তাহাতে

অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। শ্যামাচরণ ইহাতে মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

ইচ্ছা করিলে শ্যামাচরণ সেই কারবার হইতে নানা-ভাবে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি জানিতেন, এরূপভাবে অর্থার্জ্জন করা অন্যায়। উহাতে পরিণামে মঙ্গল হয় না—উপার্জ্জিত অর্থও স্থায়ী হইতে পারে না। সাধুতা ও বিশ্বস্ততাই মানুষের উন্নতির সোপান। উহা রক্ষা করিতে না পারিলে পাপ হয়। সে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। শ্যামাচরণ পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। অসাধুতা হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে আপনাকে রক্ষা করিতেন।

শ্যামাচরণের অন্তঃকরণ অত্যন্ত মহৎ ছিল। কোন প্রকার নীচ প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। কাজেই তিনি ধর্ম্মের পথে, সত্য ও ন্যায়কে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পারিশ্রমিকের ব্যাপার লইয়া শ্বশুর জামাতার মধ্যে মনান্তরের প্রাচীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার

উপক্রম হইল। অবশ্য সেজন্য পতিতপাবনকে বিশেষ দোষী করা যায় না। কারণ, ঠিক সেই সময় তাঁহাদের কারবারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছল ছিল না। কোন বিশেষ কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা আয় কম হইতেছিল। তাহার উপর তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যা দাক্ষায়ণীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাঁহার পত্নীও সেই কন্যাকে মুহূর্ত্ত-কাল দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না।

তাঁহাদের মনে অবশ্য এমন ইচ্ছা ছিলনা যে, কন্যাকে চিরকাল গৃহে রাখিবেন। তবে তৎকালে কন্যার বয়ক্রম অল্প এবং শ্যামাচরণেরও তখন নিজের কোনরূপ গৃহ ছিল না। এজন্য পতিতপাবন ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কন্যা আরও কিছুকাল তাঁহার নিকট অবস্থান করে। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন। ততদিন শ্যামাচরণ তাঁহার নিকটই অবস্থান করেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পতিতপাবন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামাচরণও তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্যামাচরণকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই সঙ্কল্প তাঁহার মনে বরাবরই জাগরূক ছিল। সেই ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাহার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্যামাচরণের দ্বারা ধান্যকুড়িয়া গ্রামে যে ভূমি এবং বাটী বাস করিবার উদ্দেশে ক্রীত হয়, তাহা পতিত বাবুরই পূর্ব্ব আয়োজনের ফল। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক না থাকিলে সে সময় সে বাটী সহজে ক্রীত হইতে পারিত কি না তাহা সন্দেহ।

যাহা হউক, শ্যামাচরণ যে সে সময় তাঁহার শ্বশুর, পরম উপকারক,উদার-হৃদয় পতিত বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন, সে ইচ্ছা তাঁহার একবারেই ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পতিত বাবুর মতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। কারণ, শ্যামাচরণ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। জগতের মধ্যে জননীকে তিনি সাক্ষাৎ ইষ্টদেবী জ্ঞানে মনে মনে পূজা

করিতেন। সেই সময় তাঁহার মাতারও বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎ তিনি আর সকল কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। শ্রান্তি ও ক্লান্তিভারে তাঁহার দেহ অশক্ত হইয়া পড়িতেছিল। মাতাকে আর তিনি কোনপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে দিবেন না, ইহাই শ্যামাচরণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল। জীবনের অবশিষ্টকাল যাহাতে জননী নিরুদ্বেগে ও স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। ইহাই ছিল শ্যামাচরণের মন্ত্র।

তিনি জানিতেন, মাতা কত কষ্টে, কত দুঃখে শৈশবে তাঁহাদিগকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াই স্বামীর ভিটা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যদিও ইদানীং অন্ন বস্ত্রের দারুণ অভাব তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই, কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন নাই।

ভ্রাতাদিগের সংসারের আহার্য্য তণ্ডুলের জন্য ধান্য ভানা, গোশালার কার্য্য, পাকশালার যাবতীয়

কর্ম্ম তাঁহাকেই করিতে হইত। ভ্রাতৃবৃন্দ যতদিন একান্নবর্ত্তী ছিলেন, তখন পরিবারের মহিলাগণের মধ্যে কার্য্য-বিভাগ ছিল। কিন্তু এক্ষণে গোবিন্দচন্দ্র পৃথক হওয়ায় সংসারের কর্ম্মভার বেশী পরিমাণে তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল। বয়োবৃদ্ধি হেতু তিনি ইদানীং আর তেমন পরিশ্রম করিতে পারিতেন না।

শ্যামাচরণের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার পিতামহী-সংক্রান্ত অনেক কথা সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে, সে যুগে তাঁহার পিতামহী তাঁহার সহোদরের গৃহে নানাবিধ অসুবিধায় দিনযাপন করিয়াছিলেন। সত্য বটে, গোবিন্দচন্দ্র সহোদরার অন্নবস্ত্রাদি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিতেন; কিন্তু তথাপি তাঁহাকে একবস্ত্রে বহু সময় যাপন করিতে হইত। সিক্ত বস্ত্র অনেক সময় অঙ্গের উত্তাপেই শুকাইয়া যাইত; অথবা পার্শ্ববর্ত্তী কুম্ভকারদিগের পণের অগ্নিতে শুকাইয়া লইতেন।

মাতৃভক্ত শ্যামাচরণ জননীর এই সকল কষ্টের বিষয় অবগত হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিতেন। তিনি বুঝিলেন, স্বাবলম্বী না হইতে পারিলে, জননীর এই দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা যাইবে না। জননী এই দুঃখ নির্ব্বাকভাবে এতকাল সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। আর তিনি সন্তান হইয়া, মাতার দুঃখ কষ্ট অপনোদনের জন্য চেষ্টা না করিয়া, নিরুদ্বেগে এতকাল নিশ্চিন্ত ছিলেন! এজন্য আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মাতার কষ্টের কথা প্রথম যেদিন তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন যে, জননীর দুঃখের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কাজ করিবেন—মাতার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগের প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিন্দুমাত্রও নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

প্রায়ই দেখা যায়, অনেক মহৎ ব্যক্তির জীবনে কর্ম্মের বীজ সামান্য সূত্র অবলম্বনে অঙ্কুরিত হইয়া

কালক্রমে বিশাল মহীরূহে পরিণত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এসম্বন্ধে অজস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। আইরিশ রাজনৈতিক নেতা ডি ভেলেরা মাতার গৃহে পুলিশের বলপূর্ব্বক প্রবেশ দেখিয়া সিন ফিন দল গঠন করেন। সেই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র আইরিশ জাতিকে উত্তেজিত ও পরিচালিত করিয়া স্বাধীনতা-সমরে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ডি ভেলেরার হৃদয়ে যে অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল, জননীর শয়নকক্ষে পুলিশের প্রবেশ হইতেই তাহা জাগ্রত ও শক্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। আয়ার্লণ্ডের ইতিহাসে ডি ভেলেরার কীর্ত্তি অমর হইয়া থাকিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যধর্ম্ম

শ্যামাচরণের মনে জননীর দুঃখ প্রগাঢ়ভাবে রেখাপাত করিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে উপায়ে হউক মাতার কষ্ট দূর করিতে হইবে। তাই তিনি পতিত বাবুর নিকট পারিশ্রমিক-স্বরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পৌরুষ ছিল—পুরুষকারের উপাসক তিনি ছিলেন। কাহারও নিকট হইতে দয়ায়ত্ত দান গ্রহণের মত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না।

তিনি জানিতেন যে, তিনি মাতুল ও শ্বশুরের ব্যবসায়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন; অথচ বিনিময়ে এযাবৎ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এখন প্রয়োজন হইয়াছে, তাঁহার শ্রম ও বুদ্ধিমত্তার বিনিময়-মূল্য আংশিকভাবেও তিনি কেন পাইবেন না?

শ্যামাচরণের জননী তাঁহার ভ্রাতার পরিবারে যে, বিশেষ কষ্টে জীবন যাপন করিতেছিলেন, পতিত বাবু তাহা জানিতেন না। বিধবা এসকল কথা প্রকাশ করিয়া আত্মসম্মান খর্ব্ব করার পক্ষপাতিনী ছিলেন না, বলিয়া কাহাকেও নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা জ্ঞাপন করিতেন না।

শ্যামাচরণ কেন পারিশ্রমিকের জন্য সহসা এত পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, সেকথা পতিতপাবনকে ব্যক্ত করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ঘরের এসকল কথা ব্যক্ত করায় পৌরষ নাই। উহাতে অন্যের নিকট হীন হইতে হয়।

পতিত বাবুর হৃদয় অতি উদার ছিল, বাস্তবিক তিনি যদি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত অন্য ব্যবস্থা হইত। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় তিনি জামাতার পারিশ্রমিকের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শ্যামাচরণ যখন দেখিলেন যে, অর্থ না হইলে মাতার দুঃখ দূরীভূত হইবে না এবং সেই

অর্থ বর্ত্তমানে মাতুল কিম্বা শ্বশুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ইঁহাদের কোনরূপ মর্ম্মবেদনার কারণ না হইয়া আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক যে, তাঁহারা তাঁহার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে স্বতঃই কোন ব্যবস্থা করেন কি না ?

শ্যামাচরণ তাঁহার শ্বশুর পতিতবাবুকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার প্রধান চেষ্টা ছিল যে, কোনও কারণে পতিতপাবনের অন্তরে তাঁহার দ্বারা যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে। এজন্য তিনি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে, যদি কারবার হইতে নিয়মিতভাবে তাঁহাকে একটা পারি-শ্রমিক অথবা ব্যবসায়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দিবার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে তিনি আর এই ব্যবসায়ের সংস্রবে থাকিবেন না। হয় তিনি অন্যত্র চাকরী করিবেন, নচেৎ কোনরূপ উপায়ে স্বয়ং একটা কোন কারবার স্থাপন করিবেন।

ইহার পূর্ব্ব হইতে তাঁহার হৃদয়ে পাটের ব্যবসা করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পতিত বাবু সে সম্বন্ধে মত করেন নাই। ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় তাঁহার মনে অসন্তোষের একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই।

শ্যামাচরণ অপরের দ্বারা পতিত বাবুর নিকট নিজের কথা জ্ঞাপন করিবার পর, যখন কোন আশার আভাস পাইলেন না, তখন তিনি মনে করিলেন, স্বয়ং একবার প্রস্তাব করিয়া দেখিবেন। তাহাতে যদি তিনি বিফল-মনোরথ হন, তখন কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে।

গোবিন্দ বাবুর নিকট এপ্রসঙ্গের কথা তুলিয়া কোনও লাভ ছিল না। তিনি সমস্ত কর্য্যের ভার পতিত বাবুর উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাহার উপর সে সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছিল। তিনি বিশেষ কোন প্রকার জটিল সমস্যার সমাধানের ভার লইতেন না।

শ্যামাচরণ পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে অবসর মত এক দিবস 'পতিতবাবুর নিকট নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থার

কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এতদিন তিনি কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া তিনি বিশেষ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পৃথকভাবে কিছু ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

পতিতপাবন সেই কথা শ্রবণ করিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি ক্রুদ্ধও হইয়া থাকিবেন। কারণ, তিনি রূঢ় ভাষায় তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন. তাহা তিরস্কারেরই নামান্তর। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জামাতাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হারে তাঁহাকে কিছুই দেওয়া হইবে না। তবে তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎই পাইবেন।

শ্যামাচরণ একথা শ্রবণ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। তিনিও অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়া বসিলেন যে, তাহা হইবে না। হয় তাঁহার সম্বন্ধে পৃথক কোন প্রকার

ব্যবস্থা করা হউক, নচেৎ তিনি ব্যবসায়ে আর অনর্থক পরিশ্রম করিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গ লইয়া শ্বশুর জামাতার মধ্যে যে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইল, তাহাতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। অবশ্য একথা সত্য, জামাতাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শ্যামাচরণের প্রস্তাবে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, গভীর স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল।

শ্যামাচরণও প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে স্বাধীনচেতা পুরুষের স্বাবলম্বনস্পৃহাই ব্যক্ত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, এই আলোচনা উপলক্ষে পতিতপাবন শ্যামাচরণের দারিদ্র্যের সম্বন্ধেও ইঙ্গিত কবিয়াছিলেন।

আহতচিত্ত যুবক ধীরস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি দরিদ্র হইতে পারেন; কিন্তু কায়মনোবাক্যে তিনি তাঁহাদের কারবারে আত্মনিয়োগ করিয়া ব্যবসায়কে উন্নত অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় কি?

বাস্তবিক শ্যামাচরণ উক্ত কারবারে যোগ দিবার পর উহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সে সময় অন্য কোনও বাঙ্গালী-চালিত ভূষীমালের আড়ত এমন উন্নত হইতে পারে নাই। স্বত্বাধিকারীরা ব্যবসায় হইতে প্রচুর অর্থ পাইতেছিলেন। পতিতপাবন উপার্জ্জনের অর্থে জমিদারী পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়াছিলেন। পতিতপাবন মনে মনে বুঝিতেন যে, তাঁহাদের এই আর্থিক উন্নতির একমাত্র কারণ, যুবক শ্যামাচরণের বুদ্ধি-কৌশল এবং অকপট, অক্লান্ত পরিশ্রম।

শ্যামাচরণ যে প্রণালীতে মাল ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন, তাহাতে বিশেষ লাভ থাকিয়া যাইত। অনেকে সে সময় বলিতেন, শ্যামাচরণের বোধহয় দৈবী-শক্তি ছিল, তাই এরূপ হইত। কিন্তু সেকথার কোন অর্থ নাই। অলস ব্যক্তিরা ঐরূপ একই মন্তব্যের আরোপ করিয়া ভগবানের উপর সকল বোঝা চাপাইয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত থাকে। ভগবান পক্ষপাতী নহেন। তিনি কাহাকেও করুণা করিবেন, আবার কাহারও প্রতি নিদয় হইবেন, এরূপ অভিযোগ কর্ম্মহীন ব্যক্তি-

রাই করিয়া থাকে। বুদ্ধি-বিবেচনা ও সাধুতা সহকারে যাহারা পরিশ্রম করে, সাফল্য অবশ্যই তাহারা লাভ করিবে, ইহাই ভগবানের বিধান।

শ্যামাচরণের তাহাই হইয়াছিল। তিনি আবাল্য সমস্ত কার্য্যই পরিশ্রম সহকারে, বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগেই সমাধা করিতেন। সেইজন্য সমস্ত কার্য্যেই তিনি জীবনে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেখা যায়, মানুষ কর্ম্মের মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে।

পতিতপাবনের সহিত শ্যামাচরণের মতান্তরের ফলে যে মনান্তর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সহজে নিষ্পত্তি হইল না। ক্রমে দেখা যাইতে লাগিল যে, তুই পক্ষই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন। পতিতবাবু ভাবিয়াছিলেন, শ্যামাচরণ তাঁহার কথায় ভীত হইয়া সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইবেন, কিন্তু তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, তেজস্বী শ্যামাচরণ সে ধাতুতে গঠিত নহেন। কোনপ্রকার ভয় দেখাইয়া তাঁহার মত

স্বাবলম্বন-প্রিয় যুবকের উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ ব্যাপার নহে। তখন তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইলেন।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, শ্যামাচরণকে তিনি কোনও প্রকারে সাহায্য করিবেন না। বিত্ত-সম্পত্তি-হীন যুবক কেমন করিয়া আপনার পায় ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, তিনি তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এদিকে শ্যামাচরণও মুখে কোন কথা না বলিয়া স্থির করিলেন, আরও কিছুদিন তিনি প্রতীক্ষা করিবেন। যদি ইহার মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত না হয়, তখন তিনি অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন। উভয় পক্ষই তখন হইতে পরস্পরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কোন ব্যবস্থাই হইবে না। পূর্ব্বে যেমন চলিতেছিল, এখনও তেমনই ভাবে চলিতে লাগিল। এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

তাঁহার অন্তর মধ্যে যে দুর্জ্জয় কর্ম্মশক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এতদিন পরিপূর্ণ জাগ্রত না হইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, এইরূপ উপেক্ষায় তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিল। 'সুপ্ত-সিংহ যেন সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।'

তিনি কি মানুষ নহেন? তাঁহার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান কি নাই? অর্থ-সম্পদ তাঁহার নাই বলিয়া কি তিনি মনুষ্যত্বের সম্পদ হইতে বঞ্চিত? না, এ উপেক্ষা তিনি কখনই সহ্য করিবেন না। আপনার চরণে ভর দিয়া, উন্নত মস্তকে তিনি দাঁড়াইবেন—আপনার জন্ম-গত অধিকারকে কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। তিনি নিজের উন্নতির পথ স্বয়ং আবিষ্কার করিবেন।

শ্যামাচরণের কোন মূলধন ছিল না। সুতরাং কোন প্রকার ব্যবসায় করিবার সুবিধা নাই। অর্থো-পার্জ্জনের জন্য পরের দাসত্ব করা চলে; কিন্তু কাহারও কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়া তিনি চাকরী করিতে সম্মত ছিলেন না। শ্যামাচরণ চিন্তিত হইলেন; কিন্তু হাল ছাড়িলেন না।

আড়তে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া শ্যামাচরণ সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার নিজের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে তিনি সে সময় নানা লোকের পরামর্শও গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই বিশেষ কোন সু-পরামর্শ দিতে পারিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠার সূচনা

ক্রমশঃ শ্যামাচরণ পতিত বাবুর কারবারের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তথাকার ন্যস্ত কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভাগ্য-লক্ষ্মীকে লাভ করিবার সাধনার-পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি শ্বশুরের আড়তে শুধু আহার করিতেন। উপায়ান্তর ছিল না বলিয়াই তখনও তিনি উক্ত সাহায্য পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার সংকল্প ছিল, কোন একটা উপায় করিতে পারিলে, তিনি উহা পরিত্যাগ করিবেন!

কিন্তু সহসা তিনি কোন উপায় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তিনি দীর্ঘ দিবা ও রাত্রির অধিকাংশ সময় নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সাধু যাহাদের

সংকল্প, ভগবান তাহাদের সহায় হইয়া থাকেন। একাগ্র মনে আরাধনা করিলে ভগবান ভক্তের কাছে তাঁহার অভয়-রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বিশ্বাসী যাহারা এ সত্য তাহাদের কাছে স্বতঃস্ফুরিত হইয়া থাকে।

এইরূপে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস শ্যামবাজারে হলধর বিশ্বাসের আড়তে তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় ঐ আড়তের মালিক তাঁহাকে বলিলেন যে, যদি তিনি বিক্রেয় পণ্যপূর্ণ পাটের গাড়ী গুলি তাঁহাদের আড়তে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে মণ প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট হারে দস্তুরি তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে।

একথা শ্রবণ করিয়া শ্যামাচরণ যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোক-রশ্মির বিকাশ দেখিলেন। কর্ম্মের একটা সূত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার উৎসাহী হৃদয় উত্তেজনার আনন্দে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। শ্যামাচরণ তখনই সেই কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। প্রথম দিনেই তিনি এই

কার্য্যের দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিলেন, তাহা সামান্য নহে

স্বাধীনভাবে কাজ করার একটা মাদকতা আছে—স্বোপার্জ্জিত অর্থ প্রাপ্তির একটা বিশেষ আনন্দ আছে। শ্যামাচরণ সর্ব্ব প্রথম জীবনে সেই অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিলেন। উৎসাহে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন! তিনি ভাবিলেন, সৎপথে থাকিয়া, সাধুভাবে পরিশ্রম করিয়া ভবিষ্যতে তিনি আপন পায়ে ভর দিয়া নিশ্চয়ই দাঁড়াইতে পারিবেন! জননী ও ভগবানের আশীর্ব্বাদ জীবন-সংগ্রামের পথে তাঁহার পাথেয়। উহাকে মূলধন করিয়া তিনি কি জননীর মলিন মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন না?

পূর্ব্বে এই কার্য্যে প্রায়ই আড়তের বেতনভুক কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত থাকিত। পাটের মরস্থমে তাহারা প্রভাতে উঠিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া পাটের গাড়ী আটক করিত। কিন্তু সকল সময় তাহারা যথাধর্ম্ম কর্ত্তব্য পালন করিত না। নিজের কাজ সারিয়া, অথবা

গল্পগুজবে সময় কাটাইয়া তারপর মনিবের বেতনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কার্য্য করিত। মনিবগণ তাহাদের ফাঁকি ধরিতে পারিতেন না। ইহাতে কাজ যে বেশী হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাম্রকূট-ধূমপান ও গল্পগুজবের পর দুই একখানি গাড়ী লইয়া তাহারা যখন আড়তে ফিরিত, তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। তারপর স্নানাহার সারিয়া কর্ম্মচারীরা বিশ্রামান্তে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

কিন্তু শ্যামাচরণ কাহারও বেতন-ভুক কর্ম্মচারী ছিলেন না। তিনি নিজের উন্নতির জন্য, অধিক উপার্জ্জনের আশায় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহার কাজ ভাল হইতে লাগিল।

বর্ত্তমানযুগে উল্লিখিত প্রকারে কাজ হয় না। সে প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই দাদন প্রথা চলিতেছে। আড়তদারগণ পূর্ব্ব হইতেই ব্যাপারিগণের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। তাহারা আড়তে পাট উঠাইয়া দেয়।

অধুনা শ্যামবাজার অঞ্চলে আড়তের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। কৃষক কিম্বা ব্যাপারী প্রাই নিজ নিজ দেশস্থ ব্যবসায়ীর আড়তেই পাট উঠাইয়া দেয়; কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, তৎকালে কলিকাতায় পাটের আড়তের সংখ্যা অধিক ছিল না। তখন দাদন প্রথা একবারেই ছিল না। শ্যামাচরণ বল্লভই উত্তর-কালে উহা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শ্যামাচরণ কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়া বুঝিলেন যে, আড়তের বেতন-ভুক কর্ম্মচারীরা মনিবের কার্য্যে নির্লজ্জ-ভাবে অবহেলা করিয়া থাকে। তাহাদের ব্যবহারে মনে মনে তিনি দুঃখিত হইলেও, এই অবকাশে তিনি বিপুল পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত মালই তিনি সেই আড়তে আনয়ন করিয়া দিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে উক্ত আড়তে বেশী পরিমাণে পাট আমদানি হইতে লাগিল। দশ বার দিন এইভাবে কার্য্য করার ফলে শ্যামাচরণের হস্তে কিছু অর্থ সঞ্চিত

হইল। তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ সেই আড়তেই তাঁহার আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এই সময় শ্যামাচরণ এরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, অনেক সময় দিবাভাগে তাঁহার আহারের সুযোগ হইত না। প্রভাতে স্নান করিয়া তিনি বহির্গত হইতেন এবং সমস্ত দিবস পাটের গাড়ী কিম্বা নৌকার অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিয়া হয়ত দুই এক পয়সার মুড়ি মুড়কির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। দিবাভাগে আহার করিতে আসিলে যদি অন্য কোন লোক পাটের গাড়ী অধিকার করে, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত দিনই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এইরূপে প্রথম বৎসরেই তাঁহার হস্তে কয়েক শত টাকা সঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, পাটের ব্যবসা বারমাস সমভাবে চলে না। পাটের মরসুমের পর অন্যান্য মালের দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। যেমন গুড় ডাল কলাই তূলা প্রভৃতি। কিন্তু তিনি দেখিলেন সেই সব মালের আড়তদার অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন

দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করে। সুতরাং একটা দ্রব্যের বন্দোবস্ত করিতে না করিতে অন্য দ্রব্য তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

যাহা হউক, এইপ্রকার কার্য্য তিনি এক বৎসর ধরিয়া করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কিছু লাভও হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, কোনক্রমে যদি একটা পাটের আড়ত করা যায়, তাহা হইলে বেশী লাভবান হওয়া যাইবে। শ্যামাচরণ এই অবসরে পাটের কার্য্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করিয়া লইলেন। পাটের প্রকৃতিও তাঁহাব অগোচর রহিল না। তাঁহার সমসাময়িক কোন বাঙ্গালী তাঁহার অপেক্ষা পাটের প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল কিনা সন্দেহ।

শ্যামাচরণ স্বয়ং একটি আড়ত প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন। উহাতে পরিশ্রম অবশ্যই আছে; কিন্তু প্রত্যহ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নৌকা ও গাড়ী বোঝাই পাটের জন্য অনিশ্চিত ভাবে ঘুরা ফিরা করার পরিশ্রম সত্যই অনেক সময় বিরক্তিকর।

তারপর আড়তে লোকসানের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, আড়তদার একপ্রকার দালাল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন ব্যাপারী বিক্রয়ার্থ পাট আনয়ন করিয়া কোন আড়তে উঠাইল। ক্রেতার পক্ষ হইতে লোক আসিয়া বাজার দরে মাল খরিদ করিল। মাঝ হইতে আড়তদার তাহার গুদাম ভাড়া প্রভৃতি হিসাবে মণ প্রতি কিছু লাভ পাইল।

তবে ইহাতে কিছু মূলধনের প্রয়োজন। অনেক সময় ব্যাপারী মাল লইয়া আসিলে, সেই মালের পরিবর্ত্তে তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিতে হয়। কোন কোন সময় সেই মাল বিক্রয় হইতে কিছু বিলম্বও হইয়া থাকে; কিন্তু ব্যাপারী টাকা চাহিলে, অন্ততঃ-পক্ষে মালের অর্দ্ধেক টাকা তাহাকে দিতে হইয়া থাকে। তারপর মাল বিক্রীত হইয়া গেলে, আড়তদার নিজের অর্থ কাটিয়া লইয়া ব্যাপারীকে তাহার বাকী প্রাপ্য দিয়া থাকে।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠা।

তিনি দেখিলেন, অনেক আড়তদার ব্যাপারীর নিকট হইতে পাট খরিদ করিয়া পুনরায় কোন পাট ব্যবসায়ীকে উহা বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হইয়া থাকে। তখন কি প্রকারে আড়ত করা যায়, তিনি সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার হস্তে মাত্র কয়েক শত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। তাহাতে আড়ত-দারী কার্য্য চলিবে না।

ঘটনাক্রমে তাঁহার জন্মভূমি শ্বেতপুর গ্রামের কতিপয় লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়া গেল। তাহারাও আড়ত স্থাপনে তাঁহার মতানুবর্ত্তী ছিল। তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে তিনি একটি আড়তের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামবাজারের সেতুর

পূর্ব্বপ্রান্ত—এখন যেখানে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, ঐ স্থানেই সেই আড়তঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্যামাচরণ প্রথম স্বাধীন ভাবে আড়তদারী আরম্ভ করিলেন। প্রথম বৎসরে মূলধন অনুযায়ী লাভের পরিমাণ নিতান্ত মন্দ হয় নাই; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন, যাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি কারবার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেককে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে ব্যস্ত; অথচ সকলেই পরিশ্রমে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিনা পরিশ্রমে আকাশের চাঁদ যাহারা হস্তগত করিতে চাহে এবং বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া যাহারা পরস্পরের বক্ষো-দেশে স্বার্থবুদ্ধির বিষাক্ত ছুরিকা বিদ্ধ করিতে চাহে, তাহাদিগের প্রতি কোনও ধর্ম্মপরায়ণ সচ্চরিত্র ব্যক্তির মনের আকর্ষণ থাকে না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্যামাচরণের দৃষ্টি অংশীদিগের মনোবৃত্তির সম্যক পরিচয় পাইল। তিনি ঐপ্রকার অসাধু লোকের সহিত মিলিত হইয়া কারবার করিতে

অনিচ্ছুক হইলেন। বিতৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, লোকগুলি যদি তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করে ভালই, নচেৎ তিনি তাহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিবেন না।

ভগবানের কৃপাদৃষ্টি তখন সম্ভবতঃ শ্যামাচরণের উপর স্থির ছিল। তাই তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইল না। তাহারাই পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে ব্যবসায় হইতে তাহাদের সংস্রব তুলিয়া লইল।

এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন শ্যামাচরণের হস্তে প্রায় দুই সহস্র টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। শ্যামাচরণ তখন অনন্যমনে অর্থের সাধনায় নিমগ্ন। অবশ্য মাঝে মাঝে ধান্যকুড়িয়ায় গিয়া মাতা ও ভ্রাতাকে তিনি দেখিয়া আসিতেন; সময় সময় শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াও স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কিন্তু সে সময় পতিতপাবন তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। শ্বশুর সুতরাং জামাতার সহিত

ভালরূপ বাক্যলাপ করিতেন না। শুধু সামান্য দুই চারিটি কুশল প্রশ্নেই শ্বশুর জামাতার আলোচনা সমাপ্ত হইত। কিন্তু পতিত বাবুর আন্তরিক স্নেহ শ্যামাচরণের উপর হ্রাস পায় নাই। জামাতা গৃহে আসিলে, পতিতপাবন তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করিতেন না। বরং সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে শ্যামাচরণের কোনরূপ কষ্ট না হয়।

তিনি তখনও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বলিতেন যে, ভবিষ্যতে এই শ্যামাচরণ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইবে। ভবিষ্যতে তাঁহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পত্নী শ্যামা সুন্দরীও শ্যামাচরণকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। যাহাতে তাঁহার জামাতার কোনরূপ কষ্ট না হয় সে বিষয়ে তাঁহারও একান্ত দৃষ্টি ছিল।

কর্ম্মজীবনের দুই বৎসর এইরূপ ভাবে অতীত হইলে, তৃতীয় বৎসরেও শ্যামাচরণ একটি স্থায়ী আড়ত

করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা তখনও তিনি সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই অংশী গ্রহণের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, একাধিক অংশী গ্রহণ করিবেন না। বহু অংশী লইয়া কারবার পরিচালনে অনেক অসুবিধা ঘটে, সুতরাং তিনি জীবনে একবার যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, পুনরায় আর তাহার মধ্যে জড়িত হইতে চাহেন না। বহু নায়ক হইলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে ; বরং পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

অনেক অনুসন্ধানের পর শ্যামাচরণ অবশেষে একজন অর্থশালী অংশী সংগ্রহ করিলেন। এই ব্যক্তি শ্বেতপুরেরই সন্নিহিত গ্রামবাসী। তিনি মুসলমান ভদ্রলোক এবং ধর্ম্মপরায়ণ। ইনি শ্যামাচরণের পূর্ব্ব অংশীদিগের ন্যায় ধর্ম্মবুদ্ধিবিহীন ছিলেন না।

শ্যামাচরণ তাঁহার পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া এবার পাতিপুকুরে, যে স্থানে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান আড়ত

বিদ্যমান, তাহার সম্মুখবর্ত্তী স্থানে একটি আড়ত স্থাপন করেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে এই বৎসরেও শ্যামাচরণের বিশেষ লাভ হয়। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি উক্ত মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত মিলিত ভাবে ব্যবসায় করিতে থাকেন। কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সম্মেলনে সার্থকতার জয়টীকা লাভ করা যায়। শ্যামাচরণও লাভবান হইতে থাকেন।

তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এইরূপ ধার্ম্মিক লোকের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি কারবার করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে কামনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না!

দুই বৎসর পরে তাঁহার সেই অংশী কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার পক্ষে কারবার পরিচালন সম্ভবপর হইল না। তখন তিনি তাঁহার অংশমত টাকা লইয়া কারবারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। এই দুই বৎসরে শ্যামাচরণের হস্তেও প্রায় সর্ব্বসমেত চারি পাঁচ সহস্র টাকা জমিয়াছিল। তাহা ছাড়া সেই আড়ত,

গুদাম ঘর প্রভৃতি তখন তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি হইল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর তিনি যে বিভিন্ন অংশীর সহিত কারবার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে গদি ও গুদাম ঘর ভাড়া করিয়া লইতে হইয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর তাঁহার আর সে ভাবনা রহিল না। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আর তিনি ভাগে কাহারও সহিত কারবার করিবেন না। তাঁহার সামান্য সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে সামান্য ভাবে কারবার চালাইবেন। তাহাতে যাহা লাভ হয়, তাহাই ভাল।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, শ্যামাচরণ স্থায়িভাবে তথায় বসিয়া কারবার আরম্ভ করিলেন। সে সময় তিনিই মনিব, তিনিই সরকার, স্বয়ং হিসাব রক্ষক—একাধারে সবই তিনি। তাহাতে যেরূপ কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন শ্যামাচরণ তাহাতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। কিন্তু এই সময় আকস্মিক ভাবে তাঁহার মূলধন হইতে কিছু অর্থ বহির্গত হইয়া গেল। তাহাতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

জন্মমাল্য

শ্যামাচরণ যতদিন মাতুলের কারবারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ততদিন তাঁহার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই মাতুল গোবিন্দ বাবুর আশ্রয়ে অবস্থান করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ অন্য কোন কার্য্য করিতেন না ; মাতুলের সংসারের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর ছিল। কিন্তু শ্যামাচরণ মাতুলের কারবার পরিত্যাগ করায় গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি তাঁহাকে অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন নাই। তারপর যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নিঃসম্বল শ্যামাচরণ তাঁহাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম-প্রচেষ্টারফলে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছেন, তখনই তিনি ভাগিনেয়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

মানব-মনের গোপনতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন, সাধারণতঃ মানুষ অন্যের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং প্রতিভার পরিচয় পাইলে, তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে সারাজীবন অনুগ্রহ প্রার্থী হিসাবে যাপন করে, স্বাবলম্বনের প্রভাবে যদি তাহার অভ্যুদয় ঘটে, তবে মানবচিত্ত ঈর্ষা-পীড়িত হইয়া তাহার সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা করিতে অনেক সময় সমর্থ হয় না। মানব মনোবৃত্তির এই বিচিত্র রহস্যের উদ্ভেদ জনসাধারণের পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে।

বিশেষতঃ শ্যামাচরণ চলিয়া আসিবার পর, গোবিন্দচন্দ্রের কারবার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। সেই কারণে তিনি শ্যামাচরণের উপর জাতক্রোধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারবারের ক্ষতি হওয়াতে তাঁহার মানসিক অবস্থাও ভাল ছিল না। তাহার উপর, সে সময় তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য হওয়ায়, তিনি সহসা উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন এবং ক্রোধ দমন করিতে পারিতেন না।

শ্যামাচরণের উপর যে ক্রোধ ও আক্রোশ তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা চরিতার্থ করি-

বার কোন উপায় না পাইয়া, তিনি শ্যামাচরণের মাতা ও ভ্রাতার উপর বিরূপ হইয়া পড়িলেন। পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায়, সবলের উপর আক্রোশ চরিতার্থ করিতে না পারিয়া, মানুষ দুর্ব্বলকেই পীড়ন করে। দুর্ব্বল, নিঃসহায় তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারে না। নীরবে প্রবলের অত্যাচার সহ্য করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। আর অনাচারীরা কিন্তু তাহাতে একটা উৎকট আনন্দ অনুভব করে।

গোবিন্দচন্দ্র ভগিনী ও ভাগিনেয় রঘুনাথের উপর নানাভাবে দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অনেক সময় তিনি কঠোর-নির্ম্মম-বাক্যে তাঁহাদিগকে মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেন। প্রায়ই দেখা যায়, গৃহকর্ত্তা যেখানে কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হন, পরিবারের অন্যান্য সকলেও তাহার উপর নিতান্ত বিরূপ ব্যবহার করিতে থাকে। তখন দীপ্ত সূর্য্য অপেক্ষা তপ্ত বালুকার দহন-যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে।

এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। “বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ,” কবির এই

অমোঘ বাক্য যেন শ্যামাচরণের মাতার সম্বন্ধেও সার্থক হইয়া উঠিল।

তিনি প্রতিদিন অনুভব করিতে লাগিলেন, পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজন, গৃহ-কর্ত্তার বিরক্তি উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার উপর ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নানাভাবে তাহারা তাঁহার জীবনকে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতে বিস্মৃত হইল না। তাঁহার অপরাধ—তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণ আপন পায় ভয় দিয়া জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্যামাচরণ তখন একাগ্রমনে ভাগ্যলক্ষ্মীর পূজায় নিরত। কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন এই সাধনায় যুবক আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন। দেশে জননী ও ভ্রাতা যে মাতুলালয়ে লাঞ্ছিত-জীবন যাপন করিতেছেন—সমগ্র পরিবার যে, তাঁহাদের উপর বিরূপ ও বিমুখ হইয়া রহিয়াছে, এসংবাদ শ্যামাচরণ অবগত ছিলেন না। জননী সর্ব্বপ্রযত্নে শ্যামাচরণের নিকট এই অপ্রীতিকর সংবাদ গোপন রাখিয়াছিলেন। জীবন-সংগ্রামে বিব্রত সন্তানকে এ সকল কথা জানাইলে,

তাহাকে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল করিয়া তোলা হইবে। দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া পুত্র উন্নতির পথে একাগ্রমনে যাত্রা করিতে পারিবে না।

শ্যামাচরণের জননী যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই কর্ত্তব্য-পরায়ণা ছিলেন। তাই তিনি সন্তানকে ঘুণাক্ষরেও নিজের দুঃখ কষ্টের কথা জানান নাই। রঘুনাথকেও কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তখন গ্রামের প্রায় সকল লোকই শ্যামাচরণের জননীর প্রতি বিরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু তাঁহার কিশোরী পুত্রবধূ দাক্ষায়ণীর হৃদয়ে সমবেদনার ফল্গু-ধারা প্রবাহিত হইত।

তখন দাক্ষায়ণী পিতৃগৃহ-বাসিনী। কিন্তু সকল সময়েই তিনি শ্বশ্রূ ও দেবরের সন্ধান লইতেন। তাঁহাদের সুখ দুঃখের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। শাশুড়ীও প্রায় বধূমাতাকে দেখিতে যাইতেন। কিন্তু আপনার দুঃখের কথা কখনও তিনি বধূর নিকট প্রকাশ করিতেন না।

কিন্তু দাক্ষায়ণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি দেবর ও শ্বশ্রূমাতার নির্য্যাতন ও নিগ্রহের সংবাদ

লোকমুখে সমস্তই জানিতে পারিতেন। কিশোরী হিন্দুকুলবধূর হৃদয় ইহাতে দুঃখভারে প্রপীড়িত হইত ; কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় তাঁহার ছিল না। সমদুঃখে অভিভূত হইয়া অনেক সময় তাঁহার নয়ন অশ্রুভারে অবনত হইয়া পড়িত—হৃদয় ব্যথায় নিপীড়িত হইত। সেই ক্ষুদ্র কোমল হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাসের তপ্তজ্বালা উত্থিত হইয়া বায়ুসাগরে বিলীন হইত।

কিশোরী অনুক্ষণই চিন্তা করিতেন, কি উপায়ে শ্বশুর—তাঁহার পরমারাধ্যা দেবতার দুঃখ দূরীভূত করা যায়। কিন্তু সহসা তিনি কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

ওদিকে শ্যামাচরণের জননীর দুঃখ দুর্দ্দশার অবস্থা ক্রমেই ভীষণতর হইতে লাগিল। সহোদর বিমুখ, পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজন অনুক্ষণ বিরস মুখে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। অশনে বসনে—জীবনের সমগ্র পর্য্যায়ে পরগৃহবাসী পরান্নভোজীর প্রতি নির্ম্মম ইঙ্গিত—দাতার দান তখন বিষাক্ত বাণের মত হৃদয়কে বিদ্ধ, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিত।

দাক্ষায়ণী শ্বশ্রূমাতার অপমান ও লাঞ্ছনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পতিপরায়ণা কোন সাধ্বী হিন্দুনারী স্বামীর জননীর প্রতি এই উপেক্ষা ও অপমানকে নির্ব্বিচারে পরিপাক করিতে পারে না। তিনি শাশুড়ী ও দেবরের দুঃখে অভিভূত হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, স্বামীকে এ বিষয়ে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাছে কেহ জানিতে পারে, এজন্য গোপনে কোনও কৌশলে তিনি স্বামীকে একবার ধান্যকুড়িয়ায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। শ্যামাচরণ জীবন-সঙ্গিনীর নিকট হইতে অকস্মাৎ এইরূপ আহ্বান পাইয়া, অনতিবিলম্বে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধীরে ধীরে পত্নী স্বামীর কাছে, জননী ও ভ্রাতার সম্বন্ধে সকল কথা বিবৃত করিলেন। দীর্ঘকাল হইতে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি জননী পুত্রের কল্যাণ কামনায়, কেমন করিয়া নীরবে সকলপ্রকার অনাচার, নির্য্যাতন ও অবহেলা পরিপাক করিয়া আসিতেছেন,

গুণবতী পত্নীর নিকট শ্যামাচরণ তাহার আভাস জ্ঞাত হইলেন।

সুসময় আসে নাই, শ্যামাচরণ কঠোর জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত, পাছে মাতা ও ভ্রাতার ধিক্কৃত জীবনের সম্বন্ধে সকল সংবাদ অবগত হইয়া পুত্র ব্যস্ত হইয়া পড়েন, পাছে পুত্রের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে, এজন্য জননী নীরবে সকলপ্রকার উপেক্ষা, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন।

সাধ্বীপত্নী অবশ্য সকল কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাহাতেই শ্যামাচরণ জননীর আত্মত্যাগের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিলেন। তাঁহার জননী ও ভ্রাতার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখনই সঙ্কল্প স্থির করিলেন যে, এখন হইতে পৃথক বাড়ীতে মাতা ও ভ্রাতাকে রাখিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। পরগৃহে বাস ও পরান্নভোজনের মত দুঃখ আর কিছু নাই। এই মহাদুঃখ হইতে তিনি জননীকে অবশ্যই মুক্তি দিবেন।

স্ত্রীর কাছে সকল সংবাদ শুনিয়া শ্যামাচরণ জননী সন্নিধানে উপনীত হইলেন। পুত্রের পীড়াপীড়িতে মাতা সকল কথা বলিয়া ফেলিলেন। বাঁধ মুক্ত করিয়া যখন প্লাবন ধারা বহিয়া চলিল, তখন, ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। মাতা পুত্রকে তখন বলিলেন যে, যদি সম্ভবপর হয়, তবে পৃথক গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। শ্যামাচরণ পূর্ব্বেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এখন মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া বাসের উপযুক্ত জমীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পদ্মালয়া রমা তাঁহার ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। দুঃখদৈন্যের মধ্যেও যে ভক্ত সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়কে অবলম্বন করিয়া ঝঞ্ঝাপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল কর্ম্ম-সমুদ্রে ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহাকে তিনি অবশ্যই জয়টীকা পরাইয়া দিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ সন্ধান পাইলেন, এখন ধান্যকুড়িয়া গ্রামে যে স্থানে শ্যামাচরণের প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিদ্যমান, তৎকালে সেই জমীর এক প্রান্তে জনৈক গৃহস্থের দুইটি ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী বিক্রীত হইবে।

তিনি অনুসন্ধানে আরও জানিতে পারিলেন যে, উক্ত গৃহ পতিতপাবনের নিকট বন্ধক রহিয়াছে। শ্যামাচরণ সংবাদ পাইবামাত্র, শ্বশুরের নিকট গমন করিয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন এবং তাঁহার সহায়তায় সেই জমীসমেত বাটী খরিদ করিলেন। দুই তিন দিবসের মধ্যে তিনি মাতা এবং ভ্রাতাকে তথায় আনয়ন করিলেন। ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইল।

শ্যামাচরণ যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাকে সুসম্পন্ন না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। গৃহ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যে বাসগৃহ অনুসন্ধান করিয়া ক্রয় এবং তাহাকে গৃহস্থের বাসের উপযোগী করিয়া গৃহীর ব্যবহারযোগ্য তৈজসপত্রাদির ব্যবস্থা করা পল্লীগ্রামে সে যুগে স্বল্পায়াসসাধ্য ছিল না।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ

জয়যাত্রার অগ্রগতি

শ্যামাচরণ নবক্রীত গৃহে মাতা ও ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠার পর, ভ্রাতার উপর বাটী মেরামতের জন্য উপযুক্ত অর্থাদি দিয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। জীবনে শ্যামাচরণের এই প্রথম সংসার স্থাপন। উহার প্রথম মন্ত্রণাদাত্রীই তাঁহার সহধর্ম্মিণী দাক্ষায়ণী।

শ্যামাচরণের মাতা আজ নিজগৃহে বাস করিতে পাইয়া মনে করিলেন যে, বাটী বাসের উপযুক্ত হইলে তিনি তাঁহার পুত্রবধূকে কাছে আনিয়া রাখিবেন। এতকালের মধ্যে বধূ লইয়া নিজের গৃহস্থালী করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। সে ক্ষোভ তাঁহার অন্তরে জাগ্রত ছিল।

এই আকস্মিক ব্যাপারে শ্যামাচরণের প্রায় দেড় সহস্র মুদ্রা বহির্গত হইয়া গেল। সামান্য মূলধন হইতে

একবারে এত অর্থ বাহির হইয়া গেলে বাস্তবিক ব্যব-সায়ীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইয়া উঠে। যাহা হউক, শ্যামাচরণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাকী দৃঢ়চিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

উত্তরকালে শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন যে, সেই সময় তাঁহাকে যেরূপ উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় যাপন করিতে হইয়াছিল, সমগ্র জীবনে আর কখনও তেমন হয় নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, চিন্তা ও উৎকণ্ঠার পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইত, ততই শ্যামাচরণের অন্তরে সাহস ও উৎ-সাহের সঞ্চার হইত। অদম্য উৎসাহে তিনি কাজ করিয়া যাইতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্যামাচরণ পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যবসা বৎসরের সমস্ত সময় চলে না—মাত্র চারি পাঁচ পর্য্যন্ত ইহার স্থিতিকাল। পাটের ব্যবসা সাধারণতঃ ভাদ্রমাস হইতে আরম্ভ হইয়া পৌষ মাস অবধি চলে। এই সময়ের মধ্যে পাট ব্যবসায়িগণ যে যাহা পারেন উপার্জ্জন করিয়া লইয়া থাকেন। তৎপরে পাটের আড়তদারগণের অনেকে গুড় প্রভৃতি

অন্যান্য মালের কারবার করিয়া থাকেন; কিন্তু বিশেষ বিস্তৃতভাবে নহে।

শ্যামাচরণ পূর্ব্বে তিন বৎসর ভাগীদার লইয়া শুধু পাটের কারবারই করিয়াছিলেন। অন্য কোন দ্রব্যের কারবার করেন নাই। এ বৎসর তাঁহার নিজের গুদাম ও গদি থাকায়, তিনি পাটের ব্যবসা অন্তে, বসিয়া না থাকিয়া অন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন।

বিপিন দপ্তরী মহাশয় এই সময়ে তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। যখন টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইত, সেই সময় বিপিন দপ্তরী মাড়বারী পটী হইতে শ্যামাচরণকে টাকা কর্জ্জ করিয়া দেওয়াইয়া দিতেন। শ্যামাচরণ কঠোর পরিশ্রম করার ফলে এ বৎসর তাঁহার বেশ লাভ হইল। এখন শ্যামাচরণ প্রায় সর্ব্বসমেত প্রায় অষ্ট সহস্র টাকার মালিক হইলেন।

শ্যামাচরণ কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথকে গ্রাম হইতে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। একাকী সকল দিক সমভাবে রক্ষা করার সুবিধা হয় না। তাই দুই ভ্রাতা

মিলিত হইয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। রন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া কারবারের সকল প্রকার কার্য্য উভয়ে মিলিয়া সম্পাদন করিতেন।

বাজারে শ্যামাচরণের তখন অল্প স্বল্প-সুনাম হইয়াছে। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁহার সম্মানও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাহিরের ব্যাপারীরা শ্যামাচরণের সুমধুর ব্যবহার ও ন্যায়সঙ্গত আচরণে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল। পাটের দালালবর্গও তাঁহার সঙ্গত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাঁহার ভবিষ্যৎ তখন সমুজ্জ্বল।

এদিকে ধান্যকুড়িয়ায় বাটীর সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন উহা ক্ষুদ্র গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ বাসের উপযুক্ত। শ্যামাচরণের আর্থিক অবস্থা কিছু স্বচ্ছল, কিন্তু তিনি পর বৎসরের কারবারের জন্য অতিরিক্ত অর্থের জন্য কিছু চিন্তিত—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাঁহার মাতা পুত্রবধূ দাক্ষায়ণীকে তখন গৃহে আনিয়াছেন। গৃহলক্ষ্মী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামিগৃহে অধিষ্ঠিতা হইয়া দাক্ষায়ণী অত্যন্ত আনন্দিতা; কিন্তু স্বামীর মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখিয়া

তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ পত্নীর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। পতিগত-প্রাণা দাক্ষায়ণী স্বামীর দুশ্চিন্তার হেতু অবগত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে একবার শ্যামাচরণ পতিতপাবনের কাছে কিছু টাকা চাহিয়াছিলেন। তখন বহুল পরিমাণে পাট তাঁহার আড়তে আমদানি হইতেছিল। যে পরিমাণ টাকার তখন প্রয়োজন ছিল, শ্যামাচরণের হাতে সে পরিমাণ অর্থ ছিলনা। টাকা পাওয়া দূরে থাকুক, শ্যামাচরণ শ্বশুরের নিকট হইতে অধিকভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। আরও দুই একবার তিনি শ্বশুরের কাছে কিছু অর্থ ঋণ-স্বরূপ চাহিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। তারপর আর তিনি পতিতপাবনের কাছে প্রয়োজন হইলেও অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

শ্যামাচরণ পাটের মরসুমের পর গুড়, তুলা, দাইল প্রভৃতির ব্যবসা করিতেন। তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু উপার্জ্জনও হইত। এইভাবে তিনি কারবারে লিপ্ত

থাকিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করিতে-ছিলেন।

ক্রমে আবার পাটের মরসুম আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, এবার শ্যামাচরণ আপন সহোদরকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

এ বৎসর তাঁহার কারবারে বহু পরিমাণে পাট আমদানি হইতে লাগিল। অন্যান্য বৎসর তাঁহাকে পরিশ্রম সহকারে পল্লী অঞ্চল হইতে সমাগত পাটের গাড়ীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইতে হইত; কিন্তু এ বৎসর তাঁহার আর সে কার্য্য করিতে হইল না। কারণ পূর্ব্ব বৎসর যে সব ব্যাপারী কৃষক প্রভৃতি তাঁহার আড়তে পাট দিয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলেই এবার আপনা হইতেই মাল আনয়ন করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য ব্যাপারীও শ্যামাচরণের আড়তে পাট লইয়া আসিতে লাগিল।

তাহার প্রধান কারণ, অন্যান্য আড়তে সে সময় প্রায়ই যে দরে পাট বিক্রীত হইত ব্যাপারীরা সে দরে মূল্য পাইত না। সে সময় ব্যাপারীর সম্মুখে কোন

ক্রেতার সহিত আড়তদারের যে দরদস্তুর হইত, তাহা মৌখিক ভাষায় নিষ্পন্ন হইত না। করতলের উপর একখানি বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া হস্ত তালুতে অঙ্গুলি সাহায্যে দর লিখিয়া দিতে হইত। ইহাতে ব্যাপারী কোনক্রমেই বুঝিতে পারিত না, কি দরে মাল বিক্রয় হইবে। সুতরাং আড়তদার যাহা বলিবে, ব্যাপারীকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সেই দরে মাল দিতে বাধ্য হইতে হইত। তাহাতে এরূপ হইত যে, আড়তদার যে দরে মাল বিক্রয় করিত, তাহাতে তাহার নিজেরও কিছু লাভ থাকিয়া যাইত।

সুতরাং এরূপক্ষেত্রে ব্যপারীর লোকসানই হইত। সে সময় আড়তের সংখ্যাল্পতা বশতঃ সকলেই প্রায় এইরূপ ভাবে কার্য্য করিত। তাহাতে ব্যাপারী বাজারে দর যাচাই করিয়া বিশেষ কোন সুবিধা পাইত না। এখনও ঐরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত ভাবে মালের মূল্য নিরূপণের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এখন আর সেরূপ মূল্যের কম বেশী হয় না। কারণ, অধুনা শ্যামাবাজার অঞ্চলে বহু আড়ত হইয়াছে। সকলেরই ভিতর-একটু

প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান। তাহা ছাড়া এ যুগের ব্যাপারীরাও ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর হইয়াছে। তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে বঞ্চিত করিলে তাহারা বিরক্ত হইয়া উঠে। এবং যে আড়তদার ঐভাবে কাহাকেও প্রতারিত করিতে চেষ্টা করে, তাহার আড়তে ভবিষ্যতে কেহ মাল আনিতে চাহে না। উহাতে সেই আড়তের সমূহ লোকসানের সম্ভাবনা ঘটে। সেই কারণ বশতঃ অধুনা প্রায় ঐ প্রকার প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে।

উক্ত প্রথা রহিত করিবার মূলীভূত প্রধান ব্যক্তিই শ্যামাচরণ। তিনি ব্যাপারীদিগের সহিত সাধুতা সহকারে কার্য্যকরার ফলে তাঁহার আড়তে বহু পরিমাণে পাট আমদানি হইত। সেই কারণেই তিনি ধনী হইতে পারিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের লক্ষ্য ছিল যে, অধিক পরিমাণে মাল বিক্রয় করিতে পারিলেই ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। ব্যবসায়ে শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রবেশ করিলে তাহা কখনই সার্থক হইতে পারে না; উন্নতি হওয়াও অসম্ভব।

ব্যবসায় জীবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি পরিহার করিয়া তিনি ন্যায়ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। সেই নীতির বলেই উত্তর কালে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালিত কোনও কারবারে অধার্ম্মিকতা প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। বঙ্গদেশের পাটের বাজারে যখন তিনি ধনকুবের রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে Jute Prince বা পাটের রাজা বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার "বল্লভ" মার্কা পাট পৃথিবীর পাট ক্রেতাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ পাট হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। এ সকলেরই মূল কারণ, তাঁহার ব্যবসায় বুদ্ধিতে দুর্নীতির কোন সংস্রব আদৌ ছিল না।

শ্যামাচরণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বাছাই করিয়া, পৃথক গাঁট বাঁধিয়া পৃথিবীর বাজারে চালান দিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ দেশের কোনও পাট ব্যবসায়ী এইপ্রকার প্রথা অবলম্বন করেন নাই।

ইউরোপ মহাদেশ সেইরূপ পাট প্রাপ্ত হইয়া তাহা দ্বারা আরও ভাল ভাল সূক্ষ্ম কার্য্য করিবার জন্য সূত্র

প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং এদেশে তাহা বহুমূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। ক্রমশ বল্লভ মার্কা পাট তথায় সুনাম প্রাপ্ত হইল। তখন অপর অনেকে সে প্রথা অবলম্বন করিলেও তাঁহার সুনামকে প্রতিযোগিতায় পরাস্থ করিতে পারে নাই।

এই প্রথা অবলম্বনেও ভবিষ্যতে তাঁহার বহু অর্থাগম হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যদি এরূপ সাধুসঙ্গত উপায় অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে একবার হয়ত তাঁহার পাট বিক্রয় হইত; কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার বিক্রয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া পড়িত।

শ্যামাচরণ বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যবসায়ে ধৈর্য্য, বিশ্বস্ততা এবং সাধুতাই উন্নতির লক্ষ । এজন্য তিনি রাতারাতি বড়লোক হইবার দুঃস্বপ্ন কোনদিন দেখেন নাই। এই জন্য ব্যাপারীদিগের সহিত প্রথম হইতেই তিনি এমন সঙ্গত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল, এই যুবক যেমন মিষ্টভাষী, তেমনই সত্যাশ্রয়ী। কাহাকেও কোনপ্রকারে বঞ্চনা করা

ইহার প্রকৃতিসিদ্ধ হে। যাহারা একবার তাঁহার সহিত কারবার করিয়াছিল, পরে তাহারা তাঁহারই সহিত কারবার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল।

অন্য আড়তে যে সকল ব্যাপারী পাট আমদানি করিত, তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, তাহারা যে দরে পাট বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা শ্যাম বাবুর আড়তের ব্যাপারীরা কিছু বেশী অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই তাহারা পূর্ব্বোক্ত আড়তের উপব বিরক্ত হইয়া গেল। পুনরায় যখন পাট আমদানির প্রয়োজন হইল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত আড়তে না গিয়া শ্যামাচরণের আড়তেই মাল আনিতে লাগিল।

তৎকালে অনেক সময়:ওজনেরও গোলমাল হইত। আড়তের কর্ম্মচারিগণ অনেক সময় নিজেদের অনবধানতা বশতঃই হউক, কিম্বা কোনরূপ স্বার্থবুদ্ধি চালিত হইয়াই হউক, ওজনের তারতম্য করিয়া ফেলিত। তাহাতে ব্যাপারীদিগের সময় সময় ক্ষতি

হইত। শ্যামাচরণের নিকট এইরূপ অসঙ্গত ব্যাপার ঘটিবার কোন উপায় ছিল না।

এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্র রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুরের পরিচালিত কারবারে সেরূপ কোনপ্রকার অধর্ম্মমূলক কার্য্য হইবার উপায় নাই। যাহাতে ওজন সম্বন্ধে কোনপ্রকার গোলযোগ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

যাহা হউক, এইরূপ নানা কারণে শ্যামাচরণের আড়তে এ বৎসর বহু পরিমাণে পাট আমদানি হইতে লাগিল। কিন্তু যেরূপ পরিমাণে পাট আমদানি হইতে লাগিল, শ্যামাচরণেব তাহা অপেক্ষা নিজের মূলধনের পরিমাণ অনেক অল্প। শ্যামাচরণ দুর্ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল পাট রাখিতে পারিলে বহু লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ব্যাপারীদিগকে যে পরিমাণ অর্থ এখন দিতে হইবে, তাহাত তাঁহার কাছে নাই।

তিনি অর্থ সংগ্রহের অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোথাও সুবিধা করিতে না পারিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া

ধান্যকুড়িয়ায় আগমন করিলেন। আশা ছিল, যদি তাঁহার পত্নী কোনক্রমে তাঁহার পিতার নিকট হইতে কিছু টাকা এ সময়ে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। তাহার পর পাটের ব্যবসা সে বৎসরের মত শেষ হইলে, তিনি সুধ সমেত সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিবেন।

তিনি বাটীতে আসিয়া নির্জ্জনে, অতি কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার পত্নীর নিকট সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যদি এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে এ বৎসর অধিক পরিমাণে লাভ হইবার সম্ভাবনা। নচেৎ যেরূপ মাল আমদানি হইতেছে, যদি রীতিমত ভাবে তাহাদিগকে টাকা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে দুর্ণাম রটিবে, পর বৎসর আর কারবার করা সম্ভবপর হইবে না। আবার ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

পত্নী দাক্ষায়ণী সমস্ত ব্যাপার সহজেই বুঝিতে পারিলেন। স্বামীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি পিত্রালয়ে গমন করিলেন। স্বামীর অর্থাভাব নিবন্ধন

নিদারুণ ক্ষোভ যে কোন উপায়েই হউক, নিবারণ করিতে তিনি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার পিত্রালয় এবং স্বামীর বাটী একই গ্রামে—একরূপ পাশাপাশি বলিলেই হয়। তিনি পিতৃভবনে গমন করিয়া প্রথমে তাঁহার পিতার নিকট সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলেন। তারপর স্বামীর জন্য পাঁচ সহস্র মুদ্রা ঋণ স্বরূপ তিনি প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু পতিত বাবু তখনও অভিমানভরে শ্যামাচরণের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিলেন। টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কন্যার সম্মুখে শ্যামাচরণের নামে রূঢ় ভাষায় নানা প্রকার অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পতিতপাবন স্পষ্ট ভাষায় কন্যাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি শ্যামাচরণকে কোনরূপ সাহায্য কখনই করিবেন না।

কিন্তু তাঁহার কন্যাও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যেমন করিয়া পারেন তিনি পিতার নিকট হইতে সাময়িক ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিবেনই। এই অর্থের উপর তাঁহার স্বামীর হৃদয়ে তিনি আনন্দ দান

করিতে পারিবেন—তাঁহার সুনামকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

বুদ্ধিমতী কিশোরী যখন বুঝিলেন, পিতার নিকট সহজ ভাবে কিছুতেই অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নিদ্রিত পিতার নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিবার উপায় তিনি জানিতেন। তাঁহার পিতা কোন স্থানে টাকা রাখেন, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই উপায়ই অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার পিতা দ্বিপ্রহরে নিদ্রিত হইলে, তিনি দেখিলেন, তাঁহার মাতা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। সেই অবসরে তিনি পিতার কটিদেশ হইতে চাবি লইয়া লৌহ সিন্দুক হইতে ছয় সহস্র টাকা বহির্গত করিয়া লইলেন এবং পুনরায় যথা স্থানে চাবি রাখিয়া তিনি স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামীর হস্তে টাকা দিয়া তিনি তাঁহার চিন্তাকুল আননে যে প্রসন্ন হাস্যের দীপ্তি প্রকাশিত হইতে

দেখিয়াছিলেন, তাহার মূল্য টাকার পরিমাণে কখনই নির্ণীত করা যায় না। শ্যামাচরণ তৎকালে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী পিতার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া লইয়া আসিয়াছেন। দাক্ষায়ণী কি উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা শ্যামাচরণ জানিতেও চাহেন নাই, দাক্ষায়ণীও তাহা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া সে সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই।

টাকা প্রাপ্তির আনন্দে শ্যামাচরণ এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়াই তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি এখন সুশৃঙ্খলে ব্যবসায় কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে পারিবেন, অর্থ ও যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে!

এই বৎসর ব্যবসায়ে তাঁহার মূলধন বাদে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা লাভ হইল। তখন শ্যামবাজারস্থিত আড়তদারগণের মধ্যে তাঁহার বেশ সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলেই এই নবীন ব্যবসায়ীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

পতিতপাবন একমাস কালের মধ্যে তাঁহার অপহৃত অর্থ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লাভ করেন নাই। এক দিবস তিনি সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিতে করিতে যখন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ছয় সহস্র মুদ্রা গরমিল হইতেছে, তখন তিনি সেই টাকার জন্য নানারূপ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যা পিতার উৎকণ্ঠার বিষয় জানিতে পারিয়া মুক্তকণ্ঠে অর্থগ্রহণ বিষয়ে সমস্ত কথাই বিবৃত করিলেন।

কন্যার নিকট সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া পতিতপাবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কন্যার উপর তাঁহার ক্রোধ পতিত না হইয়া শ্যামাচরণের উপরেই উহা পুঞ্জীভূত হইল। পতিত বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহার জামাতাই এইরূপ শিক্ষা দিয়া তাঁহার কন্যা দ্বারা টাকা অপহরণ করাইয়াছেন। কন্যা যে কোন অপরাধ করিতে পারে, তাঁহার স্নেহমুগ্ধ পিতৃহৃদয় তাহা কল্পনা করিতেও অসমর্থ ছিল। তাঁহার কন্যা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। শ্যামাচরণের প্ররোচনায়

বাধ্য হইয়া তাঁহার কন্যাকেই এই অপকার্য্য করিতে হইয়াছে।

ক্রোধান্ধ, বিক্ষুব্ধচিত্ত পতিতপাবন কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। নিজের গদিতে না গিয়া প্রথমেই তিনি শ্যামাচরণের আড়তে উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি জামাতার কর্ম্মস্থল দর্শন করেন নাই। হয়ত ক্ষোভ এবং বিরাগ বশতঃ তিনি জামাতার কার্য্য সম্বন্ধে কোন সন্ধান লওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। উহা অস্বাভাবিক নহে। মানব মনের এই দুর্ব্বলতা অনেক চরিত্রবান্ ধর্ম্মভীরু মানুষের অন্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্যামাচরণের কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, আপন বুদ্ধি ও কর্ম্মবলে জামাতা যে কারবারের পত্তন করিয়াছেন ; তাহা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু তখন তাঁহার এ সকল বিষয় অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না।

বহু সহস্র অর্থের জন্য তখন তিনি ক্ষিপ্তপ্রায়। শ্যামাচরণকে দেখিয়া অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপনের

পূর্ব্বেই তিনি টাকার কথা পাড়িলেন। তাঁহার সরলা, পতিপরায়ণা কন্যাকে অসদভিপ্রায় প্ররোচনা দিয়া গর্হিত ভাবে এতগুলি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া পতিতপাবন ক্রোধান্ধ হইয়া শ্যামাচরণকে নির্ম্মম ভাবে তিরস্কার করিলেন। স্বামী হইয়া স্ত্রীকে এইভাবে কুশিক্ষা দেওয়া যে অত্যন্ত অন্যায় তাহা তিনি কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করিলেন।

শ্যামাচরণ এই ভাবে তিরস্কৃত হইয়া বিস্মিত হইলেন। কি ভাবে দাক্ষায়ণী টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা শ্যামাচরণ আদৌ জানিতেন না। তিনি কাজেই শ্বশুরের আরোপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে সকল কথাই অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শ্বশুর মহাশয় কন্যার নিকট তাঁহার অর্থের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার কথা অবগত হইয়া স্বেচ্ছায় টাকা দিয়াছিলেন, এই কথাই তিনি মনে করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ আধুনিক কিতাবতী শিক্ষায় পণ্ডিত না হইলেও স্বাভাবিক উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সাধ্বী পত্নী কোন্ মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, নিদারুণ অভাবের সময় কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় পত্নীগর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পত্নী যে স্বামীর কিরূপ সহায় তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া দাক্ষায়ণীর প্রতি তাঁহার হৃদয় আরও শ্রদ্ধানত হইয়া পড়িল।

ন্যায় ও ধর্ম্মের উপাসক শ্যামাচরণ কয়েক মুহূর্ত্ত পত্নীর আত্ম-নিবেদনের মহিমায় অভিভূত থাকিয়া পরক্ষণে উঠিয়া গেলেন। শ্বশুরের ধনভাণ্ডার হইতে পত্নী যে কয়েক সহস্র টাকা তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সুদসমেত পতিতপাবনের সম্মুখে আনিয়া দিলেন।

পতিতপাবন ইহাতে অবশ্যই পরমানন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার উদ্ধত ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল। অর্থনাশ জনিত যে ক্ষোভ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল, তাহা তখন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সুস্থচিত্তে তখন তিনি অনুসন্ধান লইয়া অবগত হইলেন যে, তাঁহার কপর্দ্দকহীন, আত্মনির্ভরশীল জামাতা তখন ষোল সতের হাজার নগদ মুদ্রার মালিক। তাহা ছাড়া, আড়ত ঘর, গুদাম প্রভৃতি শ্যামাচরণের নিজস্ব সম্পত্তি।

এই শুভ সংবাদে পতিতপাবনের অন্তরস্থিত ক্ষোভের সমস্ত মলিনতা, অভিমান ও ক্রোধের অপবিত্রতা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয় এই স্বাবলম্বী, ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মী জামাতার প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, আনন্দে তাঁহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। মনে মনে তিনি গৃহদেবতা রাধাকান্ত জীউর চরণকমলে লক্ষবার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাইলেন।

না—তাঁহার কন্যা অপাত্রে পড়ে নাই। এই জামাতার জন্য তিনি সগর্ব্বে সকলের সম্মুখে উন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারেন। তিনি যে কপর্দ্দকহীন বালককে দেখিয়া, তাহার সহায় সম্পদহীন অবস্থা জানিয়াও তাহারই হস্তে একমাত্র কন্যা দান করিয়া-

ছিলেন, এজন্য অনুতাপ করা দূরে থাকুক এখন তিনি সকলকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিবেন, তাঁহার ভূয়ো দর্শনের মূল্য আছে, তাঁহার লোকচরিত্র অধ্যয়নের ক্ষমতা আছে। হাঁ, শ্যামাচরণ মানুষের মত মানুষই বটে!

তখন পতিতপাবন তথায় অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া নিজ গদিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পব দিবসেই ধান্য কুড়িয়ার বাটীতে তিনি ফিরিয়া গেলেন। জামাতার স্বাবলম্বনের কথা গৃহিণীর নিকট সবিস্তারে না বলিতে পারিলে তিনি সুস্থ হইতে পারিতে-ছিলেন না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ইন্দিরার খেয়াল

পতিতপাবন ধান্যকুড়িয়ার বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার পত্নী শ্যামাসুন্দরীর নিকট জামাতার কর্ম্মকুশলতার সম্বন্ধে শতমুখে প্রশংসা করিলেন। সকল বিষয় অবগত হইয়া পত্নী পতিতপাবনকে অদূরদর্শী বলিয়া অভিহিত করিলেন। সকল দোষ তাঁহার স্কন্ধে তিনি ন্যস্ত করিলেন। শ্যামাসুন্দরী সুশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার দোষ ক্রটির প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। ন্যায়সঙ্গত কথা বলিতে তিনি কোনদিনই কুণ্ঠিতা হইতেন না।

তিনি স্বামীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্যামাচরণ যে সময় কোন নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিকের কথা তাঁহার

কাছে নিবেদন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। অথবা কারবারের একটা অংশ লিখিয়া দিলেও চলিতে পারিত। তাহা না করায় নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্যামাচরণ যদি আজ তাঁহাদের কারবারে আত্মশক্তি প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে, কারবার বর্ত্তমানে যে ভাবে চলিতেছে, তদপেক্ষা অনেক উন্নত হইতে পারিত—লক্ষ্মী আজ দুই হস্তে যাহা দান করিতেন, সকলে মিলিয়া তাহা কুড়াইয়া উঠিতে পারিতেন না।

কিন্তু তাঁহাদের অবিবেচনার ফলে, আজ শ্যামাচরণ অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে ব্যস্ত। যেদিন হইতে জামাতা তাঁহাদের ব্যবসায়ের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, তখন হইতেই তাঁহাদেরও কারবারে কত ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহাদের বড়বাজারস্থিত ঘৃত চিনির আড়ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্যামাচরণ থাকিলে এ সকল দুর্ঘটনা কখনই সংঘটিত হইত না। সুতরাং পতিতপাবন যে অন্যায় করিয়াছিলেন, শ্যামাসুন্দরী তাহা স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, ঘৃত চিনির আড়ত বন্ধ হইবার ফলে তাঁহাদের স্কন্ধে যে ঋণ ভার চাপিয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। নচেৎ বর্ত্তমান ভূষিমালের কারবারও রক্ষা করিতে পারা যাইবে না।

গোবিন্দচন্দ্র তখন ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ব্যবসায়ের কোন কার্য্য পরিদর্শন করিতে পারিতেছিলেন না। একা পতিতপাবনকেই সকল দিক দেখিতে হইতেছিল। তখন তাঁহার দেহে যৌবনের সে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল না। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি একাকী কি করিয়া সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদন করিবেন? অতএব এখনও যদি জামাতাকে তাঁহাদের কারবারে আবার টানিয়া আনা যায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ের সমূহ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

সুতরাং জামাতা যাহা চাহে তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া এখনই তাহার সাহায্যে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। শ্যামাচরণ যেরূপ পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান, তাহাতে উহাকে পাইলে

পতিতপাবনকে আর কোন প্রকার দুশ্চিন্তায় কাল যাপন করিতে হইত না।

বুদ্ধিমতী নারী আরও বুঝাইলেন যে, তাঁহাদের দুইটিমাত্র সন্তান—এক কন্যা ও এক পুত্র। সুতরাং উভয়কেই যথাযোগ্য ভাবে সমুদয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পুত্র ও কন্যা ভিন্ন নহে।

পতিতপাবন সহধর্ম্মিণীর এই যুক্তিযুক্ত হিতকথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন। বাস্তবিক তিনি অভিমান ও ক্ষোভের বশে যাহা করিয়াছেন, তাহা সমর্থন যোগ্য নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, পত্নীর পরামর্শ মত কার্য্য তিনি অবশ্যই করিবেন।

শ্যামাচবণকে নিজ কারবারে আনয়ন করিবার জন্য পতিতপাবন গোবিন্দ বাবুর মতামত গ্রহণ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র পতিত বাবুর নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন। শ্যামাচরণের প্রতি তাঁহার অন্তরস্থিত বিশ্বাস ও স্নেহ ফল্গুধারার ন্যায়ই প্রবাহিত ছিল। গোবিন্দচন্দ্র আজ

তাহা ব্যক্ত করিতে পাইয়া যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মানব মনোবৃত্তির এই বিচিত্র রহস্যের সমাধান শুধু একজনেরই সাধ্য!

আর বৃথা কালক্ষেপ সঙ্গত নহে মনে করিয়া পতিতপাবন কলিকাতায় গমন করিলেন। পথে কোথাও বিশ্রাম না করিয়া তিনি শ্যামাচরণের পাতি-পুকুরের আড়তে উপস্থিত হইলেন। কুশল সম্ভাষণের পরই পতিতপাবন বলিয়া ফেলিলেন যে, সেইদিন হইতেই শ্যামাচরণকে তাঁহাদের কারবারে যোগদান করিতেই হইবে। শুধু তাহাই নহে, কারবারের সমস্ত ভার তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য শ্যামাচরণ কারবারের অন্যতম অংশীরূপেই কাজ করিতে থাকিবেন। শ্যামাচরণের এই কারবারও সেইদিন হইতেই পতিতপাবন সাউ ও গোবিন্দচন্দ্র গাইনের কারবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইল।

পতিতপাবন আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, পাটের কারবার পরিচালনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা সমস্তই বড় গদি হইতে সরবরাহ করা হইবে।

এ সকল কার্য্যভার শ্যামাচরণকে গ্রহণ করিয়া সেইদিন হইতেই সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। এইজন্যই তিনি জামাতার কাছে আসিয়াছেন। শ্যামা-চরণের কোন আপত্তি তিনি শুনিবেন না।

শ্যামাচরণ বরাবরই পতিত বাবুকে পিতৃসম্মানে সম্মানিত করিতেন। কখনই তাঁহার কোন আদেশের উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। তাহার উপর তিনি দেখিলেন যে, প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইলে, ব্যবসায় ভালরূপে চলিবে এবং অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। টাকার জন্য পুনঃপুনঃ দারুণ দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে হইবে না।

এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া শ্যামাচরণ তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পতিতপাবন কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতে ভালবাসিতেন না। সেই দিনই কারবারে কাহার কি অংশ হইবে সে সম্বন্ধে লেখাপড়া হইয়া গেল।

শ্যামাচরণ সেই দিনই শ্বশুরের সহিত গাইন, সাউ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত গদিতে ফিরিয়া গেলেন;

এবং সেই দিবসই সেই কারবারের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। কারবারের রথ সেই দিন হইতেই কর্ম্মপথে নবোদ্যমে অগ্রসর হইল।

সেই দিন শুভক্ষণে, মাহেন্দ্র-মুহূর্ত্তে শ্যামাচরণ যে বিপুল কর্ম্মভার আপনার বলিষ্ঠ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। কারবারের অংশী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পর শ্যামাচরণ দ্রুত ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাটের কারবার তাঁহারই প্রচেষ্টায় কালক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং তাঁহার নাম পাট-ব্যবসায়িগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। বর্ত্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশে বাঙ্গালী পরিচালিত এতবড় পুরাতন ও প্রতিপত্তিশালী কারবার আর নাই। কোটি টাকারও অধিক মূলধন লইয়া এই ব্যবসায় বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে।

শ্যামাচরণ পুনরায় পতিত বাবুদিগের কারবারে যোগদান করিয়া দেখিলেন যে, সেই কারবারের মধ্যে

নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। তখন পাটের মরসুম নহে। শ্যামাচরণের তখন প্রচুর অবসর। তিনি সুবৃহৎ কারবারের বিশৃঙ্খলতা দূরীভূত করিবার মানসে অখণ্ড মনোযোগের সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

সোনার ঝাঁপি

শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিলেন যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবসায়ের প্রতি উপযুক্ত মনঃসংযোগ করার অভাবেই এই সকল বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

তিনি দেখিলেন, তাঁহার মাতুল গোবিন্দ বাবু কার্য্যে অসক্ত। কারণ, তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়া ধান্য-কুড়িয়াতেই প্রায় অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতে বাধ্য হন। পতিত বাবু একাকী সব কার্য্য পরিচালন করিতে সমর্থ নহেন।

শ্যামাচরণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, নানারূপ কারবারে জড়িত হইলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। পরিচালক অভাবে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সেই জন্য তিনি বড় বাজারের ঘৃত চিনির কারবার একবারে উঠাইয়া দিলেন। অবশ্য উক্ত আড়তের কার্য্য

পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; তবে কোনমতে প্রত্যহ খোলা হইতেছিল। ঘৃত চিনি বাবদ বাজারে মহাজনদিগের নিকট কিছু ঋণ হইয়াছিল। শ্যামাচরণ দোকান তুলিয়া দিয়া মহাজনগণের সহিত একটা সময় লইয়া কিস্তিবন্দি ভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিলেন।

হাটখোলায় যে তিসির গদি ছিল, শ্যামাচরণ তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া শ্যামবাজারে স্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। উহাতে স্বতন্ত্রভাবে গদি ভাড়া, গুদাম ভাড়া প্রভৃতি বহু ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে, এবং শ্যামবাজারের গদি হইতে কার্য্য পরিচালন করা সুবিধাজনক হইবে। এইরূপে যে ব্যয়ভার হ্রাস পাইবে, তাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধের সুবিধা হইতে পারে।

তিনি এই সব কার্য্য পদ্ধতি পতিত বাবুর নিকট বিবৃত করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। পতিত বাবুও শ্যামবাবুর যুক্তির সরবত্তা অনুভব করিয়া সর্ব্বকার্য্যেই তাঁহার মতে মত প্রদান করিলেন।

শ্যামাচরণ উল্লিখিত প্রসঙ্গের অবতারণা কালে প্রায়ই বলিতেন, এই সময়ে তাঁহাকে এরূপ পরিশ্রম করিতে হইত যে, অনেক সময় ক্রমান্বয়ে দুই দিবসের মধ্যে নিদ্রার অবকাশও তিনি পাইতেন না। হয়ত সমস্ত দিবস কঠোর পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় খাতা লইয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই খাতার হিসাব নিকাশ দেখিতে দেখিতে হয়ত রজনী অবসান হইয়া গেল। তৎপর দিবস প্রভাতেই তাঁহাকে আরব্ধ-কার্য্যে নিয়োজিত হইতে হইল। আবার হয়ত সন্ধ্যার পর হিসাব পরীক্ষার জন্য খাতা লইয়া বসিবার আবশ্যক আছে। এজন্য অনেক সময় তাঁহার নিদ্রা যাইবার অবসর ঘটিয়া উঠিত না। কোন দিবস হয়ত শেষে এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা শয্যায় শয়ন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতেন।

আমরণ তাঁহার শরীরে কখনও আলস্য আশ্রয় করিতে পারে নাই। প্রয়োজন হইলে তিনি উপর্য্যুপরি রাত্রিদিন কঠোর পরিশ্রম করিতে পারিতেন।

এইরূপ শ্রান্তিহীন, বিরাম-বিহীন পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই শ্যামাচরণ পতিত বাবুদিগের সেই মৃতপ্রায় কারবারকে প্রায় পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। ঘৃত, চিনির কারবারের প্রায় অর্দ্ধেক ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল। ইহা ব্যতীত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের অর্থের অনটনও ঘটিল না।

পুনরায় পাট ব্যবসায়ের সময় আগত হইল। তখন শ্যামাচরণ শ্বশুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পতিতপাবন এই সময় শ্যামবাজারের আড়তে থাকিয়া ভুষিমালের কারবার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিচালিত করিতে থাকিবেন এবং শ্যাম বাবু পাতি-পুকুরের আড়তে পাটের কারবারের জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবেন। পতিতপাবন শ্যামাচরণের এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই সু-বিবেচক জামাতার বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদের উপকার ছাড়া কখনই অপকার হইবে না।

এইরূপভাবে কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া শ্যামাচরণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এবৎসর আর তিনি নিজ নামে পাট ব্যবসা না করিয়া পণ্ডিত বাবু ও গোবিন্দ বাবুর নামে কারবার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহা "শ্যামবল্লভের আড়ত" নামে জনসাধারণে সুপরিচিত।

শ্যামাচরণ নবোদ্যমে এই পাটের কারবারে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। এ বৎসর তাঁহার চিত্তক্ষেত্র হইতে ব্যবসায়ের জন্য অর্থচিন্তা দূরীভূত হইয়াছিল। প্রসন্ন মনে, পূর্ণ বিশ্বাসে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী যখন প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সত্যনিষ্ঠ, উৎসাহী কর্ম্মীকে পবিত্র করিয়া দেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে বাধাবন্ধ আপনি অন্তর্হিত হইয়া যায়—অনুকূল পবনে ভর করিয়া, স্ফীত-বক্ষঃ তরণী অনুকূল স্রোতে দ্রুত ভাসিয়া যাইতে থাকে।

শ্যামাচরণের আড়তে এবার অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাট আমদানি হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব

বৎসরের অর্জ্জিত সুনাম ব্যাপারীদিগের চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মানুরাগ ও অমায়িকতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। ব্যাপারিগণ বুঝিয়াছিল যে, শ্যামাচরণ স্বয়ং কাহাকেও ঠকাইবেন না এবং প্রবঞ্চিতও হইবেন না। যাহার যাহা ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অবশ্যই তিনি তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন। ব্যবসায়ীর পক্ষে এই সুনাম অর্জ্জন করা অত্যন্ত কঠিন, এবং তাহাকে অপ্রতিহত রাখা আরও দুষ্কর কার্য্য। শ্যামাচরণ তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসরে তাঁহার এমন সুনাম রটিয়া গিয়াছিল, সকলের কাছে এমন বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন যে, ব্যাপারীরা উপযাচক ভাবে তাঁহার আড়তেই মাল আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল।

তাঁহার কারবার এবৎসর অতি জোরের সহিত চলিতে লাগিল। অধিকাংশ ব্যাপারী ও খরিদ্দার তাঁহার আড়তে পাট আমদানি ও খরিদ করিতে আরম্ভ করিল। সময় সময় পতিত বাবু নিজে সেই আড়তে

উপবেশন করিয়া কারবার পরিচালন করিতেন। জামাতার সুনাম, প্রতিপত্তি এবং কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

সেই সময় হইতে পাটের ব্যবসায়ে শ্যামাচরণের সুনাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িতে লাগিল। পাটের ক্রেতা ও বিক্রেতা সকল শ্রেণীর মহাজনও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

শ্যামাচরণের প্রকৃতিসিদ্ধ পরিশ্রম-বিমুখতা, কর্ম্মপ্রীতি এবৎসর যেন লক্ষশীর্ষ বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সাধক যেন সিদ্ধির সান্নিধ্য লাভে তনু-মনঃপ্রাণ দিয়া উগ্রসাধনায় সমাধিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার মধুর সবিনয় ব্যবহারে গাড়োয়ান, মুটিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাপারী, দালাল খরিদ্দার প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি একবার শ্যাম বাবুর সহিত কার্য্যানুরোধে মিশিয়াছে, তাহার পক্ষে তাঁহার সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া দুরূহ। এমন কি তাঁহার প্রতিবেশী, প্রতিযোগী, সমব্যবসায়িগণও তাঁহার উন্নতিতে বিদ্বিষ্ট না হইয়া তাঁহার মধুর বিনম্র ব্যবহারে

মুগ্ধ হইয়া সকলেই মিত্ররূপে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সহজাত-বুদ্ধিবলে শ্যামাচরণ বুঝিয়াছিলেন যে, কোন ব্যবসায় করিতে গেলে সম-ব্যবায়িগণের সহিত কোন মতেই বিরোধ করা সঙ্গত নহে। প্রত্যেকের সহিত মিত্রবৎ মধুর ব্যবহার না করিলে ব্যবসায়ে নানা বিঘ্ন ঘটিতে পারে। এজন্য অনুক্ষণই তিনি প্রতিবেশী সমব্যবসায়ীদিগের সহিত আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন; যাহাতে কোন সূত্রে কাহারও সহিত মনোমালিন্য ঘটে এমন কার্য্যের অবকাশ দিতেন না।

মানুষ যাহা আন্তরিকভাবে কামনা করে এবং কর্ম্মের দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না। বিশেষতঃ যদি সেই কর্ম্ম-পদ্ধতিতে ধর্ম্মের সংমিশ্রণ থাকে, কর্ম্মীর ঈশ্বরানুরাগ যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে সহস্র বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও সেই কর্ম্ম-সার্থকতার বিজয় গৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, কর্ম্মীর ললাটে জয় টীকা চিরদিনের জন্য শোভিত হয়। জননী

ইন্দিরার সোনার ঝাঁপি তাঁহার ভক্তের সাধনার প্রতীক্ষা করিয়া কল্পবৃক্ষে আন্দোলিত হইতেছিল। সাধক হস্ত-প্রসারিত করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মশক্তি

দিন দিন ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের প্রভাবে যেন ঐশ্বর্য্য চারিদিক হইতে বায়ুভরে উড়িয়া আসিতে লাগিল।

ভাগিনেয় ও জামাতার অপূর্ব্ব কর্ম্মনৈপুণ্য এবং তাহার ফলে প্রচুর অর্থাগম দেখিয়া মাতুল ও শ্বশুর বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্যামাচরণের স্বাবলম্বন স্পৃহার ফলে উভয়ে মনে মনে পরম স্নেহভাজনের প্রতি অভিমানভরে যে ভাব ধারার পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্মশক্তির প্রভাবে সাফল্য সন্দর্শনে, সে অভিমান বা তজ্জনিত স্বাভাবিক ক্ষোভ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

শ্যামাচরণ সমভাবে পরিশ্রম করিয়া চলিলেন। জ্ঞান-বৃদ্ধ, ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন পতিতপাবন নিজে গদীয়ান হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। শ্যামাচরণ নিশ্চিন্ত চিত্তে

বাহিরের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই বৎসর পাট ব্যবসায়ে তাঁহারা প্রায় চল্লিশ সহস্র মুদ্রা লাভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে পতিত বাবু ও গোবিন্দচন্দ্র কোন বৎসরই একবারে এত অর্থ লাভ করিতে পারেন নাই। এই অর্থের দ্বারা তাঁহারা বড় বাজারের ঘৃত চিনির আড়তের অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করিলেন। তাহাতে বাজারে তাঁহারা ধার্ম্মিক ব্যবসায়ী বলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইলেন।

পাটের মরসুম চলিয়া গেলে শ্যামাচরণ পুনরায় তাঁহাদের সেই ভুষিমাল কারবার পরিচালনে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। সুব্যবস্থা এবং পরিশ্রমের ফলে তাহাতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক অর্থ ধন-ভাণ্ডারকে স্ফীত করিয়া তুলিল।

পুনরায় পাট ব্যবসায়ের সময় সমাগত হইল। আবার শ্যামাচরণ নবোদ্যমে উহাতে অবতীর্ণ হইলেন। এ বৎসর শ্যামাচরণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের পাতি-পুকুরের আড়তে কেবলমাত্র গোযানে আগত পাটই

প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু শ্যামবাজারের খালের মধ্য দিয়া নৌকাযোগে পাটের আমদানি করিতে না পারিলে বিস্তৃতভাবে ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে না।

কিন্তু খালধার হইতে পাতিপুকুর অবধি পাট লইয়া যাইতে যে গাড়ী ভাড়া লাগে তাহাতে খরচার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। তাহাতে লাভের সম্ভাবনা কম হইবে। শ্যামাচরণ এই সব বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া এ বৎসর শ্যামবাজারের খালের ধারে একটি আড়ত প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। অবশ্য পাতিপুকুরের আড়ত যেমন আছে, তেমনই থাকিবে।

শ্যামাচরণ শ্যামবাজার খালের ধারে একটি আড়ত খুলিলেন। ক্ষুদ্র একখানি পর্ণ কুটীরে লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তর কালে সেই আড়তবাটী ত্রিতল অট্টালিকায় পরিণত হয়। মাল রাখিবার জন্য তখন ভাড়াটিয়া গুদাম ঘর স্থির করা হইয়াছিল। পরিণামে তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ গুদাম ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সেই বাটী ও সেই গুদাম সমূহে কার্য্য চলিতেছে।

যাহা হউক, শ্যামাচরণ দুই স্থানে আড়ত স্থাপন করিয়া পতিত বাবুর হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। এবং তিনি স্বয়ং বাহিরে আমদানি রপ্তানি ও বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত রহিলেন।

এ বৎসর কার্য্য করিয়া তাঁহারা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা আরও বেশী পরিমাণ অর্থ লাভ করিলেন। ওদিকে তখন অর্থের স্বচ্ছলতা প্রযুক্ত তাঁহাদের ভুষিমালের কারবারও সে সময় পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে চলিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ তিন বৎসর উপর্য্যুপরি কার্য্য করিবার পর শ্যামবাবুর পরিচালিত এই কারবারে প্রায় লক্ষ টাকার উপর মূলধন দাঁড়াইল। তিনিও সে সময় মনের আনন্দে ব্যবসায়ে মত্ত হইয়া পড়িলেন। পতিতপাবনও তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশের দ্বারা শ্যামাচরণকে সাহায্য করিতেন।

তিন বৎসর প্রচুর উৎসাহে কার্য্য চলিবার পর শ্যামাচরণের মাতুল গোবিন্দ বাবু দেহ ত্যাগ করিলেন;

কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গোবিন্দচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু কারবার পরিদর্শনের কার্য্য একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসায় সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপারই অবগত হইতেন।

শ্যামাচরণকে তিনি প্রকৃতই স্নেহ করিতেন। ভাগিনেয়ের কর্ম্মশক্তি দেখিয়া তাহাকে নানাভাবে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাতে শ্যামাচরণের পক্ষে ব্যবসা শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হইত। কথা প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, দুইজন প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ পাকা ব্যবসায়ীর সাহায্য ও সদুপদেশ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন প্রতিহত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ে যে তিনি ঋণী এ কথা মুক্তকণ্ঠে তিনি স্বীকার করিতে কোনও দিন সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই।

গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুকালে শ্যামাচরণ তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। ভাগিনেয়ের উপর তাঁহার এমন স্নেহ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল যে, আসন্ন কালেও তিনি

স্বীয় পুত্রগণকে শ্যামাচরণের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্যামাচরণ পূজ্যপাদ মাতুলের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হন নাই। আসন্ন সময়ে—দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও পরলোক পথের যাত্রী গোবিন্দচন্দ্র ভাগিনেয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের পুত্রগণও সে পিতৃবাক্য কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। শ্যামাচরণের জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলেন। এখনও শ্যামাচরণের পুত্রগণ গোবিন্দ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গাইনকে পিতৃ-সম্মানে সম্মানিত করিয়া থাকেন। তিনিও শ্যামাচরণের পুত্রগণকে সন্তান তুল্য স্নেহ করিয়া থাকেন। শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভের উপর সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সারাজীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ও শান্তি প্রত্যেক মানবেরই কাম্য। শ্রীযুক্ত

অক্ষয়কুমার অধুনা পারমার্থিক চিন্তায় কালযাপন করিতেছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর শ্যামাচরণ গোবিন্দ বাবুর মধ্যম পুত্র নফর বাবুকে কারবারে টানিয়া আনিলেন। ব্যবসা সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য তিনি তাঁহাকে শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। কালে এই নফর বাবুও অতি উচ্চ দরের ব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পতিত বাবুর মৃত্যুর পর নফরচন্দ্র শ্যাম বাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সমস্ত আফিসের কার্য্যভার লইয়া অতবড় কারবারের আভ্যন্তরিক সমুদয় বিষয় সুশৃঙ্খলে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

এই নফর বাবুর অন্তঃকরণ যেমন মহৎ তেমনই উদার ছিল। তাঁহার মনে অভিমানের উগ্রতা ছিল না, পরিশ্রমে কেহ তাঁহাকে কখনও বিমুখ দেখে নাই। শ্যামাচরণকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্যামাচরণের জীবদ্দশায় এই উচ্চ হৃদয় যুবক অকালে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে শ্যামাচরণ অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "অদ্য আমার দক্ষিণ হস্ত ভঙ্গ হইল।"

গোবিন্দ বাবুর চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ক্ষীরোদচন্দ্র মধ্যম নফরচন্দ্র, তৃতীয় মহেন্দ্রচন্দ্র, চতুর্থ অক্ষয়কুমার। জ্যেষ্ঠ ক্ষীরোদচন্দ্র কখনই কোনরূপ কার্য্যে লিপ্ত হন নাই। তিনি ধান্যকুড়িয়ার বাটীতেই অবস্থান করিতেন। মধ্যম নফর বাবুই কারবারের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহেন্দ্র বাবু কারবারের পরিদর্শক রূপে গমন করেন।

মহেন্দ্র বাবু অতি সৌখীন পুরুষ ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। সামাজিকতারও তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এজন্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হেতু তিনি ধান্যকুড়িয়ায় দুইটি সুবৃহৎ, মনোরম প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুই কারুকার্য্য সমন্বিত মনোরম সৌধের সমগ্র পরিকল্পনা মহেন্দ্রচন্দ্রের মস্তিষ্ক-

প্রস্তুত। ধান্যকুড়িয়ার রাজ-অট্টালিকা তুল্য বিচিত্র-দর্শন সৌধ দর্শনে দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ—স্থাপত্যশিল্পীও মহেন্দ্রচন্দ্রের স্থপতি বিদ্যার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর অক্ষয় বাবুই তাঁহার পরিত্যক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনিও অতি সুবিবেচনার সহিত কারবার পরিচালনা করিতেন।

যাহা হউক, গোবিন্দ বাবুর মৃত্যুর পর কারবার সমভাবেই চলিতে লাগিল। পতিতপাবন, শ্যামাচরণ এবং নফরচন্দ্র এই তিন জনের সমবেত পরিশ্রম কারবারে প্রযুক্ত হইল।

* যে দাদন-প্রথার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শ্যামাচরণ পাটের কারবারে উহা প্রথম প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাহার ফলে বহু পাট তাঁহার আড়তে আমদানি হইতে লাগিল। শ্যাম বাবু দেখিলেন যে, আড়তের দ্বারা যতদূর উপার্জ্জন সম্ভবপর তাহা তাঁহাদের হই-

তেছে, ইহা অপেক্ষা আর বেশী লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন কি প্রণালী অবলম্বন করিলে এক্ষণে আরও বেশী লাভবান হওয়া যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয় মাল্য

শ্যামাচরণ যে ধাতুতে গঠিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মধ্যপথে নিবৃত্ত হইবার মানুষ ছিলেন না। তাঁহার উচ্চাভিলাষ ছিল, কিন্তু তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষা বলা যাইতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মানুষ যাহা সম্পাদন করিতে পারে, তাহা অন্য মানুষ পারিবে না কেন? সুতরাং তিনি অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন, বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ পাট যদি বিলাতে রপ্তানি করা যায়, তাহা হইলে লাভের সম্ভাবনা বেশী। তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন, কি প্রণালীতে বিদেশে পাট পাঠাইতে পারা যায়।

অনুসন্ধান ফলে তিনি জানিতে পারিলেন, পাট জাহাজে বোঝাই করিবার পূর্ব্বে গাঁটবন্দী করা

প্রয়োজন। অর্থাৎ পাটকে চাপিয়া হ্রস্বায়তন করিতে হইবে—অল্প পরিসর স্থানে যাহাতে পাটের গাঁটগুলি স্থান গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইংরাজীতে এই গাঁটবন্দী পাটকে 'বেল' কহে। যাঁহারা এইরূপ পাটের ব্যবসা করেন, তাঁহা-দিগকে 'বেলার' কহে। শ্যামাচরণ এই 'বেলারের' কাজ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

সঙ্কল্প স্থির করিবার পর, তিনি শ্বশুর পতিতপাবনকে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পতিতপাবন ইদানীং জামাতার মতেই মত প্রদান করিতেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে, শ্যামাচরণ যাহা করিবেন, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই থাকিতে পারে না।

পতিতপাবন সানন্দে মত দিলেন। কিন্তু শ্যামা-চরণ তখন কার্য্যারম্ভ করিতে পারিলেন না। কারণ, 'বেলার' হইয়া ব্যবসায় করিতে গেলে যে যে বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। সুতরাং অজ্ঞতা লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার

প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। না জানিয়া কোন কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিলে, তাহাতে ব্যর্থতা ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। তিনি কোন কার্য্য অবলম্বন করিয়া তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এজন্য তিনি বেলারের কার্য্যপদ্ধতি অগ্রে শিখিবার প্রচেষ্টা করিলেন। তাঁহার বিশেষ পরিচিত একব্যক্তি সে সময় বেলারের কাজ করিতেন। শ্যামাচরণ তাঁহার কার্য্যালয়ে ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার জন্য ছাত্রের ন্যায় কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময় তাঁহাকে কঠোরতর পরিশ্রম করিতে হইত। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া তিনি নিজ আড়তের প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি যথাবিধি সম্পন্ন করিতেন। তারপর বেলা ১টার সময় আহারাদি করিয়া বন্ধুর কার্য্যালয়ে কাজ শিখিতে গমন করিতেন। ইহাতে তাঁহার একদিনের জন্যও ক্লান্তিবোধ হয় নাই। আপনাকে শিক্ষানবীশ মনে করিয়া কোনও দিন দীনতাও অনুভব করেন নাই। শ্যামাচরণ তখন আপনাদের কারবারে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। মান

সম্ভ্রমও হইয়াছে; কিন্তু তথাপি তিনি পরিচিত বন্ধুর কারবারে রীতিমত শিক্ষানবীশের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াদিলেন।

বন্ধুর আপিসে পাট পরিষ্কার হইয়া বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে উহা গাঁইট বন্দী হইত। শ্যামাচরণ আরম্ভ হইতে সমাপ্ত পর্য্যন্ত বেলারের যাবতীয় কার্য্য হাতে কলমে শিখিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ আপিসের কর্ম্মচারীরা যে ভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট অংশের কাজ করিতে থাকে, শ্যামাচরণ ঠিক সেইভাবে প্রত্যেক পর্য্যায়ের কার্য্য আয়ত্ত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কোন কার্য্যই বাদ দিলেন না।

শিক্ষার্থীর প্রচণ্ড শিক্ষাস্পৃহা থাকিলে জ্ঞান আপনা হইতে তাঁহার মস্তকে জয় মুকুট পরাইয়া দিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ পাট পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রণালীতে উহা কোথায়, কি ভাবে বিক্রয় করিতে পারা যায়, সকল বিষয়েরই উপযুক্ত সন্ধান লইতে লাগিলেন। কোন্ কোন্ দেশে উহার ক্রেতা আছে, তাহাদিগের নিকট কি ভাবে মাল বিক্রয় করিলে

সুবিধা হইতে পারে, সমস্ত সন্ধান তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

একবৎসর সমভাবে পরিশ্রম করিয়া বেলারের কার্য্যের যাহা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় সমস্তই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় তাঁহার পিতৃ-কল্প, পরম-হিতৈষী শ্বশুর মহাশয়—পতিতপাবন অক-স্মাৎ কয়েক দিনের পীড়ায় ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। শ্যামাচরণ এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পতিতপাবন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার শিক্ষাগুরু এবং পরম-হিতৈষী ছিলেন।

পতিতপাবন মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র উপেন্দ্রনাথকে শ্যামাচরণের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। যদিও উপেন্দ্রনাথ তাঁহার শ্যালক ছিলেন; কিন্তু শ্যামা-চরণ কখনও তাঁহাকে সেরূপ মনে না করিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, যত্ন করিতেন। তাঁহাকে সকল প্রকার অবস্থা হইতে রক্ষা করিতেন।

উত্তরকালে শ্যামাচরণ যখন বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তখন আপনার নামে খরিদ না করিয়া তিনি উভয়ের নামেই ক্রয় কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে সে সময় সমস্ত জমিদারীই তিনি নিজ নামে খরিদ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

উপেন্দ্রনাথকে শ্যামাচরণ উল্লিখিত ক্রীত জমিদারী গুলির পরিচালন ও পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সমগ্র বসিরহাট মহকুমার মধ্যে যে কয়জন দয়ার্দ্রচেতা, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শ্যামাচরণ ও উপেন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

শ্যামাচরণের উৎসাহে এবং উপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় স্ব-গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ জন সাধারণের মূর্খতা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্যামাচবণ বিদ্যালয়টিকে অবৈতনিক করিয়া দিয়া তাঁহার করুণ-হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত অবৈত-

নিক থাকিবার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুসারে বিদ্যালয়টিকে বৈতনিক করিতে হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু এখনও বহু দরিদ্র-সন্তান বিনা বেতনে উক্ত বিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে। উক্ত ছাত্রগণের বেতনের অর্থ সম্মিলিত কারবার হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

উপেন্দ্রনাথের মহৎ-কীর্ত্তি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় লোকসমাজে তিনি বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। দেশের মধ্যে সে যুগে ভাল চিকিৎসক এবং চিকিৎসার উপযোগী ঔষধাদি উভয়েরই অভাব ছিল। পল্লীর স্বভাবসুন্দর শ্যামাঙ্গণে যে সময় স্বাস্থ্য ও উৎসাহের স্রোত বহিয়া যাইত, তখন মানুষ সাধারণতঃ রোগ পীড়ার ধার ধরিত না ; কিন্তু প্রতীচ্যসভ্যতার প্রভাবে রেলের বাঁধ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাপারে যখন জল নিকাশের পথ রোধ হইয়া, দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি উৎকট রোগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, পল্লীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তখন পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসক ও ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ দেশবাসীর সেই অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া উহার প্রতীকার কামনায়

হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন।

তিনি স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে "শ্যামাসুন্দরী চেরিটেবল ডিস্পেন্সারি" নামক এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে যে কত দীন দরিদ্র রোগ-মুক্ত হইয়া তাঁহার স্বর্গগত আত্মাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উপেন্দ্রনাথ নানারূপ সৎগুণের অধিকারী ছিলেন। উত্তরকালে শ্যামাচরণের মৃত্যুর পর মহেন্দ্র বাবু ও অক্ষয়বাবুকে সহকারীরূপে লইয়াই তিনি সেই বৃহৎ কারবার পরিচালন করেন।

কর্ম্মবীর শ্যামাচরণের প্রচেষ্টায় কাজ এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, উপেন্দ্রনাথ অবশেষে বাধ্য হইয়া একটি নূতন গাঁটবাধিবার কল ক্রয় করেন। তিনি বহু জমিদারীও বৃদ্ধি করিয়া যান। ইংরাজী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নয় পুত্র তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ

সাউ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সাউ ও শ্রীযুক্ত পান্নালাল সাউ এক্ষণে এই বিরাট কারবারে তাঁহার পিতৃষ্বস্থভ্রাতা অর্থাৎ শ্যাম বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভের সহকারীরূপে কারবার পরিচালন করিতেছেন। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময়েই বলেন যে, এই কারবারে যদি শ্রীমান পুলিনের অভাব হয় তাহা হইলে একাকী তিনি এই বৃহৎ কার্য্য পরিচালন করিতে সমর্থ হইবেন না। পুলিন বাবু অল্প বয়সেই নানা সদ্-গুণের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি অধুনা ২৪পরগণা জেলা বোর্ডের সভ্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কমিশনার।

যাহা হউক, পতিত বাবুর মৃত্যুর পর শ্যামাচরণ একাকী সেই বিরাট কারবার পরিচালন করিতে লাগিলেন, সহকারী মাত্র নফর বাবু। সেই সময় তিনি বেলারের কার্য্য খুলিয়া দিলেন। তখন তাঁহাকে একদিকে আড়ত এবং অপরদিকে বেলারের কার্য্য সমস্তই দেখিতে হইত। এই বেলারের কার্য্য করিবার সময় তিনি প্রথমতঃ গোলাবাড়ী প্রেস নামক একটি

ক্ষুদ্র কল ভাড়া লইয়া তথায় পাটের গাঁট বাঁধিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

ক্রমে শ্যামাচরণ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বহু পরিমাণে মাল বিক্রয়ের সুবিধা করিবার জন্য চিন্তা করিয়া "বল্লভ" মার্কা পাট বাজারে বাহির করিলেন। তাঁহার এই "বল্লভ" মার্কা পাটের চাহিদা বিদেশের বাজারে দিন দিন বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল।

তখন তিনি দেখিলেন, সেই ক্ষুদ্র কলের সাহায্যে প্রয়োজনানুরূপ মাল সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে। তাহা ছাড়া তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন যে, ভাড়া করা কলে ব্যয়বাহুল্য হইতেছে। যদি তাঁহার নিজের কল থাকিত তাহা হইলে বৎসরে বহুলক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইত। তখন এই কারবারে তিনি বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছিলেন।

শ্যামাচরণ নানাদিক বিচার করিয়া অতঃপর কাশীপুরে প্রায় পনের ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'ঝিলপ্রেস' নামক একটি কল স্থাপন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই উপায়ে নিজের কলে গাঁট

বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলে পরিণামে তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইবে !

কল প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহাতে চাহিদার উপযোগী দ্রব্য সকল সময় সরবরাহ করা চলিত না। সময় সময় শ্যামাচরণকে অন্যত্র হইতে অতিরিক্ত কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে হইত। ইহাতেও কারবারের লভ্যাংশ কম হইত না। শ্যামাচরণ তখন ব্যবসায়ে বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জয়শ্রী

শ্যামাচরণ অতঃপর ধান্যকুড়িয়ায় স্বল্পপরিসর স্থানের উপর নির্ম্মিত ক্ষুদ্রবাটী ভাঙ্গিয়া তৎ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমিক্রয়ের পর এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী তখন তাঁহার উপর সমধিক প্রসন্ন।

কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে গ্যালিফ ষ্ট্রীটে আর একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। ব্যবসায় তখন জয়পতাকা উড়াইয়া চলিয়াছে—কর্ম্মের রথ-চক্রের গম্ভীর নির্ঘোষে দিগন্ত নিনাদিত। শ্যামাচরণ তখন জমিদারী ক্রয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। কলিকাতা অঞ্চলেও বহু ভূসম্পত্তি তাঁহার অধিকারে আসিল। কিছু দিনের মধ্যে অর্থ, যশঃ, প্রতিষ্ঠা শ্যামা-চরণের নাম স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিল। জয়শ্রী তাঁহার ললাটে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাঁহার অংশীরাও নানাস্থানে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। বড় বড় জমিদারী তাঁহাদের নামেও ক্রীত হইতে লাগিল। যৌথ কারবারের প্রত্যেক অংশীই সৌভাগ্যের উন্নত স্তরে উপনীত হইলেন।

শ্যামাচরণ মাল বহনের জন্য একখানি ষ্টীমার ও পঞ্চাশ খানি বোট ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। পাট খরিদের জন্য সমগ্র বঙ্গদেশের আটটি প্রসিদ্ধ পাটের কেন্দ্রে শ্যামাচরণ মোকাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সকল মোকামে পাট ক্রয় করা হইত। অধুনা এই কারবারের অন্তর্গত কয়েকটি মোকাম বর্ত্তমান পরিচালকগণ উঠাইয়া দিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার পিঙ্গলা নামক স্থানে তাঁহাদের সুবৃহৎ গদি রহিয়াছে— উহা প্রস্তুত করিতে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই গদি রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্যামাচরণ পাট ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিলেও পুরাতন ভূষিমালের কারবার পরিত্যাগ করেন নাই। উক্ত ব্যবসায়ও যাহাতে সুপরিচালিত

হইয়া অর্থার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত রাখে, সেদিকে কর্ম্ম-বীর শ্যামাচরণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ভুষিমালের কারবারেও যথেষ্ট লাভ ছিল। সুপরিচালিত হওয়ায় উহার সাহায্যে প্রচুর ধনাগমও হইতে লাগিল। লক্ষ্মী যেন পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্যামাচরণকে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছিলেন।

শ্যামাচরণ মধ্যে মধ্যে অন্যান্য নানাপ্রকার সুবিধা-জনক উপায়ে মাল ক্রয়-বিক্রয় দ্বারাও বৎসরে দুই চারি লক্ষ টাকা উপায় করিতেন। তাঁহার লক্ষ্যই ছিল নানা উপায়ে ব্যবসা দ্বারা অর্থ লাভ করা। যখনই যে দ্রব্য সুবিধা দরে পাইতেন, ক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ লাভ করিতেন। ধনাগমের সহস্রবিধ সাধুপন্থার অভাব তাঁহার কাছে কখনও হয় নাই।

ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ধনের প্রভাবে কোনও দিন তিনি সাধু-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। কখনও অযথা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অসদুপায়ে অর্থার্জ্জনের কল্পনা

পর্য্যন্ত মনে স্থান দিতেন না। তিনি ইংরাজ কবির রচনা পড়েন নাই—“Conscience is his own retreat” এই কথাটার অর্থ তিনি জানিতেন না ; কিন্তু উহার তাৎপর্য্য তাঁহার চিত্তে আপনা হইতেই উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

বিবেকের দংশন অনুভব করিবার মত কোন কার্য্যই জীবদ্দশার মধ্যে তাঁহাকে কখনও করিতে হয় নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সত্যই জয়লাভ করে ; তাঁহার ধারণা ছিল, ধর্ম্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এজন্য সমগ্র জীবনের মধ্যে তিনি কোন বিষয়েই অধর্ম্মকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্রের স্থান অধিকার করিলেও শ্যামাচরণ পরিশ্রমে বিরত ছিলেন না। অতুল ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের মধ্যে পরিবেষ্টিত হইবার শুভ-সুযোগ পাইয়াও শ্যামাচরণ বিলাসিতার দিকে মনঃসংযোগ

করিবার বিন্দুমাত্র অবসর পাইলেন না। সমভাবে কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া চলিতে লাগিলেন।

বিলাসিতার সাধারণ অর্থ হিসাবে এখানে এই শব্দটি প্রযুক্ত হইল না। আলস্যে কাল হরণ করার ব্যাপক অর্থেই ইহাকে বুঝিতে হইবে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্তান-ভাগ্য

কর্ম্মপথের যাত্রী—পরিশ্রমের অবতার শ্যামাচরণ ব্যবসায় ব্যাপারে জয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া জীবনে সার্থকতা অর্জ্জন করিলেন। জননী ইন্দিরার ন্যায় মাতৃত্বের দেবী ষষ্ঠীঠাকুরাণী তাঁহার উপর আশীষ-ধারা বর্ষণে কৃপণতা করেন নাই।

একে একে তিনি তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যার জনক হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণ পুত্রকন্যাগণের শিক্ষা-কার্য্যে আদৌ উদাসীন ছিলেন না।

শ্যামাচরণ ভাগ্যক্রমে গুণবতী পত্নী লাভ করিয়া-ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সহধর্ম্মিণী দাক্ষায়ণী শ্যামাচরণের সকল কার্য্যেই সহায়-স্বরূপিণী ছিলেন। কঠোর জীবন-সংগ্রামের অবকাশে, তিনি পতিগতপ্রাণা পত্নীর সাহায্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখলাভে

ধন্য হইয়াছিলেন। পত্নীর সেবা ও শুশ্রূষায় তাঁহার জীবন সার্থকতা লাভ করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণের দেবেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথ নামক তিন পুত্র এবং নারায়ণী, নিথরবালা ও নলিনীবালা নাম্নী তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। স্নেহাতুর পিতৃহৃদয় পুত্রকন্যাগুলির প্রতি সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকিত। সন্তানগুলি যাহাতে সুশিক্ষিত হয় এ বিষয়ে শ্যামাচরণের বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার মনে এমন কল্পনাও ছিল যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে তিনি ব্যবসা-শিক্ষার জন্য য়ুরোপ প্রেরণ করিবেন। কিন্তু শ্যামাচরণের সে আশা ফলবতী হয় নাই। পুত্রকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। সে কথা যথাকালে বিবৃত হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে শ্যামাচরণের পুত্রগণের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। কারণ শ্যামাচরণের শিক্ষার ফল উত্তরকালে পুত্রগণের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ অদৃষ্টচক্রে পিতার নিকট হইতে পূর্ণরূপে শিক্ষা পাইবার বহুপূর্ব্বেই তাঁহার সংস্রব হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্যুত হইয়াছিলেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার স্কন্ধে বিরাট ব্যবসায় ও জমিদারী পরিচালনের কর্ম্মভার চাপিয়া পড়িয়াছিল। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তিনি সমাপ্ত করিবার অবকাশ পান নাই। অল্প বয়সেই মাতুল উপেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মিরূপে তাঁহাকে সংসার-সংগ্রামের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

ধনীর সন্তানগণের পশ্চাতে শনিরূপে যে সকল ব্যক্তি সমবেত হইয়া সুকুমারমতি কিশোর বা যুবকগণকে উৎসন্নের পথে লইয়া যায়, দেবেন্দ্রনাথকে তেমনভাবে কেহ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বাল্যকালেই পিতৃদেবের শিক্ষার প্রভাব এবং বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী জননীর কঠোরদৃষ্টি তাঁহাকে যাবতীয় অনিষ্টকর প্রভাবের মোহ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পিতৃমাতৃ-পুণ্যফলে এবং সহজাত প্রতিভা-শক্তির প্রভাবে কিশোরবয়স হইতেই ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকেন। মাতুলের সহিত একযোগে কার্য্য পরিচালনের পর, তাঁহার দেহাবসান হইলে, দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ক্ষেত্রে সব্যসাচীর ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি-সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশনেরও তিনি একজন মনোনীত সভ্য। দেশের বিবিধ হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত দেবেন্দ্রনাথ কোন না কোন ব্যাপারে বিজড়িত থাকেন। বসিরহাট সহরের উপর তাঁহার পিতৃদেবের নামে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। স্বর্গীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় পুত্রগণকে উৎসাহিত করিয়া এবং সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়া বসিরহাট সহরে প্রকাণ্ড টাউনহল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

দরিদ্রের প্রতি পিতার ন্যায় তিনিও মুক্তহস্ত। শতশত অনাথ আতুরের দুঃখ বিমোচনকল্পে শ্যামাচরণের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা উন্মুখ। পিতার ন্যায় দেবপূজায় তিনি আগ্রহশীল। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় কোনদিন শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রও এ বিষয়ে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

গৃহদাহের সংবাদ পাইলেই শ্যামাচরণের পুত্রগণ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের ধনভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিতে ইতঃস্ততঃ করেন না। শ্যামাচরণ এ বিষয়েও পুত্রদেহে বর্ত্তমান হইয়া যেন কার্য্য করিয়া থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রের অত্যন্ত অনুরাগী এবং স্বয়ং এবিষয়ে সুপণ্ডিত।

শ্যামাচরণের পুত্র-সৌভাগ্য বিশেষভাবে বর্ণনীয়। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় হরেন্দ্রনাথও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন; কিন্তু সাহিত্যসেবায় তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি সুপণ্ডিত শিক্ষকগণের নিকট থাকিয়া শিক্ষার্থীর ন্যায়

নানাশাস্ত্রগ্রন্থ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। শ্যামাচরণের প্রভাব পুত্রগণের মনে পরোক্ষভাবে অবশ্যই কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু জননী দাক্ষায়ণীরও প্রভাবও তাঁহাদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কনিষ্ঠ ভুপেন্দ্রনাথও অসাধারণ গুণগ্রামে ভূষিত। তিনটি সহোদর তিনটি রত্ন। চরিত্রের উদারতা, স্নেহ, ভালবাসা, দরিদ্রনারায়ণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, তিনটি সহোদর উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা ও মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ের বিপুল কর্ম্মভার লইয়া পিতৃদেবের কর্ম্মশক্তির সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন, মধ্যম হরেন্দ্রনাথ বিরাট পুস্তকাগারের মধ্যে আত্মসমাহিতচিত্তে শ্যামাচরণের অন্তর্নিহিত দেবী সরস্বতীর প্রতি শ্রদ্ধানুরাগের তর্পণ করিতে ব্যস্ত; কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনের উদ্দীপনা ও উৎসাহ লইয়া জ্যেষ্ঠাগ্রজের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্যামাচরণের কর্ম্মশক্তির উপাসনা করিতেছেন।

শ্যামাচরণের হৃদয়ে দয়া, মায়া, কারুণ্য, প্রভৃতি যে সকল উদার মনোবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে স্ফুরিত হইয়া দেশবিখ্যাত যশে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার সন্তানগণের মধ্যেও ঠিক সেই বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। দয়া ও মমতায় তিনটি সহোদরকে আদর্শস্থানীয় বলিলে অবশ্যই অত্যুক্তি হইবে না। হরেন্দ্রনাথ বহু সাহিত্যিকের আশ্রয়স্থল হইয়া নীরবে কর্ম্ম-সাধনা করিতেছেন। বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে দেশের মঙ্গলানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা প্রভৃতি কার্য্যে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠবৃত্তি সমূহের চর্চ্চা, পিতৃপুণ্যের পরিচায়ক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্যামাচরণ যে সকল বিষয়ে ভাগ্যবান্ ইহার প্রমাণ প্রয়োগকল্পে তাঁহার তিনটি পুত্র উত্তরকালে কিরূপ যশোভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলোচ্য অধ্যায়ে সঙ্ক্ষেপে পুত্রপরিচয় প্রদত্ত হইল।

কন্যাত্রয়ও অশেষ ভাগ্যশালিনী হইয়াছেন। শ্যামাচরণ অবশ্য এ সকল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সন্তান-ভাগ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই এ প্রসঙ্গগুলি অপরিত্যাজ্য।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহসুখ

"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। কথাটি যে শুধু সার্থক তাহা নহে, মানব জীবনে গৃহিণী-সৌভাগ্য-লাভই বোধহয় ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। কবি সেক্সপীয়র বলিয়াছিলেন, "ভাল স্ত্রী লাভই ইহ জগতে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।" ভাল স্ত্রী বলিতে গৃহিণী-বিদ্যা-বিশারদা নারীকেই বুঝায়।

বাস্তবিক এ জগতে বহু ধনী, মানী ও কৃতি লোকের কাহিনী শুনা যায়; কিন্তু উপযুক্ত পত্নী বা সুগৃহিণীর অভাবে তাঁহাদের অনেকের জীবন সার্থকতা লাভে ধন্য হইতে পারে নাই।

সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র শ্যামাচরণ কিন্তু এ বিষয়ে পরম ভাগ্যবান ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী দাক্ষায়ণী পরম গুণবতী রমণী ছিলেন। স্বামীর প্রতি অপরিসীম প্রেম ও শ্রদ্ধা তাঁহার ত ছিলই,

অধিকন্তু তিনি স্বামীর পরামর্শদাত্রী ছিলেন। জীবন সঙ্কটে তিনি পত্নীর নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়া অনেকবার পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

পত্নী যে শুধু বিলাসসঙ্গিনী বা সন্তানের জননী এই ধারণা—কিতাবতী শিক্ষায় অনভ্যস্ত শ্যামাচরণও কোনদিন করিতে পারেন নাই। স্ত্রী যে, সখী, সচিব, সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ এক কথায় ইহকাল ও পরকালের পরম সহায়, ইহা শ্যামাচরণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন।

কার্য্যদ্বারাও দাক্ষায়ণী তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। সংসার-সংগ্রামে বিজয়মাল্য লাভ করিয়া শ্যামাচরণ যখন দেহ ও মনে বিশ্রামের প্রয়োজন মনে করিতেন তখন সাধ্বী নারী তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার ও সুধাস্রাবী আলাপে স্বামীর শ্রান্তি বিনোদন করিতেন। সকল সময়েই তিনি স্বামীর পার্শ্বে আনন্দ ও প্রীতির নির্ঝরিণীর ন্যায় বিরাজ করিতেন।

সংসারে—আনন্দলতিকার ন্যায়, দাক্ষায়ণী প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পসম্ভারে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার ন্যায় পবিত্রমূর্ত্তিতে শ্যামাচরণের গৃহপ্রাঙ্গণে

তিনি সর্ব্বক্ষণ বিরাজিতা থাকিতেন। গৃহী এই সুখের জন্য লালায়িত। শ্যামাচরণ পূর্ণমাত্রায় দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

দানবীর শ্যামাচরণ অনেক সময় কল্পতরু হইয়া দান করিতেন। গৃহে সর্ব্বদাই শত শত ব্যক্তি উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করিত। শ্যামাচরণ তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার পত্নী স্বামীর এই উদার মনোবৃত্তির সাহায্য কল্পে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেন।

উত্তরকালে ধান্যকুড়িয়ার প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, কলিকাতার বাটীতে—সকল স্থানেই 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব সমুত্থিত হইত। দাক্ষায়ণী যখনই যেখানে থাকিতেন, এই অন্নদান ব্রত পূর্ণমাত্রায় সফল করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেন। সকলেই এই করুণাময়ী মহিলার উদার স্নেহ দৃষ্টির ছায়ায় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইত।

সুখী, পরিতৃপ্ত শ্যামাচরণ যুক্তকরে বিশ্বনাথের চরণে এ জন্য কি সহস্রবার প্রণতি নিবেদন করেন নাই?

মধুরভাষিণী পত্নী যাঁহার সহায়, স্নেহময়ী ভার্য্যা যাঁহার অনুগতা, বুদ্ধিমতী নারী যাঁহার মন্ত্রণাদাত্রী তাঁহার কিসের অভাব? শান্তির পাল তুলিয়া সুখের তরণী জীবন নদীতে তরতর বেগে বহিয়া চলিতে লাগিল।

জননী, সহোদর সকলেই এই পূর্ণ গৃহলক্ষ্মীর সেবা শুশ্রূষায় সুখী, পরিতৃপ্ত। কাহারও কোনপ্রকার অভাব অনুভূত হইবার পূর্ব্বেই দাক্ষায়ণীর ব্যবস্থাগুণে তাহা পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। অবশ্য শ্যামাচরণ কাব্যশাস্ত্রের চর্চ্চা কোনদিন করেন নাই—সে অবকাশ তাঁহার কোন দিন ঘটে নাই, নহিলে তিনি কবির সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া পত্নীর উদ্দেশে হয়ত বলিতে পারিতেন—

“তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী—
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
হোক্‌গে এ বসুমতী
যার খুসি তার॥”

———

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের ডাক

শ্যামাচরণ পল্লী-জননীর-ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া পল্লীর শ্যামাঙ্গণেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এ জন্য কর্ম্ম-কোলাহল মুখরিত সহরের ব্যস্ততার মধ্যে অনেক সময় যাপন করিতে হইলেও, তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে পল্লী-জননীর মাধুর্য্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব শ্রী সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত থাকিত। তাঁহার হৃদয় অন্তঃপুরে সর্ব্বদাই মায়ের আহ্বান-বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিত।

এজন্য কর্ম্মজীবনে সফলতালাভ করিয়াও তিনি গ্রামকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অধুনা বাঙ্গালী, পল্লী-জননীর কথা শুধু বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ভাষার ঝঙ্কারে পল্লবিত করিয়া বলিতে পারে সত্য, কিন্তু পল্লী-জননীর ক্রোড় হইতে আপনাকে সর্ব্ব প্রযত্নে দূরে রাখিবার ব্যবস্থাই তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়া

থাকে। বাঙ্গালার জমিদার এখন আর পল্লীর শ্যামল-স্নিগ্ধ-ছায়ায়, পিতৃপিতামহের বাস-ভবনে বাস করিয়া তৃপ্তি পান না। সহরের বিজলী পাখা ও বিদ্যুতের আলোকের অভাব তাঁহার ভোগায়তন দেহকে পীড়িত করিতে থাকে। সহরের আরও সহস্র প্রকার আকর্ষণ তাঁহাকে পল্লী-মাতার ক্রোড়-চ্যুত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই আজ বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশানে পরিণত হইতেছে।

গ্রামের জমিদার—লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্রগণ যতদিন গ্রামের ডাক বিস্মৃত হইয়া নগরের মোহে আত্মহত্যা-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ততদিন হইতেই বাঙ্গালার পল্লীগুলি সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছে। ইদানীং জমিদার পল্লীর ক্রোড়ে কিছুদিনের জন্যও বাস করিতেছেন, এ দৃশ্য বিরল; পল্লী ভাঙ্গিয়া এখন সহরগুলির আয়-তন বর্দ্ধিত হইতেছে,—দেহের অন্যান্য অংশ শীর্ণ হইয়া মস্তক ক্রমেই পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু সমগ্রদেহ কি সে ভার দীর্ঘকাল বহন করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারিবে? একদিন

কি মস্তকের গুরুভারে এই দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অসমান-দেহ পৃথিবী-বক্ষে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে না ?

শ্যামাচরণ প্রকৃতপক্ষে পল্লী-মাতার সু-সন্তান ছিলেন। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে সহর কলিকাতায় বাস করিলেও গ্রামের স্মৃতি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার গ্রামবাসীরাই তাঁহার নিকটতম আত্মীয়। তাহাদের সহিতই তাঁহার সুখ-দুঃখের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—প্রীতির বন্ধন গ্রামবাসীদিগের সহিত অচ্ছেদ্য-ভাবে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

তিনি বুঝিতেন যে, গ্রামের সম্পদই সহরকে পরিপুষ্ট করে। গ্রামের উন্নতি ঘটিলেই সহরের উন্নতি হইবে—গ্রামকে সজীব, সুস্থ এবং প্রাণপূর্ণ অবস্থায় পরিণত করিতে না পারিলে কখনই মঙ্গল নাই। দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে তাঁহার মনে আধুনিক যুগের মনোবৃত্তি হয়ত তেমনভাবে পরিপুষ্ট হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলন তাঁহার যুগে আরব্ধ হয় নাই, সুতরাং দেশের কথা এ যুগের মানুষের মত চিন্তা করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই; কিন্তু নিজের গ্রামকে তিনি

ভাল বাসিতেন, গ্রামের লোকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল। গ্রামের উন্নতি তাঁহার কাম্য ছিল।

তাই তিনি যে গ্রামে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, যে গ্রামের সংস্রবে আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই গ্রামকে তিনি ভাল বাসিতেন, তাহার প্রত্যেক তরুলতা তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিত, তিনি কোনদিন গ্রামের স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রামের মধ্যে নিজ বাসভবন মনের মত করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিবার বাসনায় গ্রামকে সকল রকমে শ্রীসম্পন্ন করিবার প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। তাই গ্রামের মধ্যে বিদ্যালয়, টোল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় শ্যামাচরণ কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না। আধুনিক যুগের মানুষের সহিত শ্যামাচরণের বিরাট ব্যবধান এই মনোবৃত্তিতে।

গ্রামের প্রতি তাঁহার এই তীব্র আকর্ষণ উত্তর কালে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে পরিপুষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। কৌলিকধারা বা heridityর প্রকৃষ্ট প্রমাণ এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বংশপরম্পরাগত মনোবৃত্তি কখনই বিলুপ্ত হয় না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। শ্যামাচরণের হৃদয়ে যে প্রচণ্ড পল্লীপ্রীতি বিদ্যমান ছিল, তাহা তাঁহার কর্ম্মে ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইলেও সেইখানেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তাঁহার মধ্যমপুত্র হরেন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা অত্যুজ্জ্বল মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেখা যায়, হরেন্দ্রনাথ সহরের কর্ম্ম কোলাহল হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া প্রায়ই পল্লার নিভৃত ক্রোড়ে যাপন করিতে ভালবাসেন। পুত্র-দেহে ও মনে পিতা যে বিকশিত হইয়া উঠেন, ইহা তাহারই একটা অভ্রান্ত প্রমাণ।

গ্রামের ডাকে আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্মী শ্যামাচরণ পল্লীর স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পে জীবনের অবশিষ্ট কালের অনেকটা ব্যয় করিয়াছিলেন। পল্লীবাসীরা যাহাতে জ্ঞানালোচনা করিয়া উন্নত হয়, বিদ্যাশিক্ষা

করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারে, সাধ্যানুসারে শ্যামাচরণ তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামে তাই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিনা বেতনে বহুছাত্র অধ্যয়ন করিয়া জীবন সংগ্রামে সাফল্য লাভের অবকাশ পাইয়াছে; পীড়িত গ্রাম-বাসীরা রোগে ঔষধ ও চিকিৎসা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। ধান্যকুড়িয়া গ্রাম যে অধুনা বাঙ্গালা পল্লী নিচয়ের মধ্যে একটা আদর্শ গ্রাম এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না। কিন্তু শ্যামাচরণ যদি গ্রামেব ডাক শুনিতে না পাইতেন তাঁহার চিত্ত-সরোবরে সহস্রদলে গ্রামলক্ষ্মী যদি বিকশিত হইয়া না উঠিতেন, তাহা হইলে ধান্যকুড়িয়া হয়ত আজ এমন স্বাতন্ত্র্য লাভে ধন্য হইতে পারিত না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃত্ব

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শ্যামাচরণ অত্যন্ত ভ্রাতৃ-বৎসল ছিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথকে তিনি কায়মনোবাক্যে স্নেহ করিতেন। এই ভ্রাতৃবৎসলতা শ্যামাচরণের চরিত্রের একটা বিশিষ্ট প্রকাশ।

যে সকল মানুষ জগতে কোন না কোন বিষয়ে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় প্রগাঢ়তায় উদারতায় সমুদ্র সম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে যুগে শ্যামাচরণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার আত্ম-সর্ব্বস্বতা এ দেশবাসীকে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই।

তখনকার লোক যাত্রা ও কথকতার সাহায্যে অনেক গভীর তত্ত্বের রসাস্বাদ করিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত

করিতে পারিত। পল্লীতে পল্লীতে তখন রামায়ণ গান প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতৃবাৎসল্য, ভরত লক্ষণের অগ্রজপ্রীতির আদর্শ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রগাঢ় রেখাপাত করিত। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নীতি তখনও সকল গৃহস্থ গৃহের সুখ শান্তিকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে পারে নাই।

ভ্রাতার সুখের জন্য সহোদরের আত্মোৎসর্গ তখনও বাঙ্গালী পরিবার হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত তখনও সমাজ-জীবনে একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভের মত বিরাজিত ছিল। সত্য বটে, শ্যামাচরণ মাতুলগৃহের আশ্রয়ে থাকিয়া মাতুলগণের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধান গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তিনি অন্তরমধ্যে প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। সহোদর—একই জননীজঠরে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেমন করিয়া পৃথিবীর স্বার্থময় সংসারে পড়িয়া তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায়, ইহা কল্পনা করিতে গিয়া অনেক সময় তিনি হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন।

শ্যামাচরণের অন্তর ভ্রাতৃপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। কনিষ্ঠ সহোদরকে তিনি বক্ষপঞ্জরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সমগ্র চিত্ত রঘুনাথের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের পর শ্যামাচরণ তাঁহার অন্তর্নিহিত ভ্রাতৃপ্রেমকে সার্থক করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন—সে সুযোগকে তিনি কখনও ব্যর্থ হইতে দেন নাই।

কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার এই অমায়িক, অকিত্রিম ভালবাসা পরিবারস্থ সকলের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জননীর মুখমণ্ডলে প্রীতির আনন্দকিরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, আত্মীয় স্বজনগণ এই অকৃত্রিম সোদরানুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইতেন।

শ্যামাচরণের হৃদয়ের অন্তস্তলে ভ্রাতৃত্বের এই বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, হইয়া যে বিরাট মহীরুহের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ছায়ায় রঘুনাথ পরম শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে এই ভ্রাতৃপ্রেমের প্রস্রবণ শ্যামাচরণের সন্তানগণের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণকে প্রাণাধিক প্রিয়তম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কৈশোর কাল হইতেই ভ্রাতৃগণের প্রতি তাঁহার সযত্ন দৃষ্টি ছিল। ভাই বলিতে এখনও তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। উত্তরাধিকারসূত্রে শ্যামাচরণের নিকট হইতে পুত্রগণ এই ভ্রাতৃপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্যামাচরণ যে ভাবে কনিষ্ঠ সহোদরকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথও ঠিক সেই ভাবেই কনিষ্ঠ যুগলকে স্নেহ করিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর বাতাসে ভ্রাতৃত্বের এই পবিত্র শতদল শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে নাই।

যে যুগে আত্মপ্রাধান্যই মানবকে অবিনয়ী করিয়া তুলে, যে যুগে মানুষ আত্মসুখকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকে, যে যুগে কেহ কাহারও অধিকারের মর্য্যাদা দান করিতে সম্মত নহে—প্রতীচ্য সাম্যবাদের বিষাণ উৎকট রবে যে যুগে দেশে দেশে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্যের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ

করিয়াছে, সেই যুগেই দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার মাটীতে এখনও জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের স্নিগ্ধ ভাব ঘন রসধারা প্রবাহিত হইতেছে—সেই অতি প্রাচীনতম ভাবধারার রস শুকাইয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম মধুর ভাবধারাটি ইদানীং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে—পশ্চিম দিগ্বলয়ে মুখ ফিরাইয়া ভারতবাসী যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাতে দুঃস্বপ্নের ভাগই যে অধিক, ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচয়িতারা তাহা অবশ্যই লিখিয়া যাইবেন, তবে তাহাতে আনন্দের উল্লাসের অপেক্ষা অশ্রুর সজল বিষণ্ণতা এবং আশার আনন্দ বার্ত্তা অপেক্ষা নিরানন্দের দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দনই অধিকমাত্রায় অনুভূত হইবে।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মা

শ্যামাচরণের সমগ্র জীবনে কাহার প্রভাব বেশী, এই কথা আলোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে, জননীর শিক্ষা ও প্রভাব তাঁহার সমগ্র চিত্তক্ষেত্রে ওত-প্রোত ভাবে বিদ্যমান।

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

এই সংস্কৃত শ্লোক—ঋষিমুখ-নিঃসৃত-বাণী শ্যামাচরণ বিদ্যালয়ে হয়ত অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান নাই; কিন্তু উহার মর্ম্মার্থ তিনি জানিতেন।

অনেকের বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না পাইলে কাহারও শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, কিন্তু সে কথা কি যথার্থ? মানব-জীবনের সহিত যাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করিবার অবকাশ যিনি পাইয়াছেন,

তাঁহার কাছে বিশ্বের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার আপনা হইতেই মুক্ত হয়। দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কোনও প্রয়োজন নাই—অসংখ্য প্রমাণ সকল দেশেই বিদ্যমান।

শ্যামাচরণ মাতাকে ভাল বাসিতেন, ভক্তি কবিতেন। সে ভালবাসা ও ভক্তির তুলনা করিতে গেলে বলিতে হইবে—গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজার কথা উল্লেখ করিতে হয়। সকল বিষয়েই তিনি জননীর নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

মাতার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম ভক্তি এবং অখণ্ড অনুরাগ ছিল বলিয়াই শ্যামাচরণ জীবন-সংগ্রামে বরমাল্য লাভে ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। পৃথিবীতে দেখা যায়, যাঁহারা দেশে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন, সকলেই অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন। শ্যামাচরণের হৃদয়ে সেই মাতৃভক্তি সর্ব্বদা গঙ্গোত্রী ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

বাঙ্গালাদেশ মাতৃ-পূজার পবিত্র পীঠস্থান। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কোন্‌দেশ আছে, যেখানে

সন্তান এমন ভাবে মাতার পূজার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে ?

বাঙ্গালী শক্তির আরাধনায় মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ঐশ্বর্য্যের পূজায় জননী ইন্দিরার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছে; বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং জননী ভারতী! প্রজনন ব্যাপারে মাতৃ-মূর্ত্তিকে ষষ্ঠীদেবীরূপে কল্পনা করিয়া সেখানেও সন্তান মাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রোগ-পীড়া, মহামারী—সেখানেও মা, মনসাদেবী, শীতলা মাতা, কত বলিব।

এই যে মাতৃভাবের উপাসনা ইহা পৃথিবীর কোথাও ত নাই! হিন্দু ভারতবর্ষের অন্যত্রও দুর্লভ নহে কি? বাঙ্গালী বুঝিত, সে মায়ের সন্তান। তাই সে এক সময়ে দুর্ব্বার, দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সে ভাব-প্রবণ হৃদয়ে যদি শিক্ষার—জড় জগতের বিচিত্র শিক্ষার সমাবেশ ঘটিত, তবে বর্ত্তমানকালে তাহাকে লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতে হইত না।

এখন বাঙ্গালী সেই মাতৃ-মূর্ত্তির উপাসনা ভুলিতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী তাহার বিশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলি-

য়াছে। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাব আজ বাঙ্গালী-জাতিকে দীনতম করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতেছে। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য।

কিন্তু শ্যামাচরণ খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রতীচ্য শিক্ষার মোহ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই তিনি মাতৃ-মন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। গর্ভধারিণী জননীকে তিনি জগদীশ্বরী বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহার দুঃখ, তাঁহার অশ্রু সজল নেত্র দর্শনে কঠোর জীবন সংগ্রামে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কূল অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন।

মাতৃভক্ত সন্তানের বিজয়মাল্য কে অপহরণ করিতে পারে? শ্যামাচরণ তাই ব্যবসায়ে দিগ্বিজয় করিতে পারিয়াছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে ক্রোড়পতি হওয়ার মূলে কোন্ অবিনশ্বর সত্য নিহিত আছে বাহ্য দৃষ্টিতে বাহিরের লোক তাহা জানিতে পারে না।

কবির ন্যায় তিনিও বলিতে পারিতেন; সমগ্র তীর্থ, সমগ্র দেবদেবী, সমগ্র কাব্যশাস্ত্র মন্থন করিলাম,

কিন্তু তথাপি আমার চিত্ত পূর্ণ হইল না। তাই জননী তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি।

"তবু ভরিল না চিত্ত,
সর্ব্বতীর্থ সার,
তাই মা তোমার পাশে
এসেছি আবার!"

উত্তরাধিকার সূত্রে এই অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি শ্যামাচরণের পুত্রগণের মধ্যেও মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণও মাতৃপূজক।

শ্যামাচরণ জীবনে কখনও মাতৃবাক্য অবহেলা করেন নাই—মাতৃবাক্যে অবহেলা করিবার মত প্রবৃত্তি কখনও তাঁহার অন্তরে সমুদিত হয় নাই। ভগবানকে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ ও মহৎ ব্যক্তিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পিতামাতাকে সাক্ষাৎ ভগবান রূপেই জ্ঞান করিয়াছেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একবার কোন বন্ধু কাশী দর্শনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতাই তাঁহার কাছে বিশ্বেশ্বর, জননী বিশ্বেশ্বরী; সুতরাং কাশী যাইবার প্রয়োজন তাঁহার কাছে নাই। শ্যামাচরণও জননীদেবীকে সেইভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করিতেন।

শ্যামাচরণ নিজে কখনও মাতার সামান্য আদেশও লঙ্ঘন করেন নাই। অপর কেহ লঙ্ঘন করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। মাতৃ-হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বেদনার সঞ্চার যাহাতে না হইতে পারে, এ বিষয়ে শ্যামাচরণের প্রখর দৃষ্টি ছিল। কোনও দিন জননীর মলিন মুখ দেখিলে তিনি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেন—কোন বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভাব দেখিলে শ্যামাচরণ সর্ব্বাগ্রে তাহা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন।

শ্যামাচরণ যখনই কোন নূতন কার্য্য করিতে যাইতেন, মাতার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ না করিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। আধুনিক যুগে হয়ত এ সকল কার্য্য সভ্যতানুমোদিত না হইতে পারে; কিন্তু তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে উচ্চতর

সভ্যতার যে আদর্শ তখন বিরাজিত ছিল, তাহাতে কিতাবতী বিদ্যায় অপারদর্শী শ্যামাচরণ মাতৃ-চরণ-ধূলি বা মাতৃ আদেশলাভকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত অব্যর্থ, অমোঘ এবং পবিত্র বলিয়াই মনে করিতেন। বিংশ শতাব্দীর এই ভাঙ্গনের যুগেও এই মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট শিক্ষিত বাঙ্গালীরও অভাব নাই।

শ্যামাচরণ এমনই মনে করিতেন—তাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাস এমন দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, মাতার আশীর্ব্বাদেই তাঁহার যাবতীয় উন্নতি সংঘটিত হইতেছে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইলে, শ্যামাচরণের সৌভাগ্য-সূর্য্যও অস্তমিত হইবে। এমন কি তিনি প্রায়ই এমন ভাব প্রকাশ করিতেন যে, মাতৃ-হারা হইলে তিনিও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন। জননীই যেন তাঁহার সমস্ত শক্তির উৎস। সেই জননী যদি তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান। তাহা হইলে শ্যামাচরণের কর্ম্মেরও অবসান হইয়া যাইবে।

এইরূপ ভাবের কথা মাঝে মাঝে তিনি প্রকাশও করিতেন। শ্যামাচরণের জীবনে এই প্রভাবের

৩২১

কি ফল হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

জননী কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া সন্তানগণকে পালন করিয়াছিলেন, শ্যামাচরণের মন হইতে সে স্মৃতি মুহূর্তের জন্যও বিলুপ্ত হয় নাই। বাল্য ও কৈশোরের সেই দুঃখময়, দারিদ্র্য-ছায়া-ক্লিষ্ট-দিন গুলির ইতিহাস স্মরণ করিয়া শ্যামাচরণ মাতাকে পরিপূর্ণ ভাবে সুখী করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সংসার খরচের প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যতীতও তিনি জননীকে স্বেচ্ছানুসারে ব্যয় করিবার জন্য টাকা প্রতিমাসে অর্পণ করিতেন।

তাহা ছাড়া যখনই শ্যামাচরণ ধান্যকুড়িয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেন, তখনই স্বতন্ত্রভাবে মাতার হস্তে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতেন। শ্যামাচরণ জানিতেন, তাঁহার জননীর হৃদয় দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ। কাহারও দুঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। মুক্তহস্তে তিনি দান করিতেন। পুত্র তাঁহাকে দান করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিতেন; কিন্তু এই পরমকরুণাময়ী বৃদ্ধা তাহা হয়ত দুই চারিদিনের মধ্যেই

ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এমনও হইতে, কেহ যদি বৃদ্ধার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া গল্প করিত, চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে তিনি পাঁচ বা দশ টাকা দান করিয়া ফেলিতেন। যদি সেই ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইত, তাহা হইলে বৃদ্ধা সেই ব্যক্তির সন্তান-গণের জন্য মিষ্টান্ন কিনিয়া দিবার অজুহাতে উহা দান করিতেন।

শ্যামাচরণ মাতার এই মনোবৃত্তির কথা জানিতেন। এজন্য মাতার এই প্রকার দানের কথা শ্রবণ করিয়া দেহ ও মনে তিনি পুলকিত হইয়া উঠিতেন এবং জননীকে আরও বেশী পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতেন।

জননীর কোন্ খাদ্য প্রিয়, মাতা কোন কার্য্য করিতে ভাল বাসেন, কি কথা তাঁহার কাছে মধুর, কিরূপ ভাবের আচরণ করিলে মাতা পরিতৃপ্ত হন এ সকল বিষয়ে শ্যামাচরণের অখণ্ড দৃষ্টি ছিল। বিপুল, বিশাল কর্ম্ম-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াও তিনি সে বিষয়ে একদিনের জন্যও অমনোযোগী হন নাই। কম্পাসের

দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ

কাঁটা যেমন যন্ত্রের সহস্র প্রকার আবর্ত্তন সত্ত্বেও একই লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ থাকে, অবিশ্রান্ত কর্ম্ম-সংঘাতের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও শ্যামাচরণের মাতৃ-ভক্তচিত্ত জননীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি সাধনের জন্য অনন্যমুখী হইয়া থাকিত।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পল্লী-সংস্কার

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্যামাচরণের অন্তরতম প্রদেশে গ্রামের আহ্বান-বাণী-ধ্বনিত হইত। সহরের নানা বিচিত্র ভোগ, বিলাস ও আরামের প্রলোভন শ্যামাচরণের পল্লীগত-প্রাণকে বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি গ্রামের কল্যাণ-চিন্তা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

জীবন-সংগ্রামে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই পল্লীর সংস্কার-কল্পে তিনি আত্ম-নিয়োগ করিলেন। প্রথমেই তিনি দেখিলেন যে, গ্রামের মধ্যে বসবাস করিতে গেলে, চলাচলের পথকে প্রশস্ত, সুন্দর এবং সর্ব্ব ঋতুর পক্ষে সুখগম্য করা প্রয়োজন।

তাঁহার ব্যবসায়ের অংশীদিগকে তিনি এ বিষয়ে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিলেন। উপেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ নফরচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পল্লী-

সংস্কারে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। তখন পল্লীর সংস্কার আরম্ভ হইল। ধান্যকুড়িয়া গ্রামের প্রধান পথটি তখন অত্যন্ত কদর্য্য অবস্থায় ছিল। শ্যামাচরণ যৌথ কারবারের প্রতিনিধি হিসাবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পথটিকে প্রশস্ত ও ইষ্টক নির্ম্মিত করিয়া গ্রামবাসীদিগের কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন। বর্ষার সময় পথ আর জল ও কর্দ্দমে দুরধিগম্য রহিল না। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। শ্যামাচরণের সুনাম পল্লীর সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া নগরের মধ্যেও তাঁহার যশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল।

গ্রামের পথগুলিকে চলাচলের পক্ষে সুসংস্কৃত করিবার পর, গ্রামবাসিগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য শ্যামাচরণের হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠিল। পল্লীর জলকষ্ট ইদানীং প্রবাদবাক্যের মত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। নিদারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপে পল্লীর জলাশয়গুলি শুষ্ক হইয়া যায়, দীর্ঘকালের সংস্কারের অভাবে সুপেয় পানীয়জল গ্রামবাসীরা পান করিবার অবসর পায় না। পচা ডোবা ও খানার জল অধিকাংশের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া

থাকে। তাহার ফলে হতভাগ্য গ্রামবাসিগণ নানা-প্রকার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। পল্লীর নারীরা কলসী কক্ষে বহু দূর হইতে স্বামী পুত্র প্রভৃতির জন্য পানীয় জল সংগ্রহের চেষ্টায় দীর্ঘ পথ কষ্টে অতিবাহিত করে, ইহা দেখিয়া শ্যামাচরণের মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধানত, ভক্ত হৃদয় ব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি এই সকল কষ্ট দূরীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীরই এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা। পূর্ব্বে গ্রামের জমিদার ও ধনিগণ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। এখন জমীদাররা পল্লীকে পরিত্যাগ করিয়া সহরের বিলাস ভোগে নিমগ্ন। দরিদ্র, অসহায়-পল্লীবাসীরা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কায়ক্লেশে পৈতৃক-মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। যাহাদের কোন উপায় আছে, তাহারা গ্রামের বাস উঠাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। প্রায় শতা-ধিক-বর্ষ হইতে বাঙ্গালার পল্লীর এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া আসিতেছে।

শ্যামাচরণ পল্লী-বাসীর দুঃখ বুঝিতেন। স্বয়ং তিনি পল্লী-বাসীর সহায়-হীনতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামবাসীকে সুপেয় জলদানে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জননী ইন্দিরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন-দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অর্থের অভাব নাই, সুতরাং তিনি গ্রামের মধ্যে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামবাসীর একটা প্রধান অভাব দূরীভূত করিবার আয়োজন করিলেন। উপেন্দ্রনাথও তাঁহার এ সাধু সঙ্কল্পে যোগ দিলেন। তাঁহারও উদার-চিত্ত এই জন-হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামের মধ্যে শ্যামাচরণ ও উপেন্দ্রনাথের চেষ্টায় বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। নফরচন্দ্র ও মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সহকর্ম্মীর প্রচেষ্টায় ধান্যকুড়িয়ার বহির্ভাগে—আশে পাশে গভীর ও প্রশস্ত-দেহ জলাশয় সমূহ খনিত হইল। গ্রামবাসীদিগের মলিন-মুখে প্রসন্নতার হাস্য উদ্ভাসিত হইল—নরনারীরা সানন্দে পানীয় জলের প্রাচুর্য্যে তাঁহাদের জয়গানে

গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। সে অঞ্চলে জলকষ্ট সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া গেল।

শ্যামাচরণ দেখিলেন, জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গ্রামের অধিবাসীরা আর দূষিত জলপানে ব্যাধি-গ্রস্ত হয় না, গ্রামের মধ্যে জলাভাব-জনিত কোনও কষ্ট রহিল না। ক্রমে গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নত হইতে লাগিল। তিনি তখন প্রসন্ন-চিত্তে গ্রামের অন্যান্য বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধির কল্পনা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বিস্তার

শ্যামাচরণ অবস্থাবৈগুণ্যে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পান নাই। এজন্য তাঁহার অন্তরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদিগের নিরক্ষরতায় তাঁহার চিত্তও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। তিনি বুঝিতেন, উত্তমরূপে বিদ্যার্জ্জন করা মানব মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

"বিদ্যাদদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি, ধনাৎধর্ম্ম ততঃ সুখম্॥"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য তিনি বুঝিতেন।

শ্যামাচরণের অন্তরে ইরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ ছিল। সাধু যাঁহার সঙ্কল্প ভগবান তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ধান্যকুড়িয়ার কিয়দ্দূরবর্ত্তী বাদুড়িয়া গ্রামে মিশনারীদিগের একটি উচ্চ

ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের পুত্রগণ এই বিদ্যালয়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিত। কিন্তু ঘটনাক্রমে উক্ত বিদ্যালয় অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের এইরূপে দুর্দ্দশা ঘটায় চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ছাত্রবৃন্দের উচ্চশিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া গ্রামবাসীরা শ্যামাচরণের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার বদান্যতা ও উচ্চান্তঃকরণের কথা তখন দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, শ্যামাচরণ যদি একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে দেশের সন্তানগণ উচ্চশিক্ষালাভে ধন্য হইতে পারে।

শ্যামাচরণ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ একটা সঙ্কল্প করিতেছিলেন। গ্রামবাসিগণের আবেদনে তাঁহার হৃদয় অনুকম্পায় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি কলিকাতা হইতে কারবারের অন্যতম অংশী এবং শ্যালক উপেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিলেন যে, অনতি বিলম্বে একটি ইংরাজী

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর শিক্ষা-দৈন্য মোচন করা হউক, এজন্য সকল প্রকার ব্যয়ভার যৌথকারবার অবশ্যই বহন করিবে উপেন্দ্রনাথ তখন ধান্যকুড়িয়াতেই অবস্থান করিতেন। শ্যামাচরণের আগ্রহ ও উৎসাহ-বাণীতে তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ধান্যকুড়িয়ায় ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্যামাচরণের কল্পনা সার্থক হইল।

ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্যামাচরণ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল স্থাপনা করিবার কল্পনা করিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার কাছে যেমন মূল্যবান বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি সেইরূপ স্বীকার করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, কর্ম্ম-জীবনে ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা যেমন অনিবার্য্য, ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাও তদ্রূপ অমোঘ।

শ্যামাচরণ ইংরাজী ভাষা নিজে জানিতেন না বলিয়া অনেক সময় ব্যবসা-কার্য্যে তাঁহার অসুবিধা হইত। কোন য়ুরোপীয়ের সহিত ব্যবসা-সংক্রান্ত

বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের সময় দ্বিভাষীর সাহায্যে তাঁহাকে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। এজন্য ইংরাজী ভাষার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল ; কিন্তু তিনি প্রায়ই বলিতেন, ইংরাজ জাতির নিকট কাজ শিখিয়া লও, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে উহাদের কাছে যাইবে না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ যাঁহারা তাঁহাদের কাছেই ধর্ম্মের তত্ত্বকথা পাইবে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, শ্যামাচরণ ক্রিয়া কর্ম্মান্বিত, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। মানুষ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া স্বধর্ম্মে অবহিত হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বিপুল আগ্রহ ছিল। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মময় জীবন যাপনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। দেশের মধ্যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের আলোচনা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে, গ্রামবাসীরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া জ্ঞান ভাণ্ডারকে স্ফীত করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি ধান্যকুড়িয়া গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী একজন অধ্যাপকের উপর চতুষ্পাঠীর ভার অর্পণ করিয়া শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ বালক-গণের অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার শ্যামাচরণ যৌথ কারবারের উপর ন্যস্ত করেন। শ্যামাচরণ যত গুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান বা জনহিতকর স্থায়ী মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, প্রশংসা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে অগ্রসর হয়েন নাই। আর যদি প্রশংসা হইয়াও থাকে, তাহা যৌথ কারবারের অংশীরা সমভাবে প্রাপ্ত হইতে পারেন এমন ভাবে কাজ করিতেন।

শ্যামাচরণের প্রতিষ্ঠিত সেই চতুষ্পাঠী আজও ব্রাহ্মণ সন্তানগণের সংস্কৃত অধ্যয়নের পীঠস্থান হইয়া রহিয়াছে। আজিও পি, জি, ডবলু সাউ এণ্ড কোম্পানীর কারবার হইতে পাঠার্থী ছাত্রগণের অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শ্যামাচরণের পুত্রগণ এখনও এই চতুষ্পাঠীর উন্নতির কামনা করিয়া থাকেন, এখনও যৌথ কারবারের অংশীরা এই চতুষ্পাঠী বিদ্যালয় প্রভৃতির উন্নতি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছেন। দেশেবিদেশের অধিবাসীরা এখনও

শ্যামাচরণের নামে গর্ব্ব ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার শিক্ষা-বিস্তারপ্রীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এই চতুষ্পাঠী হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ সন্তান এক্ষণে অধ্যাপক শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া যশোলাভ করিয়াছেন। অনেকে সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা প্রভূত যশঃ ও অর্থের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এখনও কৃতজ্ঞচিত্তে শ্যামাচরণের বিদ্যানুরাগ ও দানশীলতার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত টোল বা চতুষ্পাঠীতে নানাবর্ণের ব্রাহ্মণ সন্তানের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। সকলেই যাহাতে এখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া দেবী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাহার বিধিমত ব্যবস্থা শ্যামাচরণেরই কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে।

টোলের জন্য বাসভবন নির্ম্মিত করিয়া শ্যামাচরণ তাহাতে ছাত্রগণের বসবাসের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রগণ যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ়

অনুরাগী থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্যামাচরণ দেশবাসীকে স্বধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মবিশ্বাসী রূপে গড়িয়া তুলিবার কল্পনা মনের মধ্যে পোষণ করিতেন। সেজন্য এইরূপই ব্যবস্থা। পরে শ্যামাচরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যৌথ কারবারের অন্যতম অংশী মহেন্দ্রনাথ গাইন মহাশয় টোল ভবনকে সুদৃশ্য, মনোরম অট্টালিকায় পরিণত করিয়া শ্যামাচরণের অসমাপ্ত কার্য্যকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধান্যকুড়িয়া ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উপেন্দ্রনাথের সহিত শ্যামাচরণ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইংরাজী বিদ্যালয়-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, উহাকে সুদৃশ্য ও মনোরম করিয়া গড়িয়া তুলিবার কল্পনা শ্যামাচরণের ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার এই সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ পান নাই। পরিশেষে উপেন্দ্রনাথের অসুখের সময় শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয়ের সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,

তখন তিনি বিদ্যালয়টিকে বৃহদায়তন অট্টালিকায় পরিণত করিয়া শ্যামাচরণের কীর্ত্তিকে দৃঢ়মূল করিয়াছেন। বিদ্যালয়টি বৈতনিক করিতে বাধ্য হইলেও শ্যামাচরণ এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে দরিদ্র বিদ্যার্থিগণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবার অবকাশ লাভ করে। যৌথ কারবার হইতে তাহাদের বেতন প্রদত্ত হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই স্থানলাভ করিত। ছাত্রগণ তথায় আহার ও বাসস্থান পাইত। তাহা ছাড়াও যাহাদের বস্ত্র ও পুস্তকের অভাব হইত, শ্যামাচরণ তাহাদিগকে এ সকল দুশ্চিন্তা হইতেও মুক্ত করিয়া দিতেন।

বৎসরে অন্ততঃ পঞ্চাশটি দীনদরিদ্র ছাত্রের যাবতীয় ব্যয়ভার শ্যামাচরণ বহন করিতেন। নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা ত ছিলই। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে সকল দরিদ্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহাদের অনেকেরই ব্যয়ভার শ্যামাচরণকে বহন করিতে হইত। বিদ্যার্থীকে উৎসাহ দিতে

পারিলে শ্যামাচরণ যেন কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। স্কুল অথবা কলেজের পাঠার্থী কোন ছাত্র সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কখনও তাঁহার নিকট হইতে ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে এমন ব্যাপার কখনও সঙ্ঘটিত হয় নাই।

এ যুগে সে বিক্রমাদিত্য নাই, তাই নবরত্নের সমাবেশ কদাচ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্যামাচরণ যেন উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের মনোবৃত্তি লইয়াই ঊনবিংশতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা তাই ২৪পরগণার মধ্যে তাঁহার নামকে অত্যুজ্জ্বল মহিমায় প্রদীপ্ত করিরা রাখিয়াছে।

তাঁহার সন্তানগণও পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেবী ভারতীর সন্তানগণের প্রতি অনুকূল-দৃষ্টি প্রসৃত করিয়া রাখিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্রনাথ বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্যার প্রভাবে মুক্তহস্ত। শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ, পিতার ন্যায়ই পরম বিদ্যোৎসাহী। নারীশিক্ষার দিকেও তাঁহার প্রভূত অনুরাগ। এজন্য জননী

দাক্ষায়ণীর নামে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর পরম অভাব মোচন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। হরেন্দ্রনাথের নীরব উৎসাহ ও দান কত সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎকে সুগঠিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠে হয়ত সে সকল কাহিনীর উল্লেখ কখনও দেখা যাইবে না। কারণ, পিতার ন্যায় ইঁহারা আত্মযশঃ ঘোষণার আদৌ পক্ষপাতী নহেন।

শ্যামাচরণের প্রতিষ্ঠিত টোল এখনও চলিতেছে। এখনও বৎসরে সেজন্য যৌথ কারবার হইতে তিন চারি হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিয়া বেকার সমস্যার যুগে আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

শ্যামাচরণ কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাহা একবার ধান্যকুড়িয়া বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার কলিন্স সাহেবের আগমন উপলক্ষে স্কুলের সম্পাদকের লিখিত বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্পাদক লিখিয়াছিলেন গ্রামবাসী ও

দেশের লোক যদি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহেন, তবে তাহা স্বনামধন্য শ্যামা-চরণেরই প্রাপ্য। এই কথা উল্লেখের সময় সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাদেশিকতা

শ্যামাচরণ মনে প্রাণে স্বদেশ-ভক্ত ছিলেন। দেশের প্রতি অনুরাগ, স্বদেশবাসীদিগের প্রতি গভীর প্রেমকে যদি স্বাদেশিকতা বা স্বদেশানুরাগ বলিয়া অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে শ্যামাচরণকে প্রথম শ্রেণীর এক-নিষ্ঠ স্বদেশভক্ত বলিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না।

শ্যামাচরণ নিজের গ্রামকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসিতেন, গ্রামের প্রতি তাঁহার একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সে আকর্ষ-ণের গভীরতার পরিমাণ করা কঠিন।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা আত্মো-ন্নতি, অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতে যাহাকে সৌভাগ্যলাভ বুঝায়, তাহার অধিকারী হয়েন, তাঁহারা অনেক সময় নিজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অপরের সম্বন্ধে কোন-

প্রকার চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্যামাচরণ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে, ব্যষ্টির উন্নতিতে সমষ্টিগত বা জাতীয় উন্নতি সু-সম্পন্ন হইতে পারে না।

প্রতিবেশীরা যদি দুর্ব্বল থাকে, তাহা হইলে এক জনের বলের দ্বারা কোনও বিশিষ্ট উপকার সংসাধিত হইতে পারে না। সেজন্য তিনি গ্রামবাসিগণের উন্নতির কল্পনা মনের মধ্যে পোষণ করিতেন। সমগ্র গ্রামের অধিবাসীরা যদি শিক্ষায়, দীক্ষায়, ঐশ্বর্য্যে ও কর্ম্মে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে, তাহা হইলে লাভ ছাড়া ক্ষতি আদৌ নাই।

তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়ের কথা তিনি সহকর্ম্মি-গণকে প্রায়ই প্রকাশ করিয়া বলিতেন। মহেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত ছিলেন।

শ্যামাচরণ গ্রামবাসিগণকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার স্ব-শ্রেণীভুক্ত

লোকগণ দরিদ্র। যদিও তাহারা ব্যবসায়ী-শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু নানাপ্রকার অসুবিধা বশতঃ তাহারা অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেছে না। মূলধনের অভাবে ভালভাবে এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত ব্যবসায় কার্য্য পরিচালন করা তাহাদের সাধ্যাতীত।

তিনি অংশীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, অল্পমাত্র সুদে তাহাদিগকে ঋণ-স্বরূপ অর্থ প্রদান করিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ প্রদান করিবেন। তাহা হইলে গ্রামবাসীরা ক্রমে ক্রমে অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে।

যাহারা ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত তাহাদিগকে শ্যামাচরণ আপনাদের বিস্তীর্ণ কারবারে কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের এই সুসঙ্গত কার্য্যে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ মহোৎসাহে সমর্থন করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের এই শুভ প্রচেষ্টার ফলে অধুনা যে সুফল লাভ লইয়াছে, তাহাতে ধান্যকুড়িয়া গ্রামে দারি-

ন্যের চিহ্নমাত্র নাই, একথা বলিলে বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হয় না।

উত্তরকালে শ্যামাচরণের এই অবলম্বিত নীতি তাঁহার সহকর্ম্মিগণ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। সকলেই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি, গ্রামবাসিগণের মঙ্গলকল্পে অনুরূপ-ভাবেই নিযুক্ত আছেন।

শ্যামাচরণ গ্রামবাসিগণের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তৎপর হইয়াই তাঁহার দেশ-প্রীতির পরিচয় সম্পূর্ণ করেন নাই। ধান্যকুড়িয়া গ্রামে বিভিন্ন বিষয়ে যাহারা ব্যবসা করিত, তাহাদের নিকট হইতে যাহাতে সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তিনি সেই দিকেও মনঃসংযোগ করিলেন।

তিনি অনায়াসে কলিকাতা হইতে সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া সংসারের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করিতে পারিতেন। তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু অর্থ হয়ত বাঁচিয়াও যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি ব্যাপারটিকে সে দিক দিয়া দেখেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যাহারা গ্রামের মধ্যে দোকান খুলিয়া জিনিষ পত্র বিক্রয়

করে, তাহারা যদি তাঁহাদের মত বিরাট সংসারের দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার অবকাশ পায়, তবেই তাহারা ব্যবসায় করিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। শ্যামাচরণের কাছে দেশাত্ম-বোধ বা দেশ-প্রীতি এই সকল দিক দিয়াই পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

কোন কোন ব্যক্তি শ্যামাচরণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যখন কলিকাতাতেই অবস্থান করেন, তখন সস্তায় তথা হইতে দ্রব্যাদি না কিনিয়া চড়া দরে গ্রামের দোকানদারদিগের নিকট হইতে সকল প্রকার দ্রব্য কেন ক্রয় করিয়া থাকেন? উত্তরে শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি এখান হইতে না ক্রয় করি, তাহা হইলে গ্রামের ব্যবসায়ীরা কাহার জন্য মাল কিনিয়া রাখিবে? বিশেষতঃ আনীত দ্রব্যাদি যদি বিক্রীতই না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা ঐ সকল দ্রব্যের আমদানি করিবে না। তখন সহসা কোন জিনিষ প্রয়োজন হইলে আর পাওয়া যাইবে না। গ্রামের লোকের যদি কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহারাও উহা না পাইয়া

দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহুকষ্টে উহা সংগৃহীত করিতে হইবে। সেজন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা নিরর্থক। বিশেষতঃ অন্য স্থানের ব্যবসায়ীকে সেই দ্রব্যের জন্য যে অর্থ দিতে হইবে, তাহাতে গ্রামের কোন লাভ নাই বরং লোকসান। সুতরাং দাম বেশী দিলেও তাহা আমারই গ্রামের লোক পাইবে—তাহা না করিব কেন?”

আজ যদি সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এইরূপভাবে এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে পারিত, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশ আজ বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের দ্বারা অধ্যুষিত হইতে পারিত না। আজ কবির প্রার্থিত সোনার বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া দেখিলে গভীর নৈরাশ্যে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে না?

বাগানের মালী বলিতে এখন উৎকল দেশের দিকে মুখ ফিরাইতে হয়—বাঙ্গালী মালী সারা বাঙ্গালায় নাই। মুচির কার্য্য বিহারীরা আসিয়া হস্তগত করিয়াছে, পরামাণিকের দলও তাহাদের কাছে ক্রমেই হঠিয়া যাইতেছে। বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু বাঙ্গালী মুটিয়ার দল, বিহার ও উৎকল-বাসীর অভিযানে অন্তর্হিতপ্রায়।

মিঠাইয়ের দোকান, মুদির দোকান, শিখ, মারোয়াড়ী ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা ক্রমেই এক চেটিয়া করিয়া লইতেছে। ফুলুরী, বেগুনী বেচিয়া বাঙ্গালীরা আর বড় একটা উৎকল-বাসীর কাছে জয় লাভের আশা করিতেছে না। বাঙ্গালী-জীবন যুদ্ধে হঠিয়া চলিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী তাহার রক্ষায় অগ্রসর নহে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না হইলে কে রক্ষা করিবে?"

এই অমূল্য কথার মাহাত্ম্য বাঙ্গালী বুঝে না। বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার জন্য যদি বাঙ্গালী প্রাণপণ চেষ্টা না করে, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি অদূর ভবিষ্যতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইতে পারে—অন্ততঃ সে সম্ভাবনা, সে আশঙ্কা যে প্রবল তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই।

শ্যামাচরণ কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার চিত্তে—বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না হইলে কে রক্ষা করিবে, এই বৃত্তি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ছিল।

তাই তিনি স্বজাতিকে, স্বগ্রামবাসীকে সর্ব্বপ্রযত্নে, ধনে, জ্ঞানে, বিদ্যায় সবল করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি যে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার পরিচয় নানাভাবে, নানাকার্য্যে পরিস্ফুট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি স্বগ্রামবাসীর দারিদ্র্য দূরীভূত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর আদর্শ হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। তাঁহার সমসাময়িক একজন বৃদ্ধ দোকানদার এখনও ধান্যকুড়িয়া গ্রামে জীবিত আছে। এই ব্যক্তির নাম রামচন্দ্র। সেই ব্যক্তির নিকট জানিতে পারা যায় যে, শ্যামাচরণ যখনই দেশের বাটীতে আসিতেন, তিনি কখনও কলিকাতা হইতে বস্ত্রাদি কিনিয়া আনিতেন না। রামচন্দ্রই তাঁহাকে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি সরবরাহ করিত।

অন্নদানের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রদানের বিরাট পর্ব্ব শ্যামাচরণকে প্রায়ই সমাধা করিতে হইত। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত স্থলে সকল কথা বিবৃত হইবে। তবে এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, রামচন্দ্রের

দোকান হইতে তিনি প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্ত্র ক্রয় করিতেন। ইহাতে রামচন্দ্র বিক্রয়ের আশায় নানাবিধ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কাজেই গ্রামবাসীরা প্রয়োজনীয় বস্ত্র তাহার দোকান হইতেই প্রাপ্ত হইত। সেজন্য কাহাকেও অন্যত্র যাইতে হইত না। রামচন্দ্রও বস্ত্র ব্যবসায়ে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত। শ্যামাচরণের দৃষ্টান্ত অনুসারে যৌথ কারবারের অন্যান্য অংশীও রামচন্দ্রের দোকান হইতে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন।

গ্রামবাসিগণের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে শ্যামাচরণের আরও নানাপ্রকার কল্পনা ছিল। ধান্যকুড়িয়ার সন্নিহিত বেড়ুলী নামক একটি বিল ছিল। এই বিলটি কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল উক্ত বিলটি ক্রয় করিয়া তিনি গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যাহারা কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত তাহাদিগের মধ্যে বিলি করিয়া দিবেন। তাহা হইলে বিস্তৃত ভাবে কৃষিকার্য্য দ্বারা তাহারা অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

কিন্তু তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ লাভ ঘটে নাই। কারণ কল্পনাকে মূর্ত্তিদান করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অকস্মাৎ তাঁহাকে তিরোহিত হইতে হইয়াছিল। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

তবে তিনি যে, সর্ব্বপ্রযত্নে দেশবাসীদিগের উন্নতির কল্পনা করিতেন—তাহাদিগকে জীবন-সংগ্রামে বস্তু-তান্ত্রিকভাবে সাহায্য করিতেন, এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। এইরূপ প্রেম হইতেই বৃহত্তর বিশ্বপ্রেমের পরিণতি ঘটিয়া থাকে। নিজের গ্রাম, নিজের গ্রামবাসী প্রভৃতিকে যাহারা কায়মনবাক্যে ভালবাসিতে পারে না, তাহারা সমষ্টি হিসাবে জাতিকে বা দেশকেও কখনই ভাল বাসিতে পারে না। তাহাদের কাছে বিশ্ব-প্রেম একটা শব্দ মাত্র। উহার কোন অর্থই নাই। শ্যামাচরণ মনে প্রাণে দেশকে ভাল বাসিতেন, এজন্য তাঁহাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশ-প্রেমিক বলিতে পারা যায়। তাঁহার স্বাদেশিকতার ইহাই পরিচয়।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সামাজিকতা

শ্যামাচরণ খাঁটি বাঙ্গালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামাজিকতা তাঁহার অস্থিমজ্জা-জাত ছিল। মনুষ্যমাত্রেই সামাজিক জীব। সুতরাং সমাজ ধর্ম্মের নিয়মাবলী পালন করিতে সে বাধ্য। যে ব্যক্তি সমাজে বাস করিয়া সমাজধর্ম্ম পালন করে না, হয় সে মুক্ত পুরুষ, না হয়ত সে সমাজের কলঙ্ক।

আধুনিক যুগে উদ্‌ভ্রান্তমতি, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় গঠিত এক শ্রেণীর জীব বাঙ্গালা দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, যাহাদিগকে "না ঘরকা, না ঘাটকা" বলিয়া অভিহিত করিলে বিন্দুমাত্র সত্যের অপলাপ করা হয় না। ইহারা আপনাদিগকে সংস্কারধর্ম্মী বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহারা সংস্কারের অর্থ বুঝে না। সংস্কার বা সংশোধন করিতে গেলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। আপনার ধর্ম্মশাস্ত্র,

সমাজতত্ত্ব, হিন্দুর জীবনযাত্রার পদ্ধতির সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে সকল বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা না সংগ্রহ করিয়া যাহারা সমাজের সংহার করিতে চাহে তাহারা কালাপাহাড়ের মনোবৃত্তিকেও লজ্জা দেয়।

শ্যামাচরণ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও হিন্দুধর্ম্মের, আচার ব্যবহার রীতি নীতি তথাকথিত সংস্কারকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তখন বাঙ্গালী 'সাহেব' সাজিতে পারিলে চরিতার্থ হইয়া যাইত। বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লেখা ত দূরের কথা, মাতৃভাষায় আলাপ পরিচয় পর্য্যন্ত বহু ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে বীভৎস বলিয়া অনুভূত হইত। তখন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী আপন ধর্ম্মে বিশ্বাসী ত ছিলেনই না, পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল তাহাও বলা যায় না। অর্থাৎ ধর্ম্মের একটা অভিমান লইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ কোন কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিত্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্মকে চিরদিনই অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। নানা বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মকে চূর্ণ করিবার জন্য আবহমানকাল হইতে বহু কালাপাহাড় শ্রেণীর সংহারক আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমষ্টিভাবে কখনও তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে নাই। তাই সমাজ ধর্ম্ম এখনও অব্যাহত আছে, এবং হয়ত দীর্ঘকাল থাকিবে।

শ্যামাচরণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। এজন্য সামাজিক আচার নিয়ম প্রভৃতির দিকে তাঁহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি ছিল। সামাজিক জীবনে যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা সামাজিক ভদ্রলোকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, শ্যামাচরণ তাহা কায়মনোবাক্যে পালন করিতেন। সামা-জিক শিষ্টাচার-জ্ঞান তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

মানুষ অনেক সময় ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা-গৌরবে অন্ধ হইয়া পড়ে। তখন সামাজিক শিষ্টতা জ্ঞান অথবা স্বাভাবিক মানবধর্ম্ম প্রকাশের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অনেক মানুষ দম্ভে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যেশ্বর হইয়াও শ্যামাচরণের ধীর মস্তিষ্ক ও

বলিষ্ঠ হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি বুঝিতেন, যাহা কিছু আহরণযোগ্য মানুষ তাহাই উপার্জ্জন করে। মানুষ মনুষ্যত্বের পর্য্যায় হইতে নামিয়া গেলে তাহার কিছুই রহিল না। এইজন্য যাহাকে মনুষ্যত্ব বলিয়া অভিহিত করা যায়, তিনি সেই গুণ অর্জ্জনে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

যে ব্যক্তি সামাজিক হইবে, তাহার পক্ষে সহসা রাগ দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগণের প্রাধান্যে আত্মবিস্মৃত হওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। শ্যামাচরণ তাহা চর্চ্চা করিয়া আয়ত্ত করেন নাই। স্বভাবতঃই তিনি রিপু-গণের অধীন ছিলেন না। সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সদানন্দ ভাব তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।

যতই কঠোর এবং শ্রমসাধ্য কর্ম্মে তিনি লিপ্ত থাকুন না কেন, কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কখনও তাঁহার মুখে অপ্রসন্নতা দেখা যাইত না। একদিনের জন্য তাঁহার আননে কেহ অসন্তোষের ভ্রূকুটী দেখে নাই। তাঁহার মধুর সৌজন্য শত্রুমিত্র স্বভাবাপন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মুগ্ধ করিত।

দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ

পৃথিবীতে যাঁহারা নানা ভাবে মহৎ কার্য্য করিয়া জগতে স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, তাঁহারা বাক্য বা ব্যবহারে অপরের নিরানন্দের হেতুভূত হন নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, নিজের গভীরতম দুঃখ বা পারিবারিক শোকের কারণ সত্ত্বেও, তাঁহারা সামাজিকতা অর্থাৎ অভ্যাগত বা অতিথির প্রতি ব্যবহারে, ঘূণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন না। নিজের দুঃখ বা কষ্ট বা ক্ষোভের ম্লান ছায়া যাহাতে অপরের আনন্দকে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে, সামাজিক শিষ্টাচারের তাহা একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিয়া থাকেন।

শ্যামাচরণ এইরূপ প্রকৃতির মহাজনদিগের জীবন চরিত সম্বন্ধে কিরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে এইপ্রকার উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক শিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যাইত।

বিনয়-নম্র ব্যবহার সামাজিক শিষ্টাচারের অঙ্গীভূত। শ্যামাচরণ যে আজন্ম বিনয়ী সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। অভিমান প্রকাশ করা, অথবা অর্থ গৌরবের জন্য দম্ভের পরিচয় দেওয়া যে, সামাজিক মানবের পক্ষে গুরু অপরাধ, শ্যামাচরণের ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ পাইত। তাঁহার ব্যবহারে কেহ কখনও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এমন ঘটনার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না।

শ্যামাচরণের সমসাময়িক অধিক ব্যক্তি এখন জীবিত নাই। দুই চারিজন যাঁহারা এখনও বিদ্যমান, তাঁহারা একবাক্যে শ্যামাচরণের বিনয়-নম্র মধুর ব্যবহারের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ধান্যকুড়িয়ার সন্নিহিত শীকড়া গ্রাম নিবাসী কায়স্থ জমীদার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ শ্যামাচরণের পরিচিত ছিলেন। এই ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার নিকট হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে তাঁহার সহিত শ্যামাচরণের বিশেষ বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিরুদ্ধ স্বার্থ বা বিরুদ্ধ মতের ফলে অনেকের মধ্যে

গুরু মনান্তরের উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু শ্যামাচরণ এই প্রকৃতির লোক ছিলেন না।

প্রবোধ বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, ঘোর বিবাদ সত্ত্বেও শ্যামাচরণ কোনও দিন তাঁহার সহিত অশিষ্ট বা অসামাজিক ব্যবহার করেন নাই। উভয় তরফের মধ্যে অসংখ্য মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হইয়াছিল; আইনের সাহায্যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য আদালতে যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পরস্পর যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, শ্যামাচরণ ভ্রমেও সুজন-সুলভ ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেন নাই।

প্রবোধ বাবু মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, যখনই কোন কার্য্য উপলক্ষে শ্যামাচরণের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি কায়মনোবাক্যে হিন্দু, বাঙ্গালী গৃহীর কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়াছেন। সে অবস্থা দেখিয়া বাহিরের লোক কল্পনাই করিতে পারিত না যে, উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বৈষয়িক বিবাদ চলিতেছে। সম্ভবতঃ প্রাচ্য ভাবধারার সংস্রবে পরিপুষ্ট হওয়ার

ফলেই শ্যামাচরণের চরিত্রে হিন্দুর সামাজিক জীবনের মহৎ শিক্ষা বিলুপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই।

সামাজিক শিষ্টাচারের প্রত্যেক ব্যাপার সম্বন্ধে শ্যামাচরণকে প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। মানীর মান রক্ষা করা সামাজিক মানবের অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্ম। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দান করিতেই হইবে। উহা কায়মনোবাক্যে পালন না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়া থাকে।

শ্যামাচরণের কর্ম্ম-বহুল-জীবনে বহু ব্যক্তির সংস্রবে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাঁহার যোগ্য সম্মান অর্পণ করিতেন। কাহারও যাহাতে কোনপ্রকারে সম্ভ্রমহানি ঘটে, ইহা তিনি ভ্রমেও ঘটিতে দিতেন না। এ সম্বন্ধে একাধিক ঘটনার কথা জানা গিয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কলিকাতার কোনও সম্ভ্রান্ত বংশের, অভিজাত সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকের একলক্ষ টাকা ঋণ করিবার প্রয়ো-

জন ঘটে। ভদ্রলোক স্বয়ং শ্যামাচরণের নিকট ঋণ প্রার্থনা করেন। যে কারণেই হউক, ভদ্রলোকের সহিত শ্যামাচরণের 'লেনদেন' ব্যাপার সম্পন্ন হইল না। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। শ্যামাচরণের বিশ্বস্ত পরি-চারক গৌর ঘটনাক্রমে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং ভদ্রলোকের আগমনের উদ্দেশ্য তাহার অগোচর ছিল না। শ্যামাচরণ তখনই পরিচারককে কঠোরভাবে আদেশ করিয়াছিলেন যে, ঘুণাক্ষরেও যেন ভদ্রলোকের আগমনের উদ্দেশ্য সে কাহারও নিকট প্রকাশ না করে। কারণ, তাহা হইলে বহুসম্মানভাজন ভদ্রলোকের প্রতিপত্তি জনসাধারণের নিকট ক্ষুণ্ণ হইবে। সে আদেশ যথারীতি পালিত হইয়াছিল।

সকল সময়েই কর্ম্ম-সমুদ্রে নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়াই যে, শ্যামাচরণ সামাজিকতার অন্য অঙ্গ বান্ধবগণসহ সদালাপ, রহস্যালাপ করিতেন না, বা নির্দ্দোষ-ক্রীড়ায় যোগ দিতেন না, এমন নহে। কর্ম্মের অবকাশে সময় করিয়া লইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত কিছুকাল রহস্যা-লাপ বা ক্রীড়া করিতেন। সামাজিকতার এদিকটাও

তিনি রক্ষা করিয়া চলিতেন। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তিনি কোটিপতি শ্যামাচরণ।

বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী, সম্ভ্রান্ত ধনীসন্তান, পদস্থ জমিদার প্রভৃতি ছিলেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও অভাব ছিল না। কিন্তু সকলের সহিতই তিনি অমায়িকভাবে ব্যবহার করিতেন। কাহাকেও তিনি কুণ্ঠিত হইবার অবকাশ দান করিতেন না।

দেশে আসিলে, বহু দরিদ্র ও বাল্য-সঙ্গীর সহিত তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে মিলিত হইতেন, প্রাণখোলা ভাবে আলাপ করিতেন। তিনি যে ইন্দিরার প্রিয়পুত্র একথা ইঙ্গিতে বা আভাসেও বুঝিবার অবকাশ কাহাকেও দিতেন না। সকলেই তাঁহার সহিত স্বচ্ছন্দভাবে মিলিত হইত, আলাপ করিত। বাল্য-সুহৃদগণের সহিত তিনি এমন সরলভাবে মিলিতেন যে, কাহারও মনে কুণ্ঠার উদয় হইত না। তাঁহার কলিকাতাস্থিত বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও ধনী-সন্তান

ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে পানদোষ বিদ্যমান ছিল। সে যুগে ইহা ভদ্রতার অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। অন্ততঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অনেকেই ইহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতেন না।

এইরূপ প্রকৃতির অনেকগুলি বন্ধুর সহিত দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলেও শ্যামাচরণ কখনও তাঁহাদের দোষগুলির প্রভাবে পতিত হন নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে শ্যামাচরণকে প্ররোচিত করিতে কখনও সাহস পান নাই।

সামাজিক শিষ্টাচারের জ্ঞান শ্যামাচরণের মধ্যে এমনই পরিপুষ্ট হইয়াছিল যে, বন্ধুবর্গের দোষগুলি দেখিয়াও তিনি তাঁহাদের দোষগুলির প্রভাব হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেন। অবশ্য বন্ধুবর্গকে প্রয়োজনকালে তিনি সৎপরামর্শ দিতে কখনও ইতস্ততঃ করিতেন না। তবে এমনভাবে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন, যাহাতে কাহারও আত্ম-সম্মানে আঘাত না লাগে, অথবা কেহ অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন।

দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ

এ যুগে সামাজিকতা প্রায় অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। শ্যামাচরণের ন্যায় সামাজিক শিষ্টাচারসম্পন্ন লোক বর্ত্তমান যুগে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে হিন্দুর বিশিষ্টতা ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালাদেশে সামাজিকতা, এবং সামাজিক-শিষ্টাচার একটা মহৎ গুণের মধ্যে পরিগণিত ছিল। শ্যামাচরণ কায়মনো-বাক্যে তাহা প্রতিপালিত করিতেন—উহা বাহ্য প্রকাশ নহে, তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্বার উহা অভিব্যক্তি মাত্র। নিরক্ষর শ্যামাচরণে যাহা পূর্ণমাত্রায় দেখা যাইত, অধুনা শিক্ষিত সমাজের বহু শিক্ষাভিমানীর কাছে তাহার আংশিক প্রকাশও দেখা যায় না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যনিষ্ঠা

"সত্যেনার্ক প্রতপতি, সত্যেনাপ্যায়তে শশী।
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতং সত্যে লোক প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

শ্যামাচরণ সম্ভবতঃ অমর কবির এই সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন নাই; কিন্তু সত্যধর্ম্মের উপর তাঁহার গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্বয়ং সত্যের উপাসক ছিলেন এবং সত্যধর্ম্ম পালনকে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, মিথ্যা আচরণ করেন নাই। বাক্য দ্বারা অসত্য আচরণই যে শুধু মিথ্যার পর্য্যায়ভুক্ত তাহা নহে; আকার ইঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলাও মহৎ পাপ। শ্যামাচরণ মিথ্যার সংস্রবে কখনও আসিতেন না, কাহাকেও আসিতে দিতে

চাহিতেন না। সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি সকলের নিকট হইতে শ্রদ্ধার অঞ্জলি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এমন বহু ঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে, যদ্দ্বারা তাঁহার অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার কোনও পাটের কলে শ্যামাচরণ বহু পরিমাণ পাট বিক্রয় করেন। পাট বিক্রয়ের পর সেই কলের লোকগণ দেখিতে পাইল যে, পাটগুলি সিক্ত। ওজনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পাটে জল মিশ্রিত করা হইয়াছে।

শ্যামাচরণ এ বিষয়ে কোন সংবাদই জানিতেন না। জানিলে কখনই এমন ব্যাপার তিনি ঘটিতে দিতেন না। সম্ভবতঃ তাঁহার কোনও কর্ম্মচারী, কলের কোনও উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী সহিত একযোগে এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবে। উভয়ের তাহাতে কিছু মোটা লাভ হইবার কথা ছিল।

যাহা হউক, কথাটা সেই কলের মালিক শ্বেতাঙ্গ-প্রভুর কর্ণ-গোচর হইল। তিনি অবিলম্বে শ্যামাচরণকে

সংবাদ দিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, শ্বেতাঙ্গ-মালিক ঈষৎ বিরক্তিভরে সেই কথাটা শ্যামাচরণের কাছে প্রকাশ করিলেন।

শ্যামাচরণ তখন কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং ব্যাপারটির সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যই পাট জল মিশ্রিত হইয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়াই কলের মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্য কথাই প্রকাশ করিলেন। এই ব্যাপার যে, তাঁহার কর্ম্মচারীর দোষেই ঘটিয়াছে এবং কলের মালিকের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও যে, তাহাতে সংস্পৃষ্ট আছে, তাহাও প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। শ্বেতাঙ্গ মালিক শ্যামাচরণের সত্যনিষ্ঠা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, পাট ক্রীত হইল। শ্যামাচরণের উপর তাঁহার শ্রদ্ধাও সমধিক বর্দ্ধিত হইল। পরিশেষে শ্যামাচরণ এই কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অধর্ম্মাচরণের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

সত্যনিষ্ঠার এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে।

শ্যামাচরণ স্বয়ং যেমন সত্যের উপাসক ছিলেন, অন্যের নিকট হইতেও সত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত পাইবার প্রত্যাশা করিতেন। সত্য-বাক্য অপ্রিয় হইলেও তিনি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। অবশ্য "সত্যম্ ব্রূয়াৎ, প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" এই নীতি অতি চমৎকার; কিন্তু শ্যামাচরণ এমনই সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, অন্যের নিকট হইতে কঠোর অপ্রিয় সত্য শুনিয়াও তিনি বিচলিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রীতিলাভ করিতেন। সত্যবাদী—স্পষ্টভাষীকে তিনি সমাদর করিতেন। একটা ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ধান্যকুড়িয়ার প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর একদিন শ্যামাচরণ প্রভাতে অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন সেই অঞ্চলের 'দলো' পাগল নামক একজন মুসলমান ভিখারী সেইদিকে আসিতেছে।

এই মুসলমান ভিখারী যেমন সরল-চিত্ত তেমনই স্পষ্টভাষী ছিল। গ্রামবাসীরা তাহাকে পাগল বলিত

বটে, কিন্তু উন্মত্ততার কোন উৎকট লক্ষণ তাহার ব্যবহারে কখনও প্রকাশ পাইত না। সকলের কাছেই সে ভিক্ষাপ্রার্থী হইত বটে; কিন্তু ভিক্ষা পাইলেও তাহার ব্যবহারে যেমন কোন বিশেষ আনন্দের অভি-ব্যক্তি প্রকাশ পাইত না, না পাইলেও তাহার দুঃখ হইত না। তাহার ব্যবহারে আর একটা বিশেষত্ব দেখা যাইত—সে ভিক্ষালব্ধ পদার্থ হইতে আপনার প্রয়োজনমত দ্রব্য রাখিয়া বাকি দ্রব্য সে বিলাইয়া দিত। এমনও দেখা যাইত, তাহাকে কেহ নূতন বস্ত্র দিলে, সে তাহাও বিলাইয়া দিত। নিজের লজ্জা নিবারণের পরিধেয় থাকিলে সে নূতন বস্ত্রের মায়ায় মুগ্ধ হইত না।

তাহার এইরূপ প্রকৃতির কথা সে অঞ্চলের সকল লোকই অবগত ছিল। এজন্য সকলেই এই মুসলমান ভিখারীকে ভাল বাসিত, স্নেহ করিত। সর্ব্বত্রই তাহার অবারিত দ্বার ছিল। স্ত্রীলোক মাত্রকেই সে মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিত। তাহার ব্যবহারে কোন-রূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইত না।

শ্যামাচরণ 'দলো' পাগলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ভিখারী তাঁহার কাছে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। শ্যামাচরণ তাহাকে চিনিতেন। সেও তাঁহাকে জানিত। শ্যামাচরণ তাহাকে রহস্যভরে বলিলেন, "দলো, দেখ দেখি কেমন বাড়ী হয়েছে।"

শোভন অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দলো বলিল, "বাড়ীত ভালই হয়েছে বটে; কিন্তু যদি মর্‌তে না হ'ত!"

ঐশ্বর্য্যশালী আধুনিক কোন বাঙ্গালী হয়ত দলোর এই স্পষ্ট উক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। কিন্তু শ্যামাচরণের নিকট সত্যকথার দাম ছিল। তিনি তাহাকে আদর করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। এক জোড়া নূতন বস্ত্র, একটি মুদ্রা এবং তৎসহ নিত্য ভিক্ষার দ্রব্য দলো প্রাপ্ত হইল। শ্যামাচরণ পাগলের কথাটা বাড়ীর সকলকে না জানাইয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সেদিন যতগুলি লোকের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল, প্রত্যেককেই তিনি সাগ্রহে দলোর কথাটা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

অতিরিক্ত সত্যনিষ্ঠা হেতু অনেক সময় শ্যামাচরণকে বাহ্যতঃ কঠোর ব্যবহার করিতে হইত। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারীর কার্য্যে বা ব্যবহারে সত্যনিষ্ঠার অভাব দেখিলে তাহাকে তিনি কঠোরভাবে তিরস্কার করিতেন। সংশোধনের উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এইরূপ কঠোর হইতে হইত; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিদত্ত করুণ হৃদয় তাহাতে ব্যথিত হইত। কারণ বিশ্বস্তসূত্রে এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, কাহারও ব্যবহারে মিথ্যার পরিচয় পাইয়া তিনি প্রকাশ্যে তাহাকে রূঢ় ভাবে তিরস্কার করিলেও, পরে তাহাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া মধুরভাবে তাহার দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দিতেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুবাৎসল্য

শ্যামাচরণের হৃদয় যেমন কোমল তেমনই গভীর ও উদার ছিল। হিংসা-দ্বেষ তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না। তিনি সকলকে ভালবাসিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন।

পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা স্বতঃই অপরকে ভাল বাসিয়া তৃপ্তিলাভ করেন এবং তাঁহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ মধুর ব্যবহারে বহু-ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনুক্ষণ তাঁহাদের সহিত মিলামিশা করিতে ভালবাসেন।

শ্যামাচরণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাদের সংস্রবে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল, তাঁহা-দের মধ্যে অনেকেই শ্যামাচরণের অকৃত্রিম সারল্য,

সত্যনিষ্ঠা, উদারতা ও হৃদয়ের গভীরতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার সহিত বান্ধবতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেই যে, চরিত্রবান, ধর্ম্মজ্ঞ এবং সাধু স্বভাব ছিলেন, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু শ্যামাচরণ নির্ব্বিচারে তাঁহাদের সহিত অবসরকালে মিলিত হইতেন। তবে তাঁহাদের কাহারও চরিত্র ও ব্যবহারে যেগুলি ত্রুটি ছিল, তাহার প্রভাবে কখনও আত্ম-সমর্পণ করেন নাই।

ধান্যকুড়িয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের নানাসম্প্রদায়ের নানা অবস্থার লোকের সহিতও শ্যামাচরণের ঐকান্তিক প্রীতির বন্ধন ছিল। সন্নিহিত কোনও গ্রামের কায়স্থবংশীয় কোনও ভদ্রলোকের সহিত শ্যামাচরণের বিশেষ বান্ধবতা জন্মে। এই ভদ্রলোক পুলিশে উচ্চপদে কাজ করিতেন। পুলিশের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা বশতঃ তাঁহাতে মদ্যপানদোষ বিদ্যমান ছিল। সে

যুগের অনেক পুলিশ কর্ম্মচারী সঙ্গদোষে পানাসক্ত হইয়া পড়িতেন। উক্ত ভদ্রলোকের চরিত্রে নানা সৎ-গুণের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি পানাসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

মাদক দ্রব্যের এমন প্রভাব যে, মানুষ কদাচিৎ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া চলিতে পারেন। উক্ত ভদ্রলোকও সুরাদেবীর প্রভাবে এমনইভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন যে, তিনি অবসর পাইলেই বোতলবাহিনীর শরণাপন্ন হইতেন; কলিকাতা পুলিশেই তাঁহার কাজ ছিল। অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল; কিন্তু চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক থাকে, তাঁহার অতিরিক্ত পান-দোষই তাঁহার উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল।

ঐ দোষের জন্যই অবশেষে তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হয়। শ্যামাচরণ এই বন্ধুটিকে ভালবাসি-তেন। অনেক সময় দলবল সহ তিনি শ্যামাচরণের গৃহে অবসর-যাপন করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিতেন। বন্ধুবৎসল শ্যামাচরণ সমাদরে তাঁহাদিগকে

অভ্যর্থনা করিয়া আতিথ্য সংকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার পানদোষ অথবা ভদ্র-সন্তানের বিরোধী অপকর্ম্মের প্রতি বিরাগ সত্ত্বেও শ্যামাচরণ বন্ধুবর্গের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের প্রতি গৃহ-স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিতেন, সেজন্য কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই। বন্ধুবর্গের কু-কার্য্যের প্রভাবও তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতেও পারে নাই।

উল্লিখিত অন্তরঙ্গ বন্ধু যখন কর্ম্মচ্যুত হইয়া ঘোরতর দুর্দ্দশায় পতিত হন, তখন শ্যামাচরণ প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। বন্ধুর দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও শ্যামাচরণ যতদিন বাঁচিয়াছিলেন উল্লিখিত বন্ধুকে নানারূপে সাহায্য করিতেন, কখনও তাঁহাকে কোনও বিষয়ে কষ্ট বা দুঃখ পাইবার অবকাশ দেন নাই। তাঁহার সংসারের যাবতীয় খরচের ব্যয়ভার শ্যামাচরণ স্বয়ং বহন করিতেন।

ধান্যকুড়িয়ার সন্নিহিত আড়বেলিয়া গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকের সহিত শ্যামাচরণের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। শ্যামাচরণ ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ব্রাহ্মণও তাঁহার হিতকামী বন্ধু ছিলেন। উল্লিখিত ব্রাহ্মণ পীড়িত হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সংবাদ জানিবামাত্র শ্যামাচরণ সহস্র কাজ সত্ত্বেও প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মণ-বন্ধুকে দেখিতে যাইতেন। হাঁসপাতালের আহার্য্য রোগীর পক্ষে প্রীতি-কর নহে জানিয়া, প্রত্যহই তাঁহার জন্য শ্যামাচরণ নানা-প্রকার ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং লইয়া যাইতেন। বন্ধুর আরোগ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্যামাচরণ এক-দিনও তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই।

এই প্রকার বন্ধুবাৎসল্যের অসংখ্য বিবরণ প্রদত্ত হইতে পারে। শ্যামাচরণ একবার যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহার সহস্রদোষ সত্ত্বেও কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন না। তবে পরস্বাপহারী, পরদারাভিবমর্ষণকারী, মিথ্যাবাদী বা জুয়াচোর প্রকৃতির

লোকের সংস্রবে তিনি কখনও থাকিতেন না। তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গ বান্ধবতা কখনও শ্যামাচরণের প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে। এরূপ কোনও ব্যক্তি শ্যামাচরণের বন্ধু শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আশ্রিত-বাৎসল্য

আশ্রিতকে রক্ষা করা সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রের হিত-বাণী। বিশেষতঃ হিন্দুর পুরাণ, সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থে আশ্রিতকে নিজের দেহ বা জীবন দিয়াও রক্ষা করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্যামাচরণ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এবং পণ্ডিতগণের সংস্রবে সদাসর্ব্বদা আসিবার ফলে আশ্রিত-বাৎসল্যের পরম তত্ত্বটুকু অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আশ্রিতকে রক্ষা করা তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

তাঁহার বিস্তৃত-কারবার এবং ক্রীত জমিদারীর মধ্যে বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। তিনি তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার ত করিতেনই, পরন্তু তাহাদিগকে সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতেন। তাঁহার উদার হস্ত অনুক্ষণই সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগের প্রতি প্রস্তৃত থাকিত।

তাঁহার আশ্রিত প্রত্যেক কর্ম্মচারীই শ্যামাচরণকে দয়ার্দ্রচেতা, আশ্রিত-প্রতিপালক প্রভুরূপে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তাহাদের মনে বিশ্বাস ছিল, বিপৎ-কালে শ্যামাচরণ তাহাদিকে বক্ষোপুটে আশ্রয় দান করিতে কৃপণতা করিতেন না। পদে পদে তাহারা তাঁহার এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাইত বলিয়াই এই বিশ্বাস তাহাদিগের মনে দৃঢ়-মূল হইয়াই গিয়াছিল। তবে তাহারা একথাও জানিত যে, চরিত্রহীন ব্যক্তি বিশেষতঃ যাহার চৌর্য্য-স্বভাব আছে, সে কখনও শ্যামাচরণের নিকট কোনপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিতে পারে না।

শ্যামাচরণ যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন, তাঁহার কোনও কর্ম্মচারী চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অন্য সহস্র গুণ থাকিলেও তাহাকে ক্ষমা করিতেন না; অবিলম্বে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইত, ইহজীবনে তিনি কখনই তাহার মুখাব-লোকন করিতেন না।

কিন্তু যাহাদের মধ্যে কোন দোষ থাকিত না, শ্যামাচরণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহা-

দিগের ক্রমোন্নতির সহায় হইতেন। এমন কি কর্ম্ম-প্রবণতা বা দক্ষতা প্রদর্শন করিতে না পারিলেও বহু চরিত্রবান কর্ম্মচারী তাঁহার প্রিয়পাত্র স্বরূপ অবস্থান করিত। শ্যামাচরণ তাহাদের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার আশ্রিত কোন ব্যক্তিকেই তিনি পরিত্যাগ করিতেন না। তাহাদের প্রয়োজনকে শ্যামাচরণ নিজের প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের কোনও বিপদ ঘটিলে, সে বিপদকে তিনি নিজের বিপদ মনে করিয়া তাহার প্রতীকারে যত্নবান হইতেন।

শ্যামাচরণ প্রায়ই বলিতেন, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সকল প্রকার মনোবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য পরি-চালনা করা চলে; কিন্তু যে ব্যক্তি চোর, যে পরস্বাপ-হরণে লোলুপ সেরূপ ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপীয় জাতি ব্যবসায়ে যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, উহারা চুরি করে না, অর্থাৎ প্রভুর সর্ব্ব-নাশ করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তুলে না। হাজার

হাজার মাইল দূরে, সাগর পারে ধনী মহাজনরা অবস্থান করিয়া কর্ম্মচারীর সাহায্যে বিদেশে ব্যবসায় কার্য্য দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেছে। কর্ম্মচারীরা চোর হইলে কখনই তাহা সম্ভবপর হইত না।

এই সম্পর্কে শ্যামাচরণ প্রায়ই বলিতেন, য়ুরোপীয়-জাতি যেরূপ কর্ম্মপরায়ণ, তাহাতে কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-শৈথিল্য প্রকাশ পাইতে পারে না। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করিয়াও, তাঁহারা এমনভাবে ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যাবলীর উপর দৃষ্টি রাখেন যে, চুরী করিবার অবকাশ কেহই প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বা ধনীদিগের প্রকৃতি সেরূপ নহে। তাঁহারা অত্যন্ত আলস্য-পরায়ণ। কর্ম্মচারীদিগের উপর ভার দিয়াই পরম নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতে থাকেন; তাহাদের কার্য্যফল বা কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোনপ্রকার দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না।

শ্যামাচরণ বলিতেন যে, বিশ্বাস—কর্ম্মচারীর উপর আস্থা স্থাপন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহার কার্য্য-পদ্ধতি কি ভাবে চলিতেছে সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে মনিবের উদাসীনতার অবকাশে কর্ম্মচারীরাও অসাধু উপায় অবলম্বন করিবার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়। সুতরাং মালিকের দোষেই অনেক ক্ষেত্রে কর্ম্মচারী চুরি করিয়া থাকে। তাহা না হইলে—অর্থাৎ যদি মালিক কর্ম্মচারীর প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই সে ব্যক্তি চুরি করার অবকাশ পায় না।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ অলসতা নিবন্ধন কর্ম্মচারীর কার্য্যাবলীর উপর দৃষ্টি রাখেন না বলিয়াই ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারেন না। শ্যামাচরণ ইহা উত্তমরূপে বুঝিতেন। তাই তিনি আশ্রিত-পালক, করুণাময় প্রভু হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্মচারীদিগের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। সামান্য দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সকলেরই উপর তাঁহার দৃষ্টি ছিল। এই কারণে তাঁহার সময়ে কারবার বা জমিদারীতে কোনও কর্ম্মচারী চুরি করিবার অবকাশ পাইত না। হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না।

তিনি আশ্রিত কর্ম্মচারীদিগকে বিশ্বস্ততা এবং কর্ম্মকুশলতা প্রকাশ করিতে দেখিলে কি ভাবে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন, কেমন ভাবে তাহাদিগের সুখদুঃখের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, তাহার পরিচয় দুই চারি জন কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। তাহার একটি বিবরণ এস্থলে বিবৃত হইল।

গোবিন্দচন্দ্র বসু নামক জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক শ্যামাচরণের জমিদারী বিভাগে কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এই ভদ্রলোক যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, তেমনই ধর্ম্মভীরু ছিলেন। শ্যামাচরণ এজন্য এই ভদ্রলোককে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন। যাহাতে ভদ্রলোকের উন্নতি হয়, স্বচ্ছন্দভাবে তিনি জীবন যাপন করিতে পারেন, সেদিকে শ্যামাচরণের উদার দৃষ্টি সর্ব্বদা প্রসৃত ছিল।

একদা গৃহে অগ্নি লাগিয়া এই ভদ্রলোকের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যায়—তিনি সপরিবারে আশ্রয়চ্যুত হয়েন। ভদ্রলোকের পর্ণকুটীর ছিল। সে যুগে অবস্থাপন্ন

বণিকগণ ব্যতীত ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণের ক্ষমতা সাধারণ লোকের ছিল না। টিনের ঘরও সকলে নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা পাইতেন না। বিশেষতঃ পল্লী-অঞ্চলে তখন টিনের ঘরেরও তেমন প্রচলন হয় নাই।

গৃহচ্যুত হইয়া গোবিন্দ বাবু নৈরাশ্য-সাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহার তখন এমন অবস্থা ছিল না যে, পরিবার প্রতিপালনের পর পুনরায় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন। তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শ্যামাচরণের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। সাধারণ মনিবের ন্যায় শ্যামাচরণ কর্ম্মচারীদিগের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন, তাঁহাদের সংসারিক সকল প্রকার অবস্থার সন্ধান রাখা শ্যামাচরণ আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং গোবিন্দবাবুর সর্ব্বনাশের সংবাদ অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

এ সংবাদ শ্রবণে শ্যামাচরণ নীরবে রহিলেন না। তিনি সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই গোবিন্দ বাবুকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। সকল সংবাদ অবগত হইয়া তিনি গোবিন্দ বাবুকে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণের জন্য উপদেশ দিলেন। গোবিন্দ বাবুর আর্থিক অবস্থার সংবাদ তাঁহার জানা ছিল। তিনি কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন যে, ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা সমস্তই তিনি প্রদান করিবেন। সেজন্য যেন গোবিন্দ বাবুকে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে না হয়।

স্বল্পবিত্ত কর্ম্মচারী মনিবের এই সহৃদয় উদার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিলেন। যেখানে মনিবের সহিত কাজ ও বেতনের সম্বন্ধ, সেরূপ ক্ষেত্রে উপযাচক হইয়া মনিব দরিদ্র কর্ম্মচারীর গৃহ নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয়ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে উদ্যত, সেযুগেও এরূপ দৃশ্য বিরল হইয়া আসিয়াছিল।

গোবিন্দ বাবু গৃহারম্ভ করিলেন। উহার সমগ্র ব্যয়ভার শ্যামাচরণ বহন করিয়াছিলেন। আশ্রিত-বাৎসল্যের এইরূপ পরিচয় মাত্র একটি নহে, এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। গোবিন্দ বাবু এখন ইহজগতে

নাই, শ্যামাচরণও লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু শ্যামাচরণের অর্থে নির্ম্মিত এই ইষ্টকালয় এখনও বিদ্যমান, গোবিন্দবাবুর উত্তরাধিকারিগণ এখনও সেই গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আশ্রিত বাৎসল্যের মূর্ত্তপ্রতীক ইষ্টকালয় এখনও শ্যামাচরণের কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে।

শ্যামাচরণের এই আশ্রিত-বাৎসল্য গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার সন্তানগণ এই বিংশ শতাব্দীর ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিকতা পূর্ণ যুগেও পিতৃ-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শ্যামাচরণ যেমন বহু ব্যক্তিকে আশ্রয়-দানে চরিতার্থ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথও সেই ধর্ম্মে অবিচলিত আছেন। তাঁহারাও গুণশালী আশ্রিত-গণকে পরম আদরে সমভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। পুত্রগণের হৃদয়ে এই সৎপ্রবৃত্তির সমাবেশ দেখিয়া লোকান্তর হইতে শ্যামাচরণের আত্মা নিশ্চয়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।

এখনও যে সকল ব্যক্তি আশ্রিত-প্রতিপালকের দেহাবসানের পরও ইহলোকে বিদ্যমান আছেন,

তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে এই মহৎহৃদয় ধনকুবেরের আশ্রিত-বাৎসল্যের পরিচয় দিতে গিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়েন—তাঁহাদের নয়নে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিজনিত আবেগের অশ্রু ছলছল করিয়া উঠে, কণ্ঠস্বর বাষ্পভারে রুদ্ধ-প্রায় হয়।

স্বজন-সমাজে শ্যামাচরণ বিরাট মহীরূহ-স্বরূপ ছিলেন। সকলে সেই ছায়াশীতল বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য ও পরিতৃপ্ত হইত। কাহাকেও তিনি আশ্রয়দানে কখনও বঞ্চিত করেন নাই।

আত্মীয়-স্বজনগণের অনেকেই তাঁহার দুঃসময়ে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহেন নাই, তাহা তিনি উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে যখন তিনি জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন উপযাচক হইয়া অনেকেই তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে শ্যামাচরণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাতে কেহ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র অপরাধী করিতে পারিত না।

কিন্তু শ্যামাচরণের হৃদয়ে সেরূপ ইতর মনোবৃত্তির স্থান ছিল না। তিনি তাঁহার বিরাট শাখা বিস্তৃত করিয়া সকলকেই আশ্রয় দিয়াছিলেন, কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। এরূপ আশ্রয়প্রাপ্ত নরনারীর সংখ্যা গণনা করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে এ কথা ঠিক, তিনি একবার যাহাকে আশ্রয় দিতেন, তাহাকে সহসা পরিত্যাগ করিতেন না।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অতিথিপরায়ণতা

হিন্দুজাতি অতিথিপরায়ণ। অতিথি সৎকার হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের একটা প্রধান নির্দ্দেশ। অতিথি যদি গৃহদ্বার হইতে বিমুখ হইয়া যায়, তবে তাহার মত মহাপাতক আর নাই। হিন্দু ধন, মান, প্রাণ—সর্ব্বস্ব দিয়াও অতিথির সেবা করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। হিন্দুর এই বিরাট, মধুর পবিত্র মনোবৃত্তি আবহমান কাল হইতে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থ প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগতের সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ক্ষুৎপিপাসা-কাতর জীবকে অন্ন ও জলদানে তৃপ্ত করিতে পারিলে হিন্দু আপনার জীবনকে সার্থক মনে করিত। তাই এদেশে কখনও হোটেল—প্রতীচ্যের অনুকরণে ভোজনা-লয় নির্ম্মিত হয় নাই। পল্লীর শ্যাম প্রাঙ্গণে কোনও পথচারী উপস্থিত হইলে, যে কোনও গৃহস্থ তাহাকে

পরম সমাদরে অন্ন-জল প্রদান করিত, শুধু কর্ত্তব্য-বোধ নহে, উহা ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। যাঁহারা ধনী, জমীদার, তাঁহারা গ্রামে বা নগরে অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অন্নদানের ব্যবস্থা করিতেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদীপ্ত আলোকশিখায় অধুনা হিন্দুর—বাঙ্গালীর সে সকল প্রতিষ্ঠান দগ্ধীভূত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, এখনও বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্র হইতে এই অতিথিসেবার মধুর প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও বাঙ্গলার পল্লীপ্রাঙ্গণে হোটেল বা ভোজনাগার প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায় নাই, এখনও বহু বাঙ্গালী অতিথি অভ্যাগতের সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতে চাহে না। তবে বোধহয় এ মনোবৃত্তি—প্রাচ্যের এই বিশিষ্ট ব্যবস্থা আর বেশীদিন অব্যাহত থাকিবে না। যে ভাবে বাঙ্গালী জাতি পরপ্রভাবে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছে, হয়ত বা তাহার ফলে বাঙ্গালা তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে।

শ্যামাচরণ বাঙ্গালার বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে তখন বাঙ্গালী গৃহস্থের আতিথ্যব্রতের নিদর্শন সমুজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং অতিথিপরায়ণতার প্রতি তাঁহার প্রকৃষ্ট অনুরাগ বাল্যকাল হইতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

অতিথি অভ্যাগতকে তিনি ইষ্টদেবের মত মনে করিয়া মিষ্টবচনে অভিনন্দিত করিতেন, পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া স্বয়ং অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। মানুষকে পরিপাটীরূপে ভোজন করাইতে পারিলে তিনি যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতেন, তেমন আনন্দ অন্য কোন বিষয়ে অনুভব করিতেন না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, আহূত অনাহূত, অভ্যাগত যে কেহ তাঁহার গৃহে সমাগত হইতেন, সকলকেই আহার্য্য-দানে তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি যেন কৃতার্থ হইয়া যাইতেন।

যদি কোন কারণে কেহ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে সুযোগ লাভ না করিতেন, তাহা হইলে

শ্যামাচরণ যেন একটা অতৃপ্তি অনুভব করিতেন। অতিথিসেবার পরম রমণীয় ও হৃদ্য তত্ত্বটি যেন তিনি মনে প্রাণে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ স্বয়ং যাহা ভোজন করিতেন, অতিথি, অভ্যাগতকেও ঠিক সেইপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ত প্রদান করিতেনই, অধিকন্তু তাঁহার আশ্রিতগণের সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রতিগৃহে সে যুগে প্রায়ই দৃষ্ট হইত। বাঙ্গালী যখন প্রতীচ্যের সভ্যতালোকে, জড়বাদীর আত্ম-সর্ব্বস্বতার মোহে বিমূঢ় হয় নাই, তখন ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী, বাঙ্গালী, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ প্রতীয়মান করিবার শিক্ষায় দীক্ষিত হইত। আহার্য্য বিষয়ে ইতর বিশেষের শিক্ষা তখন কাহারও মজ্জাগত হইবার অবকাশ লাভ করে নাই। গৃহের কর্ত্তা নিজে উপাদেয় দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া আশ্রিত বা অভ্যাগতকে যেন তেন প্রকারেণ চারিটি আহার্য্য দিয়া কর্ত্তব্য পালনের শিক্ষা লাভ করে নাই।

তাই শ্যামাচরণের গৃহেও সে ব্যবস্থা ছিল না। সকলকে সমানভাবে মর্য্যাদা দানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি

আহার্য্যাদি বিষয়েও সেইরূপ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। অতিথি অভ্যাগতের আহারাদি তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেও ভাল বাসিতেন। তিনি যতদিন ইহলোকে জীবিত ছিলেন, তাঁহার গৃহ ততকাল যেন সর্ব্বদাই উৎসবমুখর থাকিত।

এমন দেখা গিয়াছে যে, কোনও ভদ্রলোকের জন্য জলযোগের ব্যবস্থায়, পরিচারক যদি ভ্রমক্রমে কখনও সামান্য পরিমাণ আহার্য্য আনিয়া দিত, তাহাহইলে শ্যামাচরণ তাহার উপর বিশেষ রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইতেন। মানুষ পরিতোষরূপে যাহা আহার করিতে পারে, তদুপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য না দেওয়া তাঁহার নিকট অমার্জ্জনীয় অপরাধ এবং গৃহস্থের অনুপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহার এইরূপ শিক্ষার ফলে বাড়ীর ভৃত্যগণও আতিথ্যসৎকার সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিত।

তিনি প্রায়ই বলিতেন, মানুষ অনেক সময় চক্ষুলজ্জাবশতঃ ক্ষুধার্ত্ত থাকিয়াও সামান্য আহার্য্যে সন্তোষ

লাভের অভিনয় করিয়া থাকে। সুতরাং গৃহীকে দেখিতে হইবে যে, পাতে সামান্য কিছু নষ্ট হইলেও পরিবেষণ যেন অপ্রচুর ভাবে না হয়;

এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোনও ভদ্রলোক একবার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া শ্যামাচরণের ধান্যকুড়িয়ার ভবনে গমন করিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরকালে শ্যামাচরণ ভদ্রলোকটিকে তথায় স্নান ও জলযোগের জন্য অনুরোধ করেন। শ্যামাচরণের বিনয় নম্র সাদর আপ্যায়নে ভদ্রলোক জলযোগে উপবেশন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, নানাপ্রকার রসনাতৃপ্তিকর উপাদেয় ভোজ্য পাত্রে সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভদ্রলোক সেই প্রচুর আয়োজন দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহে সন্তানগণ কদাচিৎ এইপ্রকার দ্রব্যাদির রসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এইরূপ খাদ্যের কিয়দংশ যদি তিনি সন্তান গণের জন্য লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহাহইলে সন্তানগণ তৃপ্তি সহকারে আহার করিতে পাইত—

তাঁহার পিতৃহৃদয়ও তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্ত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারিত।

আহারে উপবেশন করিয়া উল্লিখিত প্রকার চিন্তার আতিশয্যে ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে বন্ধুর সহিত শ্যামাচরণের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার পার্শ্বে ভোজনে বসিয়াছিলেন। ভদ্রলোক বন্ধুর কাণে কাণে মনের গোপন দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

শ্যামাচরণ দূরে দাঁড়াইয়া অতিথিসৎকার দেখিতেছিলেন। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, ইন্দিরার দুলাল শ্যামাচরণ ভদ্রলোকের মনের কথা যেন পাঠ করিয়া ফেলিলেন। তিনি তখনই অতিথির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আরও প্রচুর দ্রব্য আনাইয়া ভোজনের জন্য সাগ্রহে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গৃহীর সেই বিনীত অনুনয় বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া অভ্যাগত পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন।

তারপর আচমনান্তে ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া যখন তিনি গৃহে ফিরিবার জন্য বাহিরে আসিলেন, তখন

তিনি দেখিতে পাইলেন, জনৈক পরিচালক একটি বৃহৎ মৃৎপাত্র সহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভদ্রলোক ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যে সকল খাদ্য তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্র পূর্ণ করিয়া ভৃত্যটি লইয়া আসিয়াছে। শ্যামাচরণ অনুমানে যে তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া ভদ্রলোকের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এখন বেশ স্বচ্ছল। তাঁহার পুত্রগণ এখন প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ভদ্রলোক এখন শ্যামাচরণের সেই ব্যবহার স্মরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার আতিথ্যসৎকার প্রবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

আতিথ্য-সেবা যাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের হৃদয় বিশাল ও গভীর হইয়া উঠে। সকলকে তৃপ্তিদানের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে একটা ব্যাকুলতা সর্ব্বদাই জাগ্রত হইয়া থাকে। যাহা কিছু আপনার কাছে ভাল লাগে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী প্রভৃতি

সকলকেই তাহা বিলাইয়া দিয়া আনন্দ অনুভব করিবার জন্য চিত্ত লালায়িত হয়। এইরূপ প্রবৃত্তির ক্রমবৃদ্ধি বা প্রসারতার ফলেই মানবের মনে বিশ্বপ্রেম উপজাত হইতে পারে। সঙ্কীর্ণ চিত্তে আসক্তির উদ্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রেম জন্মে না। প্রেম বিশাল ও গভীর হৃদয় ব্যতীত কখনই তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না।

শ্যামাচরণের হৃদয়ে এইরূপ বিশালতা ও গভীরতা ছিল। ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া তিনি কোনদিন কারবার করেন নাই। এই জন্য তিনি মুক্তহস্ত হইয়া পরিণামে যত্র জীব তত্র শিবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। যথাস্থানে সে কথা লিখিত হইবে।

অর্থ-সম্পদ লাভে যখন তিনি সমাজে বরণীয় ও গণনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন নানাস্থানে তিনি বহু উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার তরীতরকারী, ফল ফুল উৎপাদিত

হইত। অবশ্য শুধু সখের খাতিরেই তিনি কৃষিক্ষেত্র বা উদ্যান স্থাপন করেন নাই। প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মিলে মনে আনন্দ হইবে, পরিজনগণ তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে এবং মনের সাধে তিনি সকলকে তাহা বিলাইয়া দিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হইত, ব্যবসায়ের দিক দিয়া তদ্দ্বারা তিনি হয়ত কিছু অর্থ লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্যামাচরণের মনে এ বিষয়ে একটা বিরাট আভিজাত্য ছিল। তিনি ব্যবসায়ী সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষেত্রজাত ফসলের দ্বারা অর্থলাভের প্রবৃত্তিকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। উৎপন্ন দ্রব্যাদি তিনি স্বগ্রাম এবং ভিন্ন গ্রাম সমূহের মধ্যে বিতরণ করিতেন। সংসারে যাহা প্রয়োজন হইত, তাহা রাখিয়া আর সবই তিনি প্রতিবেশীদিগকে উপহার দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন।

শ্যামাচরণ যতদিন জীবিত ছিলেন, এই প্রথাই তাঁহার সংসারে বলবৎ ছিল। এখনও তাঁহার পুত্রগণ

সেই প্রথা অব্যাহত রাখিয়াছেন। ক্ষেত্রজাত কোনও তরীতরকারী এখনও পর্য্যন্ত বাজারে বিক্রীত হয় না—এখনও গ্রামবাসিগণ পূর্ব্ববৎ সেই সকল দ্রব্য পাইয়া থাকেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আড়ম্বর বিহীনতা ও জাতীয় পরিচ্ছদ

শ্যামাচরণ বাল্যকাল হইতেই আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাল্যকালে নানাবিধ দুঃখ কষ্টে জীবন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চরিত্র আড়ম্বর-বর্জ্জিত হইয়াছিল। ব্যবহারিক জীবনে বেশ-ভূষা, আলাপ-আলোচনা, কোনও বিষয়েই তাঁহার আড়ম্বর ছিল না। আড়ম্বর ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার ধাতুসহ নহে। এককালে বাঙ্গালার ধুতি-চাদর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ভদ্রতা রক্ষা করিত। বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বুনো রামনাথ প্রভৃতি, আড়ম্বর-বিহীনতা এবং অন্যান্য বিষয়েও বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক সেকথা সত্য; কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রতীচ্য সভ্যতার মোহমুগ্ধ হইবার পূর্ব্বে কখনও আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিল না। বাঙ্গালী-ধনীর

আড়ম্বরের পরিচয় ছিল, অন্নদান, আতিথ্যসৎকার, পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি ক্রিয়া-কর্ম্মে। এখন সে সকল ক্রিয়া বিলুপ্তপ্রায়; আধুনিক শিক্ষিত-বাঙ্গালী বেশ-ভূষার আড়ম্বরে পূর্ব্বপুরুষগণের অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

শ্যামাচরণ যেমন দেহ ও মনে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, বেশ-ভূষায়ও ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। সাধারণ ধুতি চাদর ও পিরহানই ছিল তাঁহার বেশভূষার পরিপাট্য। তিনি বিজাতীয় পরিচ্ছদ কদাপি অঙ্গে ধারণ করিতেন না। তিনি কোট-প্যাণ্ট, টুপী প্রভৃতির মহিমায় কখনও আত্মহারা হন নাই।

অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত-ধারণা আছে যে, ব্যবসায় ক্ষেত্রেও য়ুরোপীয় পরিচ্ছদদ্বারা দেহ সুশোভিত না করিলে, ব্যবসায়কার্য্য ভালরূপে পরিচালিত করা যায় না। তাঁহারা—বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা মনে করেন যে, ধড়া-চূড়ারূপ ময়ুর-পুচ্ছ ধারণ না করিলে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মান-সম্ভ্রমও বৃদ্ধি পায় না। শুধু বেশ-ভূষা নহে, একটু আড়ভাবে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া য়ুরোপীয়ের

অনুকরণে কথা বলিতে না পারিলেও ইজ্জত বৃদ্ধি পায় না। কিছুকাল পূর্ব্বে এই প্রকার মনোবৃত্তি অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যাইত, অধুনা তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলেও, বাঙ্গালী জাতির কিয়দংশ কায়মনোবাক্যে য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা অভি-ভূত হইয়া রহিয়াছে, এ সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই ;

শ্যামাচরণ ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রচুর প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিলেও, একদিনের জন্যও অন্যের অনুকরণে বিদেশীয় পরিচ্ছদে অঙ্গ-ভূষিত করেন নাই। তিনি ঐ ভাবে আত্ম-বঞ্চনা করিবার পক্ষপাতী ত ছিলেনই না, বরং উহাকে আত্ম-সম্মানের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। কোনও ভদ্রসমাজে গমন অথবা য়ুরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে, তিনি ধুতি, পাঞ্জাবী চাদরেই সে কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কাহারও মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতে হইলে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখাইতে হইবে, ইহা মনে করিতেও তাঁহার তেজস্বী হৃদয় কুণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

শ্যামাচরণ মনে করিতেন, তিনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ ধুতি চাদর প্রভৃতি। জাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যদি অন্য জাতির নিকট হেয় হইতে হয়, তবে সহস্রবার তাহা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আপনার জাতীয় পরিচ্ছদে যে গর্ব্ব অনুভব না করে, শ্যামাচরণ তাহাকে কৃপার দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। বড় বড় ইংরাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি অনাড়ম্বর সরল ভাবেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। নিজের জাতীয় প্রথায় তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। আবার যখন কোন প্রয়োজনে উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী অথবা শ্বেতাঙ্গ বণিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখনও সেই অনাড়ম্বর সাধারণ পরিচ্ছদ ও ব্যবহার তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত।

একবার তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত সাক্ষাৎকালে সাড়ম্বরে ব্যবহার করিবার উপদেশ দানেও তিনি কৃপণতা করেন নাই। এই বন্ধুটি

৪০১

য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ও আড়ম্বরের অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে গর্ব্বভরে শ্যামাচরণকে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই যান না কেন, তাঁহার অঙ্গে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ থাকিবেই। অমন চমৎকার ইজ্জত-রক্ষক বেশ আর নাই।

শ্যামাচরণ বন্ধুর এই কথায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, আড়ম্বরে কারও মন ভোলান যায় না। তোমরা কি মনে কর, বাঙ্গালী যখন বিজাতীয় পোষাক পরে ইংরাজের কাছে যায়, তখন তাদের কাছে বাঙ্গালীর সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়? কখনই নয়। বরং এজন্য বিদেশীর কাছে বাঙ্গালী জাতি অতি ছোট হয়ে যায়। বিদেশীরা মনে করে, এদের নিজের কোন পোষাক নেই। আর নিজের দেশ বা জাতির প্রতি শ্রদ্ধাও নেই।"

তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালীর অনাড়ম্বর জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়, তখন তাহাকে চমৎকার দেখায়। বিদেশী পরিচ্ছদের আড়ম্বরে তাহাকে যেন কুৎসিতই দেখায়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যাহারা অনাড়ম্বর বেশ-ভূষা—জাতীয় পরিচ্ছদ অঙ্গে

ধারণ করে, ইংরাজ মনে মনে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। ইংরাজ স্বদেশ-প্রেমিক, সুতরাং যাহার মধ্যে দেশাত্ম-বোধ স্বজাতির আচার ব্যবহার, বেশ-ভূষার প্রতি যাহার অকৃত্রিম অনুরাগ আছে, ইংরাজ তাহাকে মনে মনে নিশ্চয়ই প্রশংসা করিয়া থাকে।

এজন্য তিনি অনাড়ম্বর বেশভূষার ভক্ত ছিলেন, জাতীয় পরিচ্ছদের উপাসক ছিলেন। ইংরাজ কখনও নিদারুণ গরমের দিনেও তাহার জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ পরিধান করে না। তাহারা তাহাতে আত্মসম্মান বা জাতীয়তা বোধ ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া মনে করে। বাঙ্গালী নিজের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জাতির কাছে নিজের দৈন্য প্রকাশ করে, এই চিন্তা অনেক সময় তাঁহার মনে বেদনার সঞ্চার করিত।

বেশভূষায় শ্যামাচরণ যেমন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, ব্যবহারেও তেমনই আড়ম্বরবিহীন, সরলতার আধার ছিলেন। ওজনকরা হাস্য, ওজনকরা ভদ্রতা, ওজনকরা শিষ্টাচার যেমন অকৃত্রিম, তেমনই বাহ্য-চমকপ্রদ।

এ সকল বিষয়ে শ্যামাচরণের কোন শিক্ষাই ছিল না। সহজ, সরল বাঙ্গালী জীবনের আদর্শ তাঁহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইত।

রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত শ্যামাচরণের বিশিষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি শ্যামাচরণের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার অনেক কথা জানিতেন। তাঁহার নিকট হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, শ্যামাচরণ সকল প্রকার আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। ব্যবসায় কার্য্য উপলক্ষে নানাস্থানে যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া শ্যামাচরণ এক ঘোড়ার 'কম্পাস' গাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। তখন মোটরগাড়ীর যুগ নহে। যাঁহারা ধনী, বিলাসী, তাঁহারা সে যুগে ভাল ভাল জুড়ি, ল্যাণ্ডো, ফিটন প্রভৃতি সুদৃশ্য গাড়ীতে সংযোজিত করিয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বের পরিচয় দিলেন।

শ্যামাচরণ তখন কলিকাতার ধনী-সমাজে সমাদৃত, বহুলক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু এক ঘোড়ার কম্পাস গাড়ী তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের, বিলাসিতার

পরিচায়ক। কোনও বন্ধু শ্যামাচরণকে একদিন প্রশ্ন করিলেন যে, এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তিনি কেন একজোড়া ভাল ঘোড়া ও ভাল গাড়ী ক্রয় করেন না? উত্তরে শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার জুড়িগাড়ী করিবার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে সত্য; কিন্তু তাহাতে আড়ম্বর প্রকাশ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ব্যবসায় কার্য্যের জন্য এক ঘোড়ার কম্পাস গাড়ীর দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, জুড়ি চড়িয়া গেলেও তাহাই হইবে, শুধু বাহিরের জাঁকজমকের যা পার্থক্য। জুড়ি চড়িয়া গেলেও লোক তাঁহাকে পাট ব্যবসায়ী শ্যামাচরণ ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। সুতরাং অর্থ ব্যয় করিয়া যখন লাভ কিছুই হইবে না, সে জন্য ব্যস্ত হইবার সার্থকতা কোথায়?

শ্যামাচরণ অন্যের ন্যায় আপনাকে প্রচার করিতে ভাল বাসিতেন না। উহাতে আড়ম্বর যথেষ্ট হয়; কিন্তু লাভ কিছু হয় না। আপনার জয়ডঙ্কা আপনি বাজাইলে গগন পবন মুখরিত হয় সত্য; কিন্তু সে ঢক্কানিনাদের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া তিনি মনে

করিতেন না। এই মনোবৃত্তির ফলেই তিনি কখনও আপনার আলোকচিত্র গ্রহণের অবকাশ দেন নাই। তাঁহার কোন তৈলচিত্রও কোন শিল্পীর বর্ণরাগে অঙ্কিত হয় নাই। আজকাল যাহার সংসারে কোনও পরিচয় দিবার মত গুণ নাই, তাহারও নানারকমের আলোক-চিত্র, তৈল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা উত্তরকালে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মূর্ত্তিকে দেশ-বাসীর সম্মুখে ধারণ করিবার মত একখানি সামান্য ফটোগ্রাফও কেহ তুলে নাই।

কেহ যদি এ বিষয়ে প্রস্তাব করিত, তিনি হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি, বিশিষ্টতা ও অপূর্ব্ব দানের পরিচয় পাইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে উপাধি প্রদানের জন্য ইচ্ছুক হইয়া-ছিলেন, কিন্তু শ্যামাচরণ সেদিক দিয়া মাড়ান নাই। তিনি এইরূপ উপাধির কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতেন না। একটা রায় বাহাদুর পদবী লাভ করা তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন ছিল না;

কিন্তু তিনি বুঝিতেন উহাতে আড়ম্বরই প্রকাশ পাইবে, লাভ কিছু নাই।

বাঙ্গালার কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদন গাহিয়া গিয়াছেন—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

শ্যামাচরণের আলোকচিত্র অথবা তৈলচিত্র নাই, উহা হয়ত দেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ; কিন্তু মানুষ শ্যামাচরণকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এই সরল, অনাড়ম্বর, খাঁটি বাঙ্গালী দাতার নাম পশ্চিম-বঙ্গের বহু অনাথ আতুর চিরদিন গান করিয়া ধন্য হইবে। শ্যামাচরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ পাইয়া লেখক আপনাকে সার্থক বলিয়া মনে করিতেছে। যাঁহারা শ্যামাচরণের কাহিনী অবগত নহেন, তাঁহারাও মনের মন্দিরে এই মানুষটিকে একটা রূপ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পরহিতৈষণা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্যামাচরণ রীতিমত ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও স্বার্থপর ছিলেন না। তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলের মঙ্গল কামনা করিতেন এবং আপনার জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবও যাহাতে ধনৈশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, সে বিষয়েও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

এই মনোবৃত্তির বলেই তিনি যখন নিজের জন্য জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মীয় ও অংশীদিগের জন্যও সেইপ্রকার বহু সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যদি স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে গাইন ও সাউ পরিবারের জন্য সম্পত্তি ক্রয়

করিয়া দিবার চেষ্টা তাঁহার কখনই হইত না। কিন্তু তিনি তেমন প্রকার ইতর মনোবৃত্তি কখনও হৃদয়ে পোষণ করিতেন না।

শুধু আত্মীয় বলিয়া নহে, প্রতিবেশী বা প্রজা সকলের সম্বন্ধেই তাঁহার উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত, সকলের যাহাতে মঙ্গল হয়, সকলের মুখে আনন্দের প্রসন্ন হাসিটি যাহাকে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, ইহাই তিনি কামনা করিতেন এবং সেইভাবে আজীবন কাজও করিয়া গিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যশালী হইবার পর তিনি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়া অগ্রে সন্ধান লইতেন, স্থানীয় লোকের কোন্ কোন্ বিষয় অভাব আছে; যদি সে সকল অভাব অভিযোগের প্রতীকার তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইত তাহা হইলে তিনি প্রাণপণ যত্নে তাহা সম্পন্ন করিতেন। অন্যে কষ্ট পাইতেছে, দুঃখ অনুভব করিতেছে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

প্রথমতঃ শ্যামাচরণ ধান্যকুড়িয়ার সন্নিহিত শ্রীনগর, চাঁদনগর প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম জমীদারী হিসাবে ক্রয়

করেন। সম্পত্তি ক্রীত হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রজা-বর্গকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদের কোন্ বিষয়ে অভাব বিদ্যমান। সেই সময়ে জল কষ্টে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছিল। নিকটে কোন পানীয় জলাশয় না থাকাতে, স্থানীয় নরনারীগণ অতি কষ্টে দিনযাপন করিত। কাহারও এমন অবস্থা ছিলনা যে, জলাশয় খনন করে।

শ্যামাচরণ তাহাদের অভাবের কথা শ্রবণ মাত্রই তাহাদের সুবিধার জন্য এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া আরোহণ অবরোহণের সুবিধার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখনও সেই বৃহৎ জলাশয়ের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী চারি পাঁচখানি গ্রামের নরনারীর জলকষ্ট নিবারিত হইতেছে।

মৃজানগর নামক একটি মৌজা ক্রয় করিবার পর শ্যামাচরণকে উহা অধিকার করিতে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তত্রত্য প্রজাবর্গ প্রথমতঃ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত ছিল না।

শ্যামাচরণ তাহাদের এইপ্রকার অবাধ্যতা দর্শনে চিন্তিত হইলেন। তিনি জানিতেন, অর্থবলে তিনি তাহাদিগকে বাধ্য করিতে পারিবেন, কিন্তু সে অবস্থায় প্রজাগণের অনিষ্ট অধিক হইবে। দরিদ্র প্রজাগণ অর্থ ও শক্তিশালী ভূস্বামীর সহিত বিরোধ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। তিনি তাহা করিতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহার উদার হৃদয় ভবিষ্যতের অবস্থা কল্পনা কয়িয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

যে সকল প্রজার সুখ দুঃখের ভার ঘটনাচক্রে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে মামলা মোকদ্দমা করিয়া ধ্বংসের পথে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তিনি বৃথা শক্তির অপব্যবহার করিতে প্রস্তুত না হইয়া মাতব্বর কয়েকজন প্রজাকে সাদরে আপনার সমীপে আনাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা তাহাদিগকে তিনি সরল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন, যদি তাহারা তাঁহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার বিনা-প্রতিবাদে স্বীকার করে, তাঁহার অনুগামী হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের জন্য চিরস্থায়ী কল্যাণকর কোন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

প্রজাগণ বুঝিল, শ্যামাচরণ যাহা বলিলেন তাহা সুসঙ্গত। তাহারা তখনই শ্যামাচরণের কথামত কার্য্য করিল। তখন শ্যামাচরণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কিসে সন্তুষ্ট হইবে—কোন্ ব্যবস্থা হইলে তাহাদের সকলেরই কল্যাণ হইবে। প্রজারা পরামর্শ করিয়া জানাইল যে, দারুণ জলাভাবে তাহারা কষ্ট পাইতেছে। জনসাধারণের হিতৈষী শ্যামাচরণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদের প্রস্তাবানুসারে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া সে অঞ্চলের জলাভাব দূরীভূত করিলেন।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সর্ব্বসাধারণের উপকার-কল্পে তিনি অনেক স্থানে জলাশয় খনন করাইয়া জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। নিজের প্রজাসাধারণের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করা ত তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেখানে সেরূপ দায়িত্ব নাও থাকিত, সেরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহার পরহিতৈষণাবৃত্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত।

কাহারও দুঃখ-কষ্ট তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন সময়ে শ্যামাচরণের কোনও কর্ম্মচারী

সাধারণের জলকষ্ট দেখিয়া গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে সেই কর্ম্মচারীর সঞ্চিত অর্থের সবই নিঃশেষ হইয়া যায়। সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি উহার ঘাট বাঁধাইয়া দিতে পারেন নাই। একারণ জলগ্রহণেচ্ছু নর-নারীর আরোহণ, অবরোহণে বড় কষ্ট হইত।

ঘটনাক্রমে একদা শ্যামাচরণ সেই গ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী জনসাধারণের হিতার্থ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দেখিয়া শ্যামাচরণ অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, জলপূর্ণ কলসী লইয়া গৃহস্থ-বধূরা অতিকষ্টে তীরে উঠিতেছে। ইহাতে তাঁহার কোমল-হৃদয় ব্যথিত হইল।

তিনি কর্ম্মচারীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, অর্থাভাববশতঃ ঘাট নির্ম্মিত হইতে পারিতেছে না। শীঘ্র যে উহার কোন ব্যবস্থা হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। শ্যামাচরণ তখনই পুষ্করিণীর উভয় পারে দুইটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন

করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অন্যের জমিতে, অন্যের পুণ্য কীর্ত্তির বৃদ্ধির জন্য সংসার-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থব্যয় করিতে চাহে না; কিন্তু শ্যামাচরণ যশের কাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি অপরের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না—বিশেষতঃ নারী-জাতির অশেষ কষ্ট দেখিয়া তিনি উপযাচক হইয়া সেই কষ্ট দূর করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পরোপকার যে মহৎধর্ম্ম, তাহার মত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই, শ্যামাচরণ ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। চির-শত্রুও যখন বিপন্ন হইয়া পড়িত, শ্যামাচরণের পরহিতৈষণাবৃত্তি তখনও প্রবল ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিত। নিজের সুবিধা-অসুবিধা, লাভ-লোকসান, কোন দিকেই তখন তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না।

একবার কোন একজন ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকের সহিত আলিপুরের আদালতে শ্যামাচরণের

মোকদ্দমা বাঁধিয়াছিল। উক্ত ভদ্রলোক পূর্ব্বে বিশেষ ধনী ও বিলাসী ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ক্রমশঃ তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভদ্রলোক মোকদ্দমা উপলক্ষে স্বয়ং আদালতে আসিয়াছিলেন। শ্যামাচরণও ঘটনাক্রমে সেদিন আলিপুরের আদালতে হাজির ছিলেন।

দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র তেজেই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক না, উক্ত ভদ্রলোক সহসা, বিগত-চেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যান। অবশ্য সমাগত অনেক লোকই ভদ্রলোকের আকস্মিক দুর্ঘটনায় দুঃখিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু স্ব স্ব কার্য্যবশতঃ কেহ তেমন যত্ন করিয়া রোগীর চিকিৎসা বা চৈতন্য সম্পাদনে মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না।

কথাটা কেমন করিয়া শ্যামাচরণের কাছে গিয়া পৌঁছিল। সংবাদ জানিবামাত্র শ্যামাচরণ ব্যস্তভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ং চিরশত্রুর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার লইলেন। তখন তাঁহার চিত্তে সমবেদনার ফল্গুপ্রবাহে যেন বর্ষার বন্যা বহিয়া

গেল। ডাক্তার আসিল, রোগীর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা হইতে লাগিল। এদিকে শ্যামাচরণ নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া আদালতে মোকদ্দমার শুনানীর দিন পরিবর্ত্তন করিবার আবেদন করিলেন।

তারপর রোগী শত্রুকে সযত্নে নিজের গাড়ী করিয়া আপনার ভবনে লইয়া আসিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন রাখিয়া যখন রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন শ্যামাচরণ স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সংসার-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ লোক এইরূপ সুযোগের অবকাশে চিরন্তন শত্রুকে হতবল ও পরাজিত করিতে কখনও ইতস্ততঃ করিত না। কিন্তু শ্যামাচরণ সেরূপ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। খাঁটি ভারতীয় উদার প্রকৃতি তাঁহার মনে কার্য্য করিত। এই ঘটনার পর অবশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতার অবসান হইয়া গিয়াছিল।

কাহারও কোন উপকারে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে শ্যামাচরণ কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। এই

মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া সকল সময়েই তাঁহাকে কার্য্যে প্রেরণা দান করিত। এ প্রেরণা কোথা হইতে আসিত? শিক্ষা ত তাঁহার সেভাবে বেশী ছিল না। সহজাত বুদ্ধি হইতেই তিনি এ প্রেরণা পাইতেন। এই পরার্থপরতা বা পরহিতৈষণা বৃত্তিই তাঁহাকে অনেক অসম্ভব ব্যাপারে লিপ্ত করিত। আর শ্যামা-চরণের জয়পতাকা চারিদিকে প্রদীপ্ত গৌরবে তাঁহার কীর্ত্তি-কথা ঘোষণা করিত।

—

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গুণগ্রাহিতা

যে ব্যক্তি স্বয়ং গুণী, সেই অপরের গুণ বুঝিতে পারে—গুণের সমাদর করিতে জানে। মনের উদারতা ও বিশালতা না থাকিলে কখনই মানুষ অপরের গুণ-গ্রহণে সমর্থ হয় না। এমন অনেক লোক সংসারে দেখা যায়, যাহারা বিদ্যা, কুল-শীল, পাণ্ডিত্য, অর্থ সকল বিষয়ে সৌভাগ্যশালী হইলেও গুণীর সমাদর করিতে জানে না। সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ব্যক্তিগণ অপরের গুণ কখনই স্বীকার করিতে চাহে না। মনের এইরূপ অবস্থা যে, অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্যামাচরণের উদার হৃদয় অপরের গুণ দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইয়া পড়িত। গুণী ব্যক্তি তাঁহার নিকট সকল সময়েই সমাদৃত হইতেন। শ্যামাচরণ যত্ন করিয়া গুণবান ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন।

পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত যখন শ্যামাচরণের প্রথম আলাপ হয়, তখন হইতেই তাঁহার গুণরাশির প্রতি শ্যামাচরণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহার, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আজীবন শ্যামাচরণ তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধু হইয়াছিলেন। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয় অদ্যাপি জীবিত আছেন।

শ্যামাচরণ গুণমুগ্ধ হইয়াই নিরস্ত হইতেন না। তাঁহার গুণগ্রাহিতা নানা আকারে প্রকাশ পাইত। গুণী পণ্ডিতকে তিনি বার্ষিক বৃত্তি দিয়া তাঁহার গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বৃত্তি শ্যামাচরণের জীবদ্দশায় পণ্ডিত মহাশয় অযাচিত ভাবেই পাইয়া আসিয়াছেন। শ্যামাচরণের যোগ্য সন্তানগণও এখনও তাহা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

শ্যামাচরণ মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী হইলেও অন্য জাতির গুণ দেখিলে তাহার প্রশংসা করিতেন, এবং সেই গুণ স্বয়ং আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। ইংরাজ জাতি যে সকল গুণে সসাগরা অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছে, তাহার উল্লেখ শ্যামাচরণের মুখে প্রায়ই ব্যক্ত

হইত। ইংরাজের সময়ের মর্য্যাদাজ্ঞান, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, পরিশ্রম-প্রিয়তা শ্যামাচরণ স্বয়ং আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অথচ তিনি কোনদিন ইংরাজের কাছে কোন বিষয়ের প্রার্থী ছিলেন না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, তিনি উচ্চপদবী বা রাজসম্মানের জন্য কখনও লালায়িত হন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন। বহু বড় বড় ব্যবসায়ী ইংরাজ শ্যামাচরণের ন্যায়নিষ্ঠ, মহৎ চরিত্রের কথা অবগত ছিলেন, তাঁহারা শ্যামা-চরণকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনই ভালবাসিতেন।

তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই গুণান্বেষণে ব্যস্ত থাকিত বলিয়াই গুণহীন ব্যক্তির প্রভাব তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। এই কারণে উচ্চপদবী বিশিষ্ট বড়লোক হইলেই শ্যামাচরণ যদি তাঁহার মধ্যে কোন গুণের পরিচয় না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন।

কেহ অনর্থক বাক্‌জাল বিস্তার করিলে শ্যামাচরণ মনে মনে তাঁহার প্রতি অনুকূল ধারণা করিতে

পারিতেন না। যাহারা বেশী কথা বলে, তাহারা যে প্রায়ই বাজে বকে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। কাজের মানুষ কখনও বৃথা বাগাড়ম্বর করে না, ইহা তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ ও অলস ব্যক্তি কোনও দিন তাঁহাব নিকট মর্য্যাদালাভ করে নাই।

সরলতার ভক্ত ছিলেন বলিয়া অনেক ধনী ব্যক্তির ন্যায় কখনও তিনি পারিষদ বেষ্টিত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করেন নাই। বচন-চাতুর্য্যে স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে লোক সমাগমের অভাব ধনী ব্যক্তির কখনও হয় না; কিন্তু শ্যামাচরণ এমন ব্যক্তির সংস্রব হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। বৃথা স্তুতিবন্দনা মানুষকে অপদার্থ করিয়া তুলে শ্যামাচরণ ইহা উত্তমরূপে বুঝিতেন।

তাঁহার কোনও বন্ধু যদি কখনও তাঁহার সম্মুখে তাঁহার কোন কার্য্যের সমালোচনা, অপ্রিয় সত্য কথাও বলিয়া ফেলিতেন, তাহাতে শ্যামাচরণ কখনও ক্ষুণ্ণ হইতেন না! স্পষ্টবাদিতার তিনি প্রশংসা করিতেন।

অনেকের এমন স্বভাব আছে যে, বিরুদ্ধ মত শ্রবণের সহিষ্ণুতা নাই—কেহ অপ্রিয় সত্য কথা কহিলে অমনই মনে মনে বিরক্ত হইয়া অপ্রিয়ভাষী বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদ করিয়া বসেন; কিন্তু শ্যামাচরণের প্রকৃতি তাহা ছিল না। তিনি বরং তাহাতে হৃষ্ট হইতেন। বন্ধুর কর্ত্তব্য বন্ধুর দোষ ত্রুটি সংশোধন করিয়া দেওয়া। তাহা পালন না করিলে কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটে।

তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে যাহার যেটুকু গুণ তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহা তিনি সংগ্রহ বা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই গুণগ্রাহিতা-বৃত্তির জন্য তাঁহার সমগ্র চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সঞ্চয়ের উপকারিতা স্বীকার করিতেন। যাহাদের মধ্যে সঞ্চয়-বুদ্ধির বিকাশ দেখিতেন তাহা-দিগকে তিনি প্রশংসা করিতেন।

শ্যামাচরণ অনেক সময় বলিতেন যে, যে ব্যক্তি ভাল ভাণ্ডারী সে কখনও ভাণ্ডারের সমস্ত দ্রব্য একবারে বাহির করিয়া দেয় না। অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণ অংশ প্রত্যেক দ্রব্য হইতে সংগ্রহ করিয়া

লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দেয়। তাহার ফলে প্রয়োজন কালে কখনও কোন জিনিষের অভাব হয় না।

শ্যামাচরণ যে সকল মানুষের ব্যবহারে এই গুণ দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগের প্রশংসাত করিতেনই, নিজের জীবনেও তাহা সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। অপর্য্যাপ্ত দানও তিনি করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় বুদ্ধিরও ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন, যে সন্ন্যাসী নহে, যে গৃহী, তাহার পক্ষে অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাহার আশ্রিত, অবশ্য-প্রতিপাল্যগণের জন্য ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সঞ্চয় করা প্রয়োজন। তাহা না করিলে সংসারে দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য।

———

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কর্ত্তব্যপরায়ণতা

কর্ত্তব্যপালন মানব মাত্রেরই একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম। কিন্তু কর্ত্তব্য এমন কঠোর যে, অনেক সময় সাধারণ মানুষ তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারে না। কর্ত্তব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করাও সহজসাধ্য নহে। কোন্‌টা করণীয়, তাহা অনেক সময় পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পৃথিবীর সভ্য সমাজের বিচক্ষণ পণ্ডিত, মেধাবী সাহিত্যিক, যশস্বী কবি ও জ্ঞানী দার্শনিক প্রভৃতি কতভাবে কত কথাই না বলিয়া গিয়াছেন! সুপ্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Ode to Duty"—কর্ত্তব্যের বন্দনা গান কি চমৎকার!

শ্যামাচরণ কর্ত্তব্য পরায়ণতাকেও জীবনের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে কর্ত্তব্যবোধের মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ত্তব্যের

একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন বলিয়াই তিনি জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কঠোর কর্ত্তব্যকে তিনি অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছিলেন।

বাহিরের কর্ম্মজীবনে এই কর্ত্তব্য-পরায়ণতা যেমন সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত, গৃহীর জীবন-যাপন কালেও কর্ত্তব্য পালনের সহস্র দৃষ্টান্ত তাঁহার স্মৃতিকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। যে গৃহী হইবে, তাহাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অবশ্যই হইতে হইবে। সাংসারিক জীবন-যাত্রা পালন কালে মানুষকে কর্ত্তব্যের উপাসনা করিতে হয়। সন্তানের কর্ত্তব্য, স্বামীর কর্ত্তব্য, পিতার কর্ত্তব্য, গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য, ভ্রাতার কর্ত্তব্য—এইরূপে কর্ত্তব্যের অনন্তশ্রেণী গৃহীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে এই সকল বিভিন্ন কর্ত্তব্যপালন করিতে না পারিলে মনুষ্য-ধর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যায়।

সামাজিক মানুষ হিসাবে শ্যামাচরণ তাঁহার সকল কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিতেন। কখনও কেহ তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে দেখে নাই। পিতা

অতি শৈশবেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কাজেই শ্যামাচরণ পিতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু পিতৃব্যদিগের প্রতি তিনি যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন।

মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন ব্যাপারে শ্যামাচরণ আদর্শ মানুষ। জননীকে সুখী, তৃপ্ত করিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, বিংশশতাব্দীর মানুষ তাহা সহসা কল্পনা করিতেও পারিবে না। জননী যেন শ্যামাচরণের জীবনের কেন্দ্র-স্বরূপিণী ছিলেন। মাতাকে আবেষ্টন করিয়াই শ্যামাচরণের যাহা কিছু সবই যেন আবর্ত্তিত হইত।

পত্নীর প্রতি স্বামীর যাহা কিছু করণীয় শ্যামাচরণ একদিনের জন্যও তাহাতে উপেক্ষা করেন নাই। হৃদয়বান, প্রেম-পূর্ণ-হৃদয় স্বামী বলিয়া নহে, কর্ত্তব্যপরায়ণ পতি দেবতা বলিয়াও দাক্ষায়ণী শ্যামাচরণের জন্য গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতেন। কর্ত্তব্য-চ্যুতির জন্য কোনদিন দাক্ষায়ণী মনে মনেও শ্যামাচরণকে অভিযুক্ত করিবার অবকাশ পান নাই।

পুত্র-কন্যার প্রতিও শ্যামাচরণের কর্ত্তব্যপালনের স্পৃহা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। অবশ্য সন্তানগণকে তিনি পূর্ণাবস্থায় দেখিয়া যাইবার অবকাশ পান নাই। তাহার অনেক পূর্ব্বেই শ্যামাচরণকে ইহজগৎ হইতে দোকানপাট তুলিয়া লইতে হইয়াছিল; কিন্তু শৈশব-কাল হইতেই সন্তানগণের প্রতি পিতার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ছিল। যাহাতে সন্তানগণ সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত-স্বভাব, বিনয়ী এবং ভদ্র-সন্তান হইয়া উঠিতে পারে এ সকল দিকে শ্যামাচরণের দৃষ্টির অভাব কখনও হয় নাই। সর্ব্বদা বিরাট-ব্যবসায়ের ও জমিদারী রক্ষার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইলেও সন্তানগণের ভব্যতা শিক্ষার প্রতি তিনি কখনও উদাসীন ছিলেন না;

শ্যামাচরণ স্নেহময়-পিতা ছিলেন সত্য; তাঁহার হৃদয়ে সন্তানগণের জন্য অপরিমেয় স্নেহ-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার পিতৃ-স্নেহ অন্ধ ছিল না। সন্তানগণের কার্য্যে, বাক্যে বা ব্যবহারে কোন প্রকার অসঙ্গত আচরণ দেখিলে তিনি কখনই তাহা উপেক্ষা করিয়া পিতৃ-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ

করিতেন না। কখনও কাহাকেও অসঙ্গতভাবে প্রশ্রয় দিতেন না।

পুত্রগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মধুর বন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয়, প্রত্যেকের হৃদয়ে সৌহার্দ্দের অমৃত ধারা যাহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ভাই ভাই এক ঠাঁই—ভেদ নাই, ভেদ নাই, এই মন্ত্র যাহাতে প্রত্যেকের হৃদয়ে অনু-রণিত হইতে থাকে, শ্যামাচরণের সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের ভক্তি ও শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের অসীম স্নেহ যাহাতে অব্যাহত থাকে, কার্য্য ও উপদেশ দ্বারা শ্যামাচরণ তাহা ফুটাইয়া তুলিতে কখনও ভুলিতেন না।

এই বিষয়ে একটি ঘটনার কথা শ্যামাচরণের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গিয়াছে। বালসুলভ চপলতাবশতঃ একদা তিনি জ্যেষ্ঠের আহ্বানে অসম্ভ্রম সূচক উত্তর দান করেন। শ্যামাচরণের শ্রবণ-পথে উহা প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি পুত্রের সে অপরাধ ক্ষমা করেন নাই। তাঁহাকে সংশোধিত করিবার জন্য শ্যামাচরণ এমন অমোঘ উপায় অবলম্বন

করিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে হরেন্দ্রনাথ জীবনে আর কখনও সেরূপ ব্যবহার করেন নাই।

শুধু তাহাই নহে। শৈশবে পিতার নিকট হইতে জ্যেষ্ঠের প্রতি কি ভাবে সম্ভ্রম-সূচক ব্যবহার করিতে হয়, এই সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়া অধুনা প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখার কাছে উন্নীত হইয়াও তাঁহার সে অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই। শৈশবের সেই দিনের ঘটনার কথা মনে করিয়া তিনি পিতার উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্লুত-হৃদয়ে প্রণতি জানাইয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, পিতার কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্যই তাঁহার জীবনে এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল।

কর্ত্তব্য পালনকালে শ্যামাচরণ কোনও দিকে দৃষ্টি-পাত করিতেন না। যাহা করণীয় বলিয়া জ্ঞান বিশ্বাসমতে তাঁহার কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইত, তাহা সু-সিদ্ধ করিবার জন্য কাহারও নিন্দা-স্তুতিতে তিনি কখনও বিচলিত হইতেন না—নীরবে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন।

অনেক সময় কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল; কিন্তু ব্যক্তিগত লাভ-লোক-সানের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না। তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে বাণীকে সত্যস্বরূপ মনে করিতেন, তাহারই আদেশ পালন করা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া আত্মীয় বান্ধবগণের নিকট হইতে তিনি বাধাপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ বা ভ্রূভঙ্গী গ্রাহ্য করেন নাই। যথাস্থানে এ সকল বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে।

ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বরনিষ্ঠা, সত্যাশ্রয়ী না হইলে কেহ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না। শ্যামাচরণ সকল বিষয়েই ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই মনে করিতেন, তাই কর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজ-জীবনে, পারিবারিক ব্যাপারে—সর্ব্বত্রই তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চরিত্রবল

অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত সামর্থ্য অগাধিপাণ্ডিত্য, অসামান্য প্রতিভা প্রভৃতি সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তির চরিত্রবল না থাকে, তাহা হইলে অল্প দিনেই সেই ব্যক্তিকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পথের ধূলিতে লুটাইয়া পড়িতে হয়। যাহার চরিত্রবল নাই, তাহার কিছুই থাকিতে পারে না, সে রিক্তসর্ব্বস্ব, পথের ভিক্ষুকেরও অধম।

শ্যামাচরণের অসাধারণ চরিত্রবল ছিল। জীবনে কখনও তিনি কোন প্রকার পাপকর্ম্ম করেন নাই, কোনরূপ অসঙ্গত আচরণের অনুষ্ঠান করেন নাই। চরিত্র বলিতে গেলে সাধারণে যাহা বুঝে, সে হিসাবেও শ্যামাচরণ অসাধারণ চরিত্রশালী লোক ছিলেন। সকল প্রকার পাপ-কার্য্যকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। যাহাতে মানুষের মন পাপাসক্ত হইতে

পারে এমন কোন কার্য্য ভ্রমেও তিনি করিতেন না। প্রলোভন কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়, কাণের কাছে গুঞ্জন শব্দে কত কথাই না বলিয়া যায়! তাই যে সকল অবস্থায় মানুষ প্রলুব্ধ হয় শ্যামাচরণ সর্ব্বপ্রযত্নে সেরূপ অবস্থাকে পরিহার করিয়া চলিতেন।

পাপ হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিয়া চলিলেও পাপপরায়ণ ব্যক্তির সংস্রব হইতে ত মানুষ একবারে মুক্তি পায় না। কাজেই পাপাচারী অনেক ব্যক্তিই তাঁহার সাহচর্য্যে আসিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু তাঁহার চরিত্রের এমন একটা অপূর্ব্ব শক্তি ছিল যে, এরূপ পাপমনোবৃত্তি-বিশিষ্ট পাপাচারী ব্যক্তি তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া, তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া পাপচিন্তা এবং পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে। এমনও দৃষ্টান্তের কথা জানা গিয়াছে যে, শ্যামাচরণের সহিত মিশিবার পর সেই ব্যক্তি আত্মকৃত অপবিত্র কার্য্যের জন্য অনুশোচনায় অধীর হইয়া পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনার কথা বর্ণিত হইতেছে। ধান্যকুড়িয়া ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উক্ত বিদ্যালয়ের সুনাম যাহাতে চারিদিকে প্রচারিত হয়, কর্ত্তৃপক্ষ সেজন্য বিশেষ অবহিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমশঃ অনুসন্ধান ফলে জানিতে পারিলেন যে, জনৈক শিক্ষকের চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। নিকটবর্ত্তী স্থানের কোনও স্ত্রীলোকের নামের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়া এমন একটি নিন্দা রটিয়াছে যে, শিক্ষকের সে আদর্শ ছাত্রগণের নৈতিক জীবনের পক্ষে কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে।

কিন্তু শিক্ষক হিসাবে এই ভদ্রলোকের অত্যন্ত দক্ষতা ছিল। তাঁহার শিক্ষাদানপ্রণালী চমৎকার এবং উৎকৃষ্ট। ছাত্রগণ এজন্য তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগী ছিল। এরূপ শিক্ষকতা কার্য্যে দক্ষ লোক অন্যত্র দুর্লভ। এরূপ কর্ম্মনিপুণতা সহসা কোন মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং হিতকামিগণ মহা সমস্যায় পড়িলেন। স্ত্রীলোক ঘটিত দুর্নামের জন্য সেই শিক্ষককে বিদ্যালয়ে স্থান দান করাও অসঙ্গত, অথচ তাঁহার মত শিক্ষককে পরিত্যাগ করাও সুপরামর্শ নহে। বিশেষতঃ শ্যামাচরণের অনুমোদন ব্যতীত তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার সাহসও কাহারও ছিল না।

সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এই গুরু সমস্যার সমাধান কল্পে শ্যামাচরণের ধান্যকুড়িয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তিনি আসিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করেন তাহাই হইবে।

শিক্ষকের সম্বন্ধে সকল সংবাদ শ্যামাচরণের কর্ণ-গোচর হইয়াছিল। কিন্তু এই স্থিরপ্রাজ্ঞ, কর্ম্মিপুরুষ সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়াও প্রকাশ্যে কোনপ্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ এই ছিল যে, কোনও কার্য্য তিনি আপনার প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ও জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন না করাইয়া নিরস্ত হইতেন না। কাহারও নিকট হইতে

কোন কথা শ্রবণ করিবামাত্র মতামত প্রকাশ করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে, "সহসা বিদধিত ন ক্রিয়াম্"।

সকল কার্য্যেই তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। কাণে শুনিয়া তিনি কোন কাজ কখনও করিতেন না। কাহারও সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্তুতি বা নিন্দা শুনিলে তিনি কখনও বিচলিত হইতেন না এবং সেই শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসও করিতেন না।

কিছুকাল পরে তিনি কলিকাতা হইতে ধান্য-কুড়িয়ায় গমন করিলেন। তখন সকলেরই মনে হইয়াছিল, এইবার সেই দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকের উপযুক্ত শাস্তি হইবে। কারণ সকলেই জানিত, শ্যামাচরণ চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কখনও ক্ষমা করেন না। বিশেষতঃ ছাত্রবর্গের সকল প্রকার শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদের চরিত্রের কলঙ্কমলিন দুর্ব্বলতা শ্যামাচরণের মত নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।

ধান্যকুড়িয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের দিন শ্যামাচরণ বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আলোচনা কাহারও সহিত করিলেন না। পরদিবস প্রভাতে উঠিয়াই তিনি উল্লিখিত শিক্ষককে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। গ্রামের মধ্যে সংবাদটা তখনই ছড়াইয়া পড়িল।

শ্যামাচরণের নিকট হইতে আহ্বান আসিবামাত্র শিক্ষক মনে করিলেন যে, এইবার ওখান হইতে তাঁহার অন্নজল উঠিল। কারণ; যে দুর্নাম তাঁহার সম্বন্ধে রটিয়াছিল, তাহা অভ্রান্ত, সত্য। উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্যামাচরণ তাঁহার চরিত্রের এই হীন দুর্ব্বলতা কখনও ক্ষমা করিবেন না, ক্ষমা করিতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষক মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া পদত্যাগ পত্র লিখিয়া লইয়া, কম্পিত হৃদয়ে শ্যামাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

শিক্ষক ভাবিয়াছিলেন, শ্যামাচরণ দেখিবামাত্র তীব্র ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন। সকলের সমক্ষে তাঁহাকে কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করিতে হইবে।

কিন্তু তিনি যখন শ্যামাচরণের সমীপে উপনীত হইলেন, বিস্ময়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। কঠোর তিরস্কার বা লাঞ্ছনার পরিবর্ত্তে তিনি শ্যামাচরণের কাছে মধুর আপ্যায়ন লাভ করিলেন।

সযত্নে তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইয়া শ্যামাচরণ বিবিধ প্রকার আলোচনায় তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। সে সকল আলোচনা উচ্চ বিষয় সংক্রান্ত। শিক্ষক দেখিলেন, শ্যামাচরণের আদেশে তাঁহার জন্য নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আনীত হইল। কুণ্ঠিত শিক্ষক সে সকল খাদ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন।

যে দুর্নামের কলঙ্ক কথা সমগ্র গ্রাম আলোচনা করিত, যে কলঙ্ক তাঁহার শিক্ষক জীবনকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, শ্যামাচরণ ভ্রমেও সে বিষয়ে একটা সামান্য ইঙ্গিতমাত্র দিলেন না। এমন একটা গুরু ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, তাহার আভাস মাত্র তাঁহার বাক্য বা ব্যবহার প্রকাশ পাইল না। শিক্ষক এ ব্যাপারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই বিচিত্র চরিত্রের প্রভুকে চিনিবার সাঁমর্থ্য তাঁহার ছিল না। যে কার্য্যের

জন্য লোকসমাজে তাঁহার মুখ দেখান কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, যে অবৈধ কার্য্যের জন্য সকলে তাঁহাকে কঠোরতম দণ্ডদানের জন্য আগ্রহান্বিত, এই ক্ষণজন্মা পুরুষ, নিষ্ঠাবান, কঠোর নীতিপরায়ণ শ্যামাচরণ সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করা দূরে থাকুক তাঁহার প্রতি অযাচিত করুণা ও সম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছেন !

শিক্ষকের সমস্ত অন্তর শ্যামাচরণের ব্যবহারে আলোড়িত হইয়া উঠিল, ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণ কথা প্রসঙ্গে শুধু বলিলেন যে, শিক্ষার অমৃতময় ফলে মানুষ দৃঢ়-চেতা হয়। অকস্মাৎ বুদ্ধি-দোষে যদি মানুষ একবার বিপথে চলিয়া যায়, শিক্ষার প্রভাবে তাহার গতির মোড় সে ফিরাইয়া লইতে পারে। খানায় পড়া মানুষের পক্ষে বিচিত্র নহে ; কিন্তু চেষ্টা দ্বারা আবার কর্দ্দমমলিন দেহকে পবিত্র করা যায়—পঙ্কে পতিত হইলেও তীরে উঠিবার আশা আছে।

প্রায় দুইঘণ্টাব্যাপী আলাপের পর শ্যামাচরণ সম্মান সহকারে শিক্ষককে বিদায় দিলেন। প্রতিক্রিয়া

আরম্ভ হইল। সেই দিন হইতে শিক্ষকের জীবন-গতির ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, সেই দেহে যেন আর একটা নূতন মানুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

তারপর বহুবর্ষ পর্য্যন্ত সেই শিক্ষক ধান্যকুড়িয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নামে গ্রামবাসীদিগের কেহ আর কখনও কোনও কুৎসা রটনা করিবার অবকাশ পায় নাই। শ্যামাচরণের পবিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষটি নূতন মনোবৃত্তির স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ ধারায় যেন অবগাহন করিয়া উঠিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের দৃঢ় চরিত্রবলের সংস্পর্শে বহু নষ্ট চরিত্রের লোক আসিয়াছিল। তাহারা সকলেই তাঁহার প্রভাবে উত্তরকালে চরিত্রবান্ বলিয়া লোক-সমাজে পরিগণিত হইয়াছিল। এখনও সেরূপ দুই একজন লোক জীবিত আছে। তাহারা মুক্তকণ্ঠে শ্যামাচরণের চরিত্রবলের প্রভাবের কথা স্বীকার করিয়া থাকে।

এইরূপ শুনা গিয়াছে যে, শ্যামাচরণের নয়ন যুগলে এমন একটা সম্মোহন প্রভাব ছিল যে, তাঁহার দিকে চাহিলেই দর্শকের চিত্ত অভিভূত হইত। তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থান করিলে মন স্বভাবতঃই পাপ চিন্তা হইতে বিরত হইত। এ সকল অবশ্য শোনা কথা। কিন্তু ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। সংসারে প্রকৃতই এমন লোক মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁহাদের সংস্রবে আসিয়া বহু মানব তাহাদের দুর্নীতি পরিহার করিয়াছে। এই জন্যই সুজন সংসর্গ করিবার ব্যবস্থা সর্ব্বদেশের নীতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের নীতিবিদ এজন্য বলিয়াছেন—

"সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদ, আলাপঃ সুজনৈঃ সহ॥"

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমত

শ্যামাচরণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। হিন্দুর যাহা কিছু আচরণীয় তাহা তিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন। কৌলিক ধর্ম্ম হিসাবে শ্যামাচরণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন সত্য; কিন্তু কোনও বিষয়ে গোঁড়ামী তাঁহার ছিল না। কতকগুলি আচার পদ্ধতি পালন প্রত্যেক ধর্ম্মমতের উপাসকদিগের করণীয় তাহা তিনি মানিতেন; কিন্তু সেই সকল আচার পালন করিতে গিয়া যদি কাহারও চিত্তে দুঃখ বা ক্ষোভের কারণ উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম অব্যাহত থাকে না, ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসক হইলেও তিনি শক্তি পূজার বিরোধী ছিলেন না। তাঁহার ধান্যকুড়িয়া ভবনে

প্রতি বৎসর তিনি দুর্গা ও কালী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া মহাসমারোহে পূজা করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণব চিত্ত তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিত না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শক্তিপূজা, রাস, দোল প্রভৃতি উৎসবের পাশাপাশি এখনও পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

শ্যামাচরণের পিতা কালাচাঁদ পূর্ণমাত্রায় বৈষ্ণব ছিলেন, সে কথা এই গ্রন্থের যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শ্যামাচরণও কৌলিক প্রথা অনুসারে মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। তাঁহার গৃহে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমোদিত যাবতীয় উৎসবের অনুষ্ঠানও হইত।

যাহাদের হৃদয়ে সত্যের আলোক প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারা কখনও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি অনুসারে চলিতে পারে না। ধর্ম্মকে তাহারা সকল সময়েই প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু মতবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি তাহাদের মনোরাজ্যে কোন বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারে না। শ্যামাচরণেরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি মহাপ্রভুর উপাসক হইয়াও হিন্দু

ধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক মতবাদই যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিণামে একই লক্ষ্যে পৌছিবার বিভিন্ন পথমাত্র এই জ্ঞান তাঁহার মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

এজন্য হিন্দুর অনুষ্ঠিত পূজাপার্ব্বণ মাত্রই তিনি নির্ব্বিচারে ও আগ্রহভরে নিজ গৃহে প্রচলিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নামগানেও তিনি যেমন আনন্দ লাভ করিতেন, দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতিতেও তেমনই আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিতেন।

অশ্রান্ত কর্ম্ম-জীবনের অবসরকালে তিনি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বেদান্ত-ধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে যে সকল আলোচনা হইত, তাহা হইতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্বটুকু আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য ধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁহার চিত্তে কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও তিনি অন্যের ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, যে

কোনও ধর্ম্মের উপর তাঁহার অনাসক্তি ছিল না। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ তাঁহার কাছে তাহার ধর্ম্মোৎসবের জন্য অর্থ প্রার্থী হইলে তিনি সানন্দে সে বিষয়ে সাহায্য করিতেন, উৎসাহ দিতেন। ধর্ম্মান্ধতা ছিল না বলিয়াই কোনও মুসলমান তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কখনও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই।

মুসলমানদিগের অনেক মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজেদ নির্ম্মাণে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। এ সকল বিষয় তাঁহার উৎসাহ ও আন্তরিক আগ্রহ ছিল। মুসলমানগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ; তাঁহারা বাঙ্গালা মায়ের সন্তান, তাঁহার ভাই, দেশস্থ পরমাত্মীয় এ কথা, সে যুগের হিন্দুগণ উত্তমরূপেই জানিতেন। তাই কেহ গ্রামে পাঠাশালা স্থাপন করিলে, তথায় মুসলমান গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যে আপনাদের সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করাইতে বিন্দু মাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।

সে যুগে হিন্দু-মুসলমানে কোন বিরোধ ছিল না। তোরাব চাচা বা খুড়াকে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুরা

সমাদর করিত, আপনার জন বলিয়া মনে করিত। রহিম সর্দ্দার জাতিতে মুসলমান হইলেও হিন্দু জমীদারের আপনার জন ছিল। গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গ্রামের একটা মধুর সম্পর্ক পরস্পরকে আপনার করিয়া রাখিত। পীরের দরজায় হিন্দু শ্রদ্ধাসহকারে সিন্নি দিতে কখনও ইতস্ততঃ করে নাই। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণ, দোল দুর্গোৎসবে মুসলমান আগ্রহ সহকারে যোগ দিত। তখনকার সে মধুময় যুগ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের কাছে স্পৃহণীয় ছিল: শয়তানের প্রভাব, ভেদ বুদ্ধির বিষ দুই ভ্রাতাকে সে যুগে এমনভাবে জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই।

শ্যামাচরণের সময়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও প্রীতির-বন্ধন সুদৃঢ় ছিল। তাহাই শ্যামাচরণও হিন্দুর ন্যায় মুসলমানের জন্যও সকলপ্রকার উন্নতিকল্পে অর্থ ব্যয়ে কখনও ভেদবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। তাঁহার ধন-ভাণ্ডারের দ্বার হিন্দুর জন্য যেমন মুক্ত ছিল, মুসলমানের জন্যও তেমনই অনর্গল ছিল।

দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ

বসিরহাট সহরের নিকারী পাড়ার মসজেদের নিকট বাদ্যধ্বনির ব্যাপার লইয়া কোন কোন মুসলমান অকারণ যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল, হিন্দুর কীর্ত্তন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া বাঙ্গালাদেশে প্রথম হিন্দু মুসলমান বিরোধের সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার কথা অল্পদিনের মধ্যে কোনও বাঙ্গালী বিস্মৃত হন নাই।

যে মস্‌জেদকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্যা বা বিরোধের উদ্ভব হয়, সেই মসজেদ হিন্দুর অর্থে নির্ম্মিত, মসজেদ যে ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা শ্যামাচরণই দান করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ এই মসজেদ নির্ম্মাণ কল্পেও অল্প অর্থ প্রদান করেন নাই। কিন্তু সে সময়ে শ্যামাচরণ এবং কোন হিন্দুই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, উত্তরকালে এই মসজেদের সম্মুখ দিয়া চিরাচরিত প্রথামত কোন হিন্দুর সঙ্কীর্ত্তনের দল উপস্থিত হইলে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের কেহ কেহ এমনভাবে হিন্দু ভ্রাতার সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিতে পারেন। সে

যুগে কোন হিন্দু বা কোন মুসলমান এমন একটা বিষয়ের কল্পনাই করিতে পারিতেন না।

শ্যামাচরণ বহু ধর্ম্মানুরাগী মুসলমানকে মক্কাতীর্থ-যাত্রার সময় অর্থ সাহায্য করিতেন। কোন হিন্দু তীর্থযাত্রার প্রয়াসী হইয়া তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি যেমন অকুণ্ঠিত চিত্তে তীর্থযাত্রীকে অর্থদান করিতেন, মুসলমান যাত্রীর পক্ষেও সেইরূপ ব্যবহার তিনি করিতেন। এ বিষয়ে কোনও পার্থক্য বোধ তাঁহাতে ছিল না।

জীবিত লোকদিগের মধ্যে সন্ধান করিলে এমন লোকের সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে একদেশদর্শিতার অপবাদ কেহ শ্যামাচরণকে কখনও দিতে পারিবে না। তাঁহার ধর্ম্মমত যে উদার ও সর্ব্বব্যাপী ছিল, তাহা তাঁহার সমসাময়িক দুই চারি জন যাঁহারা এখনও বাঁচিয়া আছেন, এবং যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায়।

ঊনপঞ্চাশত পরিচ্ছেদ

সারল্য

যে শিশু-সুলভ সরলতা মানুষের ব্যবহারে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না, যে সরলতা গঙ্গার বারিধারার ন্যায় পবিত্র ও স্বচ্ছ, যে সরলতা অনাবিল ধর্ম্মপিপাসু চিত্তের বিশেষ প্রকাশ, শ্যামাচরণ ঠিক সেই প্রকৃতির সরল ছিলেন। যে সরলতাকে অনেক সময় বুদ্ধিহীনতার পর্য্যায়ে ফেলিতে হয়, শ্যামাচরণ সে শ্রেণীর সরল ছিলেন না।

সরলতা ছিল বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাসী হৃদয় কপটতার অভিনয়কে সহ্য করিতে পারিত না। যাহারা অসরল, মুক্ত হৃদয়ে কোন কিছু গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তেমন লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সরল-হৃদয়, অকপট ছিলেন বলিয়া কখনও জীবনে কাহাকেও বাক্য বা ব্যবহারে

সামান্য প্রকারেও প্রবঞ্চিত হইবার অবকাশ দেন নাই। তিনিও বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার সহিত সকলে অকপট ব্যবহার করিবে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ঠিক সরলভাবে কেহ চলিতে চাহিলে অনেক সময় তাহাকে প্রবঞ্চিত হইতে হয়। শ্যামাচরণ ঘোর ব্যবসায়ী ছিলেন সত্য, কিন্তু সরল, সহজ, অকপট ভাবেই তিনি ব্যবসায় করিতেন। যদি কেহ কখনও তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিত, তাহা হইলে তিনি কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

সরলতার আর একটা বহিঃপ্রকাশ বাঙনিষ্ঠা। অর্থাৎ মুখ দিয়া যাহা একবার উচ্চারিত বা স্বীকৃত হয়, যথাধর্ম্ম তাহা প্রতিপালন করা। এ বিষয়ে শ্যামাচরণ আদর্শ স্বরূপ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না তিনি যখনই যে বাক্য বলিতেন, তাহা পালন করিবার জন্য সর্ব্বস্বপণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

একবার কাহারও কাছে কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করিলে সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি তাহা প্রতিপালন করিতেন।

৪৪৯

তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত কোনও বাক্য কখনও প্রতিপালন করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। শ্যামাচরণের বাঙনিষ্ঠা সম্বন্ধে দুইটি ঘটনা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। জনৈক ভদ্রলোক বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া শ্যামাচরণের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ হিসাবে লইবেন স্থিরীকৃত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেই টাকা না পাইলে ভদ্রলোকের বিশেষ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ, সেই দিবস নিলামে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যাইবার কথা। শ্যামাচরণ তাহা জানিতেন। এজন্য তিনি তাঁহাকে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

নিরূপিত দিবসে ভদ্রলোক টাকা লইতে শ্যামা-চরণের কলিকাতার গদীতে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্যামাচরণ তথায় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার অন্যান্য অংশী টাকা দিবার কথা জানিতেন ; কিন্তু দলিলের সর্ত্ত লইয়া তাঁহারা ভদ্রলোকের সহিত গোলমাল আরম্ভ করিলেন। এদিকে বেলা বাড়িতে লাগিল। আদালতে টাকা জমা দিবার সময় উপস্থিত। তখন ভদ্রলোক পাগলের ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

ভদ্রলোক টাকা না পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া যখন উঠিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় শ্যামাচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "যদিও অদ্য রেজেষ্টারি করিবার আর সময় নাই, কিন্তু আমি যখন কথা দিয়াছি তখন আপনি এই ছয় সহস্র টাকা লইয়া গমন করুন। পরে সময় মত লেখাপড়া করিয়া দিবেন।"

কৃতজ্ঞতায় ভদ্রলোকের হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল। তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন। এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি এখনও শ্যামাচরণের মহত্ত্বের উদ্দেশে নমস্কার করেন। তিনি বলেন যে, শ্যামাচরণের বাক্য কখনও লজ্ঘিত হয় নাই।

আর একবার জনৈক কর্ম্মচারীকে কোন জমী কোন ব্যক্তিকে জমা করিয়া দিবার জন্য শ্যামাচরণ আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারী মনিবের প্রিয়পাত্র হইবার আশায় সেই জমী সেই লোককে বিলি না করিয়া অন্য লোককে বেশী টাকায় বিলি করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই কথা শ্যামাচরণের কর্ণগোচর

হয়। তাহাতে শ্যামাচরণ এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, সেই কর্ম্মচারী প্রিয়পাত্র হইবার পরিবর্ত্তে বহুকষ্টে সে যাত্রা তাহার চাকরী রক্ষা করিয়াছিল।

শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন, আমি মিথ্যাবাদী হইতে পারিব না। যাহা আমার মুখ হইতে একবার বাহির হইয়াছে, তাহাই হইবে তিনি পূর্ব্বোক্ত লোককে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল জমী আরও সুবিধায় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন জগৎ কেবল বাক্যের দ্বারাই চলিতেছে। মানুষ যখন কথার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া অনেকের সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, আপনার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষাকল্পে তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছে; কিন্তু অসরল পথে কোনও দিন তিনি চলেন নাই, মিথ্যার আশ্রয় কখনও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সহিত বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া যাঁহাদের ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহ কখনও শ্যামা-

চরণকে অসরল বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রবঞ্চনা করিয়া কাহারও কপর্দ্দকমাত্র উপার্জ্জনের সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন একথা কেহই কখনও বলিতে পারেন নাই। তাঁহার কথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে একটিও ঘটে নাই।

সরলতার জন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহার উচ্চপ্রশংসা করিতেন। কেহ তাঁহার সহিত কপট ব্যবহার করিতে সাহস পর্য্যন্ত করিতেন না। এই অসাধারণ সারল্যই তাঁহাকে অশেষ শক্তি-শালী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অকপটতার জন্য অনেক হিতৈষী বন্ধুকে পর্য্যন্ত অনেক সময় লজ্জা পাইতে হইত।

একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। যখন ধান্যকুড়িয়া গ্রামে বাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া শ্যামাচরণ পুষ্করিণী খনন ও উদ্যান রচনার জন্য সংলগ্ন জমী সংগ্রহ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার হিতকামী কয়েকজন লোক তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্যামা-চরণ যেন সুবৃহৎ উদ্যান রচনা করেন। তাহাতে যদি

সমগ্র গ্রামের অধিকাংশই লইতে হয়, তাহাও সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। শ্যামাচরণ সরল-প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাখিয়া ঢাকিয়া কোন কথা বলিতে জানি-তেন না।

তিনি প্রথমতঃ খুব হাসিয়াছিলেন। তারপর বলিয়াছিলেন যে, গ্রামের বেশীভাগ জমী যদি তিনি সংগ্রহ করিয়া উদ্যান রচনাই করেন, তাহা হইলে গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীকেই গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে। গ্রামের লোকই যদি চলিয়া গেল, তবে কাহাদের লইয়া তিনি গ্রামে বসবাস করিবেন? সুতরাং যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক জমী তিনি ক্রয় করিবেন না।

শ্যামাচরণ সরল, অকপট ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রাণের কথা মুক্তকণ্ঠ হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিশেষভাবে বিষয়-বুদ্ধিজীবী লোক হইলে, মনের কথাটা প্রকাশ করিতেন না। কারণ, সরল বা অকপট কথায় অনেক সময় অন্যকে লজ্জা পাইতে হয়। যাঁহারা শ্যামাচরণের শুভানুধ্যায়িরূপে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন,

তাঁহারা শ্যামাচরণের সরল-উক্তি শ্রবণে অবশ্যই ভীষণ লজ্জা পাইয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী, বিষয়জ্ঞ এবং বিবেচক হইয়াও কি প্রকারে এমন সরলতাবিশিষ্ট লোক ছিলেন তাহা অনেকে স্থির করিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইতেন; কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছুমাত্র অবকাশ কোথায়? যাঁহারা তীক্ষ্ণধী, বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক এবং ভক্ত, তাঁহাদের মন অবশ্যই সরলতাপূর্ণ হইবে। কারণ চিত্তক্ষেত্র কৃত্রিমতা-শূন্য, পবিত্র না হইলে কখনই ধর্ম্ম-পিপাসা, ভক্তি তথায় উপজাত হইতে পারে না। শ্যামাচরণের সরলতা এজন্য তাঁহাকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল।

এই অকৃত্রিম সরলতার জন্যই তিনি কখন কাহারও তোষামোদ বা অহেতুক মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেন না। চাটুকারিতা কপট ব্যক্তির লক্ষণ। যে অসরল সে চাটুবাক্যে মুগ্ধও হইতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে স্বয়ং চাটুকারের কার্য্য সম্পাদন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

তিনি স্বয়ং যেমন চাটুকারিতার পক্ষপাতী ছিলেন না, কেহ যদি তাঁহার সহিত কপট মিত্রতার পরিচয় দিয়া অথবা আনুগত্য স্বীকার করিবার অভিনয় করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিত, তাহাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ এরূপ চেষ্টা করিলে তিনি স্পষ্ট-ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

বহু ধনীব্যক্তির সহিত শ্যামাচরণের পরিচয় ছিল, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্যামাচরণ দেখিতেন, তাঁহাদের পার্শ্বচরগণ সকল সময়েই কৃত্রিম অভিনয় করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। এই প্রকার কপটতা বা ভণ্ডামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য কদাচিৎ এই শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে তিনি গমন করিতেন। তাঁহার সরল, অনাড়ম্বর চিত্ত এই প্রকার অসরলপথে ভ্রমণকারীদিগের সহিত মিলিতে মিশিতে অত্যন্ত কুণ্ঠা ও ব্যথা অনুভব করিত।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ভক্তি

শ্যামাচরণের চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য তাঁহার ভক্তিপ্রবণ উদার হৃদয়। যাহা কিছু সুন্দর, পবিত্র ও মধুর শ্যামাচরণ তাহারই ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভক্তিনত চিত্ত এই কারণেই মানবত্বরূপ শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পাইয়াছিল। যাহার হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ-ধারা প্রবাহিত নহে, সে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাস, সুখ-সম্পদের অধিকারী হইলেও ভিখারীর ন্যায় নিঃস্ব, রিক্তসর্ব্বস্ব। যে ভক্ত নহে সে কোন কিছুই অর্জ্জন করিতে পারে না, সঞ্চিত পদার্থও তাহার নিকট হইতে ইন্দ্রজালের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় সাধনা ব্যতীত হৃদয় দৃঢ় হয় না। অচঞ্চলা, ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত পার্থিব বা অপার্থিব, বস্তুতান্ত্রিক অথবা কল্পনা-মূলক কোন বিষয়-

কেই আয়ত্ত করা যায় না। যিনি জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করিতে চাহেন, তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, অখণ্ড অনুরাগ বা একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অবশ্যই থাকিবে। নহিলে কখনই তাঁহার জ্ঞানমার্গের সার্থকতালাভ ঘটিবে না। কর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির অভাব ঘটিলেও ঠিক অনুরূপ ব্যর্থতা জীবনে আসিবেই। ভক্তিমার্গের সম্বন্ধেও ঐকান্তিক নিষ্ঠার দৈন্য বশতঃ মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

শ্যামাচরণের জীবনে এই প্রগাঢ় ভক্তির অভিব্যক্তিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তি হইতে তন্ময়তা আসে। তন্ময়তা না হইলে সিদ্ধিলাভ ঘটেনা। শ্যামাচরণের কর্ম্ম-জীবনে এই তন্ময়তার বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যখন কর্ম্মের সাধনায় তিনি নিমগ্ন, তখন কর্ম্মের প্রতি কি প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহার সকল প্রকার অনুষ্ঠানে বিবিধভাবে প্রকাশ পাইত!

দিবসের কর্ম্মসমাপনান্তে কর্ম্মচারীরা অবসর বিনোদনের জন্য রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছে।

গভীর রজনীতে অথবা নিশাশেষে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইত, কর্ম্ম-সাধক শ্যামাচরণ উজ্জ্বল দীপাধারের সম্মুখে বসিয়া একাগ্র-মনে হিসাব পত্রের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, সে বোধ পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। এমন ঘটনা একাধিকবার তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে। কর্ম্মের প্রতি একান্ত ভক্তি ব্যতীত কখনই এমন আত্মহারা ভাব উপজিত হইতে পারে না।

কর্ম্মজীবনে তিনি যেমন ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ধর্ম্মজীবনেও তাহার বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানের প্রতি তাঁহার অটুট বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার ভবনে নানাবিধ পূজার অনুষ্ঠান হইত। তিনি ষোড়শোপচারে মহামায়ার পূজা করিতেন। সে পূজায় ভক্তের হৃদয় নিঃসৃত ভক্তিধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রকাশ পাইত।

পূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার দিকে তাঁহার খর দৃষ্টি ত থাকিতই। তারপর যখন দেবীর

অর্চ্চনা আরম্ভ হইত, তখন হইতে পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভক্তি গদগদ চিত্তে প্রতিমার সম্মুখে তিনি গললগ্নীকৃত-বাসে জগৎ সংসার বিস্মৃত হইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। সে সময়ে তাঁহার ধ্যানস্তিমিত নেত্র দেখিলে মনে হইত, ইহ সংসারের কোন সম্পর্কই যেন আর শ্যামা-চরণের মনের কোনও প্রান্ত অধিকার করিয়া রাখে নাই।

ভক্ত শ্যামাচরণের নেত্রপথে তখন দরদর ধারে অশ্রুর প্রবাহ নামিয়া আসিত। সে সময়ে তাঁহার সমগ্র আননে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিত। সে সময়ে দর্শকের মনে হইত, মহামায়ার চরণতলে সাধক তাহার সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া তাঁহার নিকট আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। দেবী-প্রতিমার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি তখন ঈষন্নিমীলিত, নিঃশ্বাস বায়ু শুধু তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া প্রকাশ করিত, ইহ জগতের সহিত তাঁহার দেহের সম্বন্ধ তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। চারিদিকের কোলাহল, ব্রাহ্মণের কণ্ঠোত্থিত চণ্ডীর বন্দনা গান, আরতির শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি,

কিছুই যে তখন তাঁহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইত না, ইহার প্রমাণ তাঁহার স্থির, নিষ্কম্প দেহ দেখিয়াই অনুমান করা সম্ভবপর হইত।

শ্যামাচরণের পিতা কালাচাঁদ কীর্ত্তনের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন; তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই উক্ত হইয়াছে। শ্যামাচরণও কীর্ত্তনের অনুরাগী ছিলেন। যখন কীর্ত্তন নাম আরম্ভ হইত, শ্যামাচরণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। বিশুদ্ধা ভক্তিই তাঁহাকে যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে একাগ্রচিত্ত করিয়া দিত।

শ্যামাচরণ মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন, এজন্য বাহিরের অনুষ্ঠান গুলিকে তিনি ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সম্পন্ন করিতে যেমন ভাল বাসিতেন, আবার যাহা অন্তরের ব্যাপার তাহাতেও পূর্ণমাত্রায় মত্ত হইতেন। দেবার্চ্চনা প্রভৃতি সময়ে তাঁহার তদ্গত, ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসী যে কেহ মনে করিতে পারিতেন,—

"তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী,"

এই তত্ত্বটি শ্যামাচরণের আধ্যাত্মিক জীবনে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

লোক দেখান ভক্তি বা ধর্ম্মের অভিনয় তাঁহাতে ছিল না। তিনি যাহা কিছু করিতেন প্রকৃত ভক্তের হৃদয় লইয়াই তাহা সম্পাদিত করিতেন। ভণ্ডামি তিনি নিজে সহ্য করিতে পারিতেন না, আপনার জীবনে ভ্রমেও ভণ্ডামির কখনও প্রশ্রয় দেন নাই।

পূজা পার্ব্বণে শ্যামাচরণ দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিতেন। অর্থদান, বস্ত্রদান—তাঁহার সকল কার্য্যই প্রগাঢ় ভক্তি হইতে সঞ্জাত। প্রশংসা বা যশের লোভে এ সকল কার্য্য কখনও তিনি করিতেন না। যাহারা প্রকৃত হিসাবে ভক্ত, তাহারা কোনদিনই লৌকিক লাভ লোকসান, প্রশংসা অপ্রশংসা ভাবিয়া কাজ করে না। উহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তাই ভক্ত শ্যামাচরণ দরিদ্রসেবক, দানবীর বলিয়া বাঙ্গালাদেশে চিরস্মরণীয়, ও চিরবরণীয় হইয়া যাইতে পারিয়াছেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

দয়ার্দ্রতা

দয়া বা করুণা মানব মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে নর বা নারীর হৃদয়ে দয়া নাই, তাহাকে বিশ্বাস নাই। সে সকল প্রকার পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। যাহার হৃদয়ে ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দান বিকাশ লাভ করে, তাহার মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, দয়া বা করুণা বৃষ্টিধারার ন্যায় মনুষ্য হৃদয়কে স্নিগ্ধ, সিক্ত আর্দ্র করিয়া সেই চিত্তক্ষেত্রকে নন্দন কাননে পরিণত করিয়া থাকে।

যাহার হৃদয়ে দয়া বা করুণার প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, সে নানাপ্রকার মহৎ কার্য্য করিয়া স্বয়ং ধন্য হয় এবং ধরিত্রীকে ধন্য করিয়া থাকে। নির্দ্দয় মানব পশুর ন্যায় ভীষণ, হিংস্র এবং সমাজের ব্যাধি-স্বরূপ। বিধাতার বিশেষ আশীর্ব্বাদভাজন না হইলে কেহ দয়ার অধিকারী হইতে পারে না।

শ্যামাচরণের হৃদয়ে এই দয়ার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে করুণার প্রস্রবণ নিয়তই উৎসারিত হইত। বাল্যকাল হইতেই ভগবানের নিকট হইতে তিনি দয়ারূপ মহা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ভক্তকবি তুলসীদাসের একটি শ্লোক আছে। এই শ্লোকটি প্রত্যেকেরই স্মরণ-যোগ্য।

“দয়া ধরম্ কি মূল, নরকমূল অভিমান।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া যব্ কণ্ঠাগত প্রাণ।”

দয়া ধর্ম্মেরই মূল, অভিমান্ নরকে আকর্ষণ করিবার মূলীভূত কারণ। তুলসীদাস! প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও দয়াকে পরিত্যাগ করিবে না। শ্যামাচরণ তুলসীদাসের দোঁহাবলীর সহিত উত্তরকালে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন কিনা, সেকথা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু এই দয়াধর্ম্ম শ্যামাচরণের জীবনে ওতপ্রোতভাবে ছিল—বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কার্য্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত।

শ্যামাচরণ যখন বালক বয়সে প্রথম মাতুলালয়ে আসেন, সেই সময় তিনি পাটের সূত্র-বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সহিত যাঁহারা একযোগে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই ইদানীং ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। দুই একজন বাল্য সঙ্গী এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, সূত্রবয়ন কার্য্যে শ্যামাচরণ আত্মবিস্মৃত ভাবে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ভিক্ষুক কিছু প্রাপ্তির আশায় তথায় উপস্থিত হইত, অমনই শ্যামাচরণের তন্ময়ত্ব যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইত। প্রার্থীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি তখনই ভিখারীকে যাহা কিছু পারিতেন আনিয়া দিতেন।

চিত্ত করুণার্দ্র না হইলে কখনই ইহা সম্ভবপর হইত না। এমনও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার হস্তে দুই একটি পয়সা জমিয়াছে, ভিক্ষার্থী আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বিনা দ্বিধায় তখনই তাহা ভিক্ষুককে হাসিমুখে দান করিতেন। এ বিষয় তিনি দেখিয়া শুনিয়া শিখেন নাই। সহজাত দয়া প্রবৃত্তির বশেই তিনি দান করিয়া ফেলিতেন। নিজের অভাবের

চিন্তা তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্তকে বিমুখ হইবার অবকাশ দিত না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তর্নিহিত সহজাত দয়ার প্রকাশ নানাকার্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কোনও দরিদ্রের অদৃষ্টে অন্ন জুটে নাই এরূপ সংবাদ বালক শ্যামাচরণের কর্ণে প্রবেশ করিলে, তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেন এবং কি উপায়ে দীন প্রতিবেশীর অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে পারা যায় সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। যদি অন্য কোন স্থান হইতে আহার্য্য-উপকরণ সংগৃহীত না হইত, তাহা হইলে মাতুলালয় হইতে তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া গোপনে তিনি প্রতিবেশীর গৃহে পৌছাইয়া দিতেন।

তাঁহার কৈশোর জীবনে এরূপ ঘটনা একাধিক-বার সংঘটিত হইয়াছিল। কাহারও দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে কিশোর শ্যামাচরণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। গ্রামবাসীরা সকলেই জানিত, দয়া ও মমতায় শ্যামা-চরণের চিত্ত পূর্ণ। তাঁহার বাল্যসঙ্গীরা এজন্য অনেক

সময় শ্যামাচরণকে বিদ্রূপ করিতেও বিস্মৃত হইত না। সঙ্গীদিগের নিকট হইতে সময়ে অসময়ে এইরূপভাবে বিদ্রূপের বাণ বর্ষিত হইলেও, শ্যামাচরণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না। মৃদু হাসিয়া তিনি নীরবে আপনার কাজ করিয়া যাইতেন।

ব্যথিতের বেদনায় দুঃখবোধ, অসহায়ের প্রতি করুণা, অভাবগ্রস্তের প্রতি দয়া শ্যামাচরণের চরিত্রে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। জনৈক পলিতকেশ বৃদ্ধ শ্যামাচরণের কৈশোর জীবনের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঘটনা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ যে সময় ধান্যকুড়িয়া হইতে কলিকাতায় প্রথম আগমন করেন, তখন ট্রেণ হয় নাই। সাধারণ লোক পদব্রজেই দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিত। যাঁহারা ধনবান, শুধু তাঁহারাই পাল্কী অথবা নৌকাযোগে কলিকাতায় গতায়াত করিতেন। গাড়ী করিয়া যাইবার অবস্থা সকলের ছিল না। সাধারণ অবস্থার লোক সে যুগে পদব্রজে পথ অতিবাহিত করিতে

সহসা ক্লান্তিবোধ করিত না। মান-অপমান বোধের সূক্ষ্ম তত্ত্বও তখনকার মানুষ ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য লালায়িত হইত না।

দীর্ঘপথের মাঝে মাঝে বিশ্রামাদির জন্য পান্থ-নিবাস ছিল। পথিশ্রান্ত জনগণ তথায় স্নান আহার সমাপ্ত করিয়া লইত, প্রয়োজন হইলে রাত্রিবাসও করিত। বেলিয়াঘাটা নামক স্থানে এইরূপ পান্থ-নিবাস ছিল। দুই তিন খানি দোকানঘরে পথচারীরা মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। স্নান আহার সমাধা করিয়া আবার তথা হইতে যাত্রা করিত।

উল্লিখিত বৃদ্ধ তখন যুবক ছিলেন। তিনি কয়েক জন সঙ্গিসহ একদিন মধ্যাহ্নে বেলিয়াঘাটার পান্থ-নিবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, শ্যামা-চরণ জনৈক সহযাত্রীর সহিত তথায় রন্ধনাদি করিবার আয়োজন করিতেছেন। সকল দলের রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত হইলে সকলে আহারে উপবেশন করিলেন। শ্যামাচরণ তখনও ভোজনে বসেন নাই। কি একটা কার্য্য উপলক্ষে একটু বিলম্ব হইতেছিল।

সকলে ভোজনে নিরত এমন সময় একজন শীর্ণ-কায়া, রুগ্না বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইল। তাহার মলিন দেহ, রুক্ষ কেশ, শতধাছিন্ন পরিধেয় বসন! দারিদ্র্য যেন তাহার দেহে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। রোগ-জীর্ণা বৃদ্ধার অবয়বে নিদারুণ ক্ষুধার মূর্ত্তি। সে করুণ বচনে, কাতরকণ্ঠে কিছু আহার্য্য প্রার্থনা করিল। কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে বিন্দুমাত্র আহার্য্য জুটে নাই। ক্ষুধায় সে যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

কিন্তু অভাগী বৃদ্ধার কাতর অনুনয়ে কাহারও মন টলিল না, কেহই তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করাও হয় ত সঙ্গত মনে করে নাই; সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত রহিল। দুঃখিনী, অনশনক্লিষ্টার আবেদন শুধু পবনে ভর করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্যামাচরণ তখন অন্যত্র কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। কাজ সারিয়া যখন তিনি আহারে উপবেশন করিতে যাইবেন, সেই সময় বৃদ্ধা নারীর করুণ আবেদন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সারাদিনের পরিশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিত; কিন্তু আর্ত্তের আবেদন তখনই

তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিয়া অবগত হইলেন যে, বাতরোগ বৃদ্ধির জন্য সে দুইদিন উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য ভিক্ষায় বহির্গত হইতে পারে নাই। নিদারুণ ক্ষুধায় যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। অনাহারে শরীর এমন দুর্ব্বল যে, চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। কিছু খাইতে পাইলে সে আবার চলিতে পারিবে।

তাহার বর্ণনা সত্যই হউক, অথবা অতিরঞ্জিতই হউক, শ্যামাচরণ তাহার কাহিনী শুনিয়া বিচলিত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়াই তিনি নিজের জন্য যে অন্নব্যঞ্জন কদলীপত্রে পরিবেষণ করিয়া লইয়াছিলেন, সমস্তই বৃদ্ধার সমক্ষে আনিয়া দিলেন। উপস্থিত জনগণ কিশোর শ্যামাচরণের এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গেল। অনেকে তাঁহার এই কার্য্যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পাইয়া বিরক্তিও প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সহযাত্রী শ্যামাচরণকে নির্ব্বোধ আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহার তাহার উপর

এইরূপ অহেতুকী দয়া প্রকাশের নাম মূর্খতা, অর্ব্বাচীনতা, ইহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় সকলের সম্মুখেই বলিয়া ফেলিলেন। শ্যামাচরণ তিরস্কৃত হইয়াও বিচলিত হইলেন না। তিনি মৃদুস্বরে সঙ্গীকে বলিলেন যে, তাঁহার নিজের জন্য দুশ্চিন্তায় কোন কারণ নাই। দুই চারি পয়সার চিড়ামুড়কী হইলেই তাঁহার উদরপূর্ত্তি হইবে।

বৃদ্ধার আহার সমাপ্ত হইলে, কিশোর বয়স্ক শ্যামাচরণ চিড়া ও মুড়কীর সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। বৃদ্ধা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্যামাচরণের দয়ার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, ভগবানের কাছে তাঁহার কল্যাণ ভিক্ষা করিল। যে বৃদ্ধের মুখে এই কাহিনী শ্রুত হওয়া গিয়াছিল, এই গ্রন্থ রচনার কিছু পূর্ব্বেই সে ব্যক্তি ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শ্যামাচরণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবার নহে।

শ্যামাচরণের হৃদয়ের মণিকোঠায় বহু রত্নরাজির সমাবেশ ছিল। দয়া তাহার অনেকখানি স্থান উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধি এবং অবস্থা-

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দয়ার স্রোতোধারা ক্রমশঃ কুলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছিল। ধান্যকুড়িয়ার ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে এই সার্ব্বজনীন দয়াই তাঁহাকে প্রথম প্রেরণা দান করিয়াছিল। এ সংবাদ ইদানীং অতি অল্প ব্যক্তিই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পরিচ্ছেদে ধান্যকুড়িয়ার ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রদানকালে মিশনারীদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাদুড়িয়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গের উল্লেখ করা গিয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ে ধান্যকুড়িয়া এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বালকগণ অধ্যয়ন করিতে গমন করিত। বর্ষাকালে ছাত্রগণকে অতিকষ্টে পথ অতিবাহিত করিতে হইত। বিশেষতঃ নদীয়া, গোক্‌না প্রভৃতি গ্রামবাসী বালকদিগকে বর্ষাকালে নানাপ্রকার বিশেষ অসুবিধা সহ্য করিতে হইত।

তাহাদিগের গমনপথে একটা বিল ছিল। বর্ষাকালে উক্ত বিল অতিক্রম না করিয়া বিদ্যালয়ের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। অবশ্য বর্ষার পর উক্ত

বিল শুষ্ক হইয়া যাইত, তখন কোন বিশেষ অসুবিধা হইত না। বর্ষাকালে বিলটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তখন বালকগণ পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া গামছা পরিয়া বিল অতিক্রম করিত। তারপর পারে পৌঁছিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিত।

একদা শ্যামাচরণ কোন কার্য্যোপলক্ষে কর্ম্মচারিবৃন্দসহ ঐ অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তখন বর্ষাকাল। বালকগণ ঠিক সেই সময় উল্লিখিত উপায়ে বিল অতিক্রম করিতেছিল। এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া শ্যামাচরণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন। বালকগণ যতক্ষণ এইভাবে বিল পার হইতেছিল, সকল কার্য্য ভুলিয়া তিনি তাহাই দর্শন করিতে লাগিলেন।

দয়া, করুণা শ্যামাচরণের কোমল, ভাবপ্রবণ হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিল। বালকদিগের এই প্রকার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার চিত্তে সেই দিনই একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বালকগণের দুঃখ কষ্টের অবসান করিয়া দিবার সঙ্কল্প সমুদিত হইয়াছিল। ইহার

কিছুদিন পরেই বাহুড়িয়া বিদ্যালয়ে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্যামাচরণ কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিতে পারিতেন না। দয়া সকল সময়েই তাঁহাকে কোন না কোন মহৎকার্য্যে প্রেরণা দিত। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় এই করুণা বা দয়াই তাঁহাকে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তেমন উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশে সহায়তা করিয়াছিল। উত্তরকালেও এই দয়াই তাঁহাকে সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মহনীয় ও বরণীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সে কথা বিবৃত হইবে।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

দান

একটা প্রচলিত কথা আছে, "দাতা চিরং জীবতু।" যিনি দাতা অনন্তকাল তাঁহার দানের মহিমা বিশ্বে অমর হইয়া থাকে। শ্যামাচরণের দানও তাঁহাকে দেশবাসীর কাছে স্মরণীয়, বরণীয় করিয়া রাখিবে। বংশপরম্পরায় তাঁহার দানের মহিমা চিরদিন জগতে বিঘোষিত হইতে থাকিবে।

সংসারে শুধু দুঃখেরই সঙ্গীত নিরন্তর ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। দুঃখবাদই জগতের প্রধান সমস্যা। এই চিরন্তন দুঃখ হইতে জীবের মুক্তিলাভের জন্যই যুগে যুগে, দেশে দেশে মহাত্মাগণের আবির্ভাব হইয়াছে, কত দর্শন শাস্ত্রের রচনা হইয়াছে। ভারত-বর্ষের ঋষি তপস্বিগণ কতভাবে সনাতন দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, যুগপ্রবর্ত্তক মহামানবগণের আবির্ভাব হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাণী

এই চিরন্তন দুঃখবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের ষড়্‌দর্শন এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। য়ুরোপের দর্শনও এই এক কথা লইয়াই কারবার করিয়াছে। কবি ও উপন্যাসিকগণ এই চিরন্তন দুঃখ লইয়া কত কাব্য ও কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ভিক্টর হুগো "Les Miserables"—চির-দুঃখিগণের কাহিনী লইয়া অমর উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন;

সুতরাং দুঃখ, কষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানব সম্প্রদায়ের জন্য মহৎহৃদয় আপনা হইতেই বিচলিত হইয়া উঠে। শ্যামাচরণের কোমল অন্তর মানবের দুঃখ দেখিলেই ব্যথিত হইয়া উঠিত, অমনই মুক্তহস্তে তিনি দান কার্য্যে আত্মনিবেদন করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদে তিনি দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতেন। অর্থ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দান-প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করিতেছিল।

এমন কথা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তাঁহার দান শক্তির কথা দিকে দিকে প্রচারিত হওয়ায়, প্রায়ই প্রার্থী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভের আশায় তাঁহার ভবনে সমবেত হইত। সকল সময় অবশ্য তিনি গৃহে থাকিতে পারিতেন না। কার্য্যব্যপদেশে নানাস্থানে যাইতে হইত। কর্ম্মশ্রান্ত অবস্থায় দিবা দ্বিপ্রহরে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন, প্রার্থীরা তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তখন আহার ও বিশ্রামের কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি ধৈর্য্য সহকারে প্রত্যেকের নিবেদনে কর্ণপাত করিতেন। ব্যক্তিগত সুখ অথবা শ্রান্তি বিনোদনের প্রতি লক্ষ্য না না করিয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে অভাব-গ্রস্তদিগের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। যাহাকে যাহা দেওয়া প্রয়োজন সেইরূপ দানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তবে তিনি আহারে গমন করিতেন।

এ বিষয়ে কেহ কোনদিন তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরক্ত হইতে দেখে নাই। বাল্যকালে তিনি অন্নবস্ত্রের দুঃখ কিরূপ মর্ম্মান্তিক তাহা স্বয়ং

ভোগ করিয়াছিলেন। এজন্য কাহারও অন্নবস্ত্রের অভাব জনিত দুঃখ তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান শুধু অন্ন বস্ত্রদান করিবার উপলক্ষেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পূজার তিন দিবস তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রদান পর্ব্বও যথারীতি পালিত হইত। বহুদূর হইতে প্রার্থিগণ তাঁহার গৃহদ্বারে সমাগত হইত। শ্যামাচরণ পরমাত্মীয় বোধে প্রত্যেকের মন[illegible] সাধন করিতেন।

[illegible] কর[illegible] য়া উ[illegible]

প্রত্যক্ষদর্শী বহুলোকের নি[illegible] স্বাচ্ছন্দ্য[illegible] যে, প্রতি পূজার সময় তের চৌদ্দ হাজার নরনারী অন্নবস্ত্রের জন্য সমবেত হইত। শ্যামাচরণের এই অকুণ্ঠিত দরিদ্রনারায়ণের সেবা এখনও তাঁহার সন্তানগণ অব্যাহত রাখিয়াছেন, তবে বস্ত্রদান ব্যাপার আর সেইভাবে এই অর্থনৈতিক সমস্যার যুগে পরিচালিত করা সম্ভবপর নহে দেখিয়া তাঁহারা প্রত্যেককে বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আট আনা করিয়া দান করিয়া থাকেন।

ইহাতেও এখনও পূজার সময় আট দশ হাজার নর-নারীর সমাবেশ হইয়া থাকে।

বাৎসরিক অন্নবস্ত্র দান ব্যতীত শ্যামাচরণের প্রাত্যহিক দান কত ছিল তাহার সকল হিসাব পাওয়া যায় না। লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, বহু নরনারী শ্যামাচরণের ধান্যকুড়িয়া আগমনের দিন প্রতীক্ষা করিয়া যাপন করিত। তাহারা জানিত যে, এই দানবীরের কাছে অভাব জ্ঞাপন করিলেই তাহার নিশ্চয়ই প্রতীকার হইবে। এই সকল নরনারীর আশা কোনদিনই ব্যর্থ হয় নাই। যখন শ্যামাচরণের ধান্যকুড়িয়া প্রতীক্ষা ক। তচ্ছেনর পর বস্ত্রাদি উপহার পাইয়া [illegible] লেখকের বাড়ীতেও অনেক সময় উহা তাহারা দেখাইয়া যাইত।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন বসিরহাট মহকুমা অঞ্চলের কাওরা প্রভৃতি জাতির মধ্যে দরিদ্রা বৃদ্ধাগণেরও বস্ত্রাভাব ছিলনা বলিলেই হয়। কিন্তু তথাপি অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল নর নারীর সংখ্যা কম ছিল না। বঙ্গমাতা সুজলা সুফলা ছিলেন, তাঁহার

সন্তানগণ বসন ব্যাপারে কখনও পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিতেন না। কিন্তু নানাকারণে বঙ্গজননীর সে সৌভাগ্য ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছিল। কাজেই অন্নবস্ত্রের অভাব—যাহার জন্য বাঙ্গালাদেশ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও স্বাবলম্বী দেশ সমূহের মধ্যে ইজ্জত হারায় নাই—ক্রমশঃ বাঙ্গালা দেশের ললাটে স্থায়ী অগৌরবের টীপ অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল।

[illegible] হৃদয়ে অন্নবস্ত্র দান করিবার ইচ্ছা অনে[illegible] [illegible]ব প্রকাশ পাইত যে, দর্শকগণ বি[illegible] [illegible]নিক স্বাচ্ছন্দ্য[illegible] [illegible]মাচরণের সমসাময়িক, স্বগ্রাম[illegible] এক ব্যক্তির মুখে এইরূপ একদিনের একটা ঘটনার কথা শুনা গিয়াছে। বৃদ্ধ এখনও জীবিত, আরও দুই তিন ব্যক্তি তাহার এই উক্তির সমর্থন করিয়াছে।

একদা দ্বিপ্রহর কালে শ্যামাচরণ স্নানান্তে অন্তঃপুরে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি তখন বহির্ব্বাটীতে কার্য্যব্যপদেশে প্রতীক্ষা

করিতেছিল। সহসা তাহারা দেখিতে পাইল, শ্যামা-চরণ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া, বিহ্বলভাবে বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহার এবম্প্রকার ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ বলিলেন যে, তাঁহার মন কোন অজ্ঞাত কারণে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইষ্ট-দেবতার আরাধনায় কোনমতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছেন না। বারবার যেন পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে, বাহিরে কাহারা যেন অত্যন্ত ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। শ্যামাচরণ উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহির্ব্বাটী হইতে একবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অন্যান্য সকলেও বিস্মিত ভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। সম্পূর্ণ বাহিরে আসিয়া সকলে দেখিতে পাইল যে, শ্যামাচরণের অট্টালিকার তোরণপার্শ্বে দুইজন যুবতী সঙ্কোচভরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের অঙ্গে শতছিন্ন, মলিন, গ্রন্থিবদ্ধ বস্ত্র। অতিকষ্টে তাহার

সাহায্যে লজ্জা নিবারণ করিয়া যুবতী নারীযুগল কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

শ্যামাচরণ তদবস্থায় সেই নারীযুগলকে দেখিয়া নয়ন আবৃত করিলেন। তারপর অত্যন্ত স্নেহ করুণ-কণ্ঠে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্খলিত কণ্ঠে, মৃদুস্বরে তাহারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল। সেই চিরন্তন দারিদ্র্যের মর্ম্মভেদী ইতিহাস [illegible] মগ্নবস্ত্রহীন নিরুপায়ের শো[illegible] তাঁহা[illegible]বস্ত্র দান ক[illegible] [illegible]না।

শ্যামাচরণের [illegible] কাহা[illegible]র পে[illegible] [illegible] লজ্জা নিবারণের উপায় হইতে পারিবে বলিয়াই [illegible]বতীরা দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে অতিকষ্টে এখানে আসিয়াছে। তাহারা লোক-মুখে শুনিয়াছে, শ্যামাচরণের নিকট জ্ঞাপন করিলে বস্ত্রহীন, বসনহীনা কেহ থাকিতে পারে না।

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ নারীযুগলকে সঙ্গে লইয়া গ্রন্থে বর্ণিত, রামচন্দ্রের কাপড়ের দোকানে উপস্থিত হইলেন। দোকান অদূরেই অবস্থিত ছিল।

তখনই প্রত্যেককে এক জোড়া হিসাবে বস্ত্র প্রদত্ত হইল। ছিন্নবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নববেশে সজ্জিতা হইবামাত্র শ্যামাচরণ যুবতী যুগলকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

সে বেলা পরিতোষরূপে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া তিনি প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থও দান করিলেন। ভিখারিণী নারীরা নববস্ত্র পরিধান করিয়া অল্পদূর অগ্রসর হইবামাত্র, কথাটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখনই নববস্ত্র লাভের আশায় বহুসংখ্যক নর ও নারী ভিক্ষুক তাঁহার বাসভবন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শ্যামাচরণ গৃহে ফিরিয়াছেন, এবার যাহার যাহা অভাব তাহা দূরীভূত হইবে, এই আশায় উৎফুল্ল পল্লী-গ্রামের ভিখারীরা সমবেত হইতে লাগিল। তিনি দেশে আসিলে প্রতি ভিখারী একসের তণ্ডুল ও নগদ দুই আনা, চারি আনা করিয়া পাইয়া থাকে, ইহা প্রবাদবাক্য স্বরূপ গ্রামে গ্রামে রটিয়া গিয়াছিল। প্রতিদিন যে কোন ভিখারীর এইরূপ প্রাপ্য ছিল।

বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও প্রত্যহ ভিক্ষুক সমাগম হইত। কারণ তাহারা জানিত, নিরূপিত দান ব্যতীত, সেদিন উদর পূর্ত্তি করিয়া আহারের কোন ভাবনাও থাকিবে না। এই পবিত্র প্রথা শ্যামাচরণের গৃহে এখনও পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথও যখন ধান্যকুড়িয়ার ভবনে গমন করেন, তখন পূর্ব্বের ন্যায় এখনও দলে দলে প্রার্থী তথায় উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্যামাচরণের উপযুক্ত পুত্র দেবেন্দ্রনাথও পিতার সেই লোকবিশ্রুত দান-মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া এখনও পর্য্যন্ত কোন প্রার্থীকে নিরাশ করেন নাই। তবে তখনকার যুগে শ্যামাচরণ যেরূপ ব্যাপকভাবে দানকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এখন তাহা সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক, রমণী যুগলের মুখে বস্ত্রদানের কথা শুনিবামাত্র দলে দলে ভিক্ষার্থীরা অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ ধান্যকুড়িয়া গ্রামে আসিলেই প্রায় তিন শতাধিক্ নরনারী দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে আসিয়া তিন চারিদিন ধরিয়া প্রত্যহ ভিক্ষা লইত।

ইহারা সেই দলেরই ভিক্ষার্থী। ইহাদের মধ্যে অনেকে শ্যামাচরণের আগমন সম্ভাবনায় দুই তিন দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

ভিক্ষার্থীরা একে একে রামচন্দ্র মণ্ডলের কাপড়ের দোকানে সমবেত হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ দানে কল্পতরু। তিনি প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র দিবার জন্য রামচন্দ্রকে আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র এইরূপ সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিত। সানন্দে সে কাপড়ের জোড়া কাটিয়া একে একে প্রার্থীদিগকে প্রদান করিতে লাগিল।

প্রায় শতাধিক বস্ত্র বিতারিত হইবার পর সহসা জনৈক মুসলমান মৌলবী বেশধারী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। সে লোকটি নানা বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিয়া শ্যামাচরণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি যতই তাহাকে প্রশ্ন করেন, তাহার কি উদ্দেশ্যে আগমন, সে তাহা প্রকাশ না করিয়া বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাচরণ এরূপ অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর শুনিতে ভাল বাসিতেন না।

ক্রমে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে মৌলবী বেশধারী ব্যক্তির অর্থহীন অসার উক্তি শুনিয়া শুনিয়া শ্যামাচরণের মন বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তথায় আর অবস্থান করিতে না পারিয়া বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তখনও বহু ব্যক্তিকে বস্ত্র বিতরিত হয় নাই। কিন্তু শ্যামাচরণের অনুপস্থিতি দেখিয়া রামচন্দ্র বস্ত্র বিতরণ কার্য্য বন্ধ রাখিল। পরে দেখা গেল, যাহাদিগকে বস্ত্র তখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই সন্নিকটস্থ গ্রামবাসী ভিখারী। তাহাদের কাহারও বস্ত্রাভাব ছিল না। শ্যামাচরণের বস্ত্রদান ব্যাপার অবলোকন করিবার জন্যই তথায় সমাগত হইয়াছিল; যদি সেই সঙ্গে কাহারও ভাগ্যে দুই একখানি বস্ত্রলাভ ঘটে, এমন আশাও হয় ত তাহাদের মনে ছিল।

ঘটনাটি হয়ত কাকতালীয়বৎ প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণের যাহারা এখনও জীবিত, তাহাদের বিশ্বাস যে, অভাবগ্রস্তদিগের সম্বন্ধে বস্ত্রদান ব্যাপার সমাপ্ত হইবামাত্র মৌলবীর আবির্ভাব

বিশেষ ইঙ্গিতের দ্যোতক। আর বস্ত্র বিতরণের প্রয়োজন নাই, তাই শ্যামাচরণকে প্রকারান্তরে বাধা দিবার জন্যই মৌলবীবেশী লোকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। অতি বিশ্বাসী মানুষের কল্পনা বলিয়া বস্তু তান্ত্রিকগণ এ ঘটনাটিকে উপেক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীরা এই ব্যাপারটিকে অন্যবিধ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

সাধারণ ভিক্ষুকদিগের সম্বন্ধে শ্যামাচরণের এই ভাবে সাময়িক দান সত্ত্বেও নানাবিধ নিত্য দান ছিল সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দবিদ্র ভদ্রলোকদিগকেও তিনি অপর্য্যাপ্ত দান করিতেন। বহু ভদ্র কিন্তু অভাবগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারে তাঁহার মাসিক দান ছিল। সে দানের পরিমাণ এমন ছিল যে, সংসার প্রতিপালনে অশক্ত সাহায্যগ্রস্তদিগের কোনরূপ বিশেষ অসুবিধা হইত না।

লেখক স্বয়ং এমন দুইটি ভদ্রপরিবারের কথা অবগত আছেন। তাঁহাদের নাম ধাম প্রকাশ করা সঙ্গত নহে; কারণ, এখন তাঁহাদের পুত্রগণ উপার্জ্জন-

ক্ষম হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। বহু অনাথা দরিদ্রা ভদ্রঘরের বিধবা শ্যামাচরণ ও তাঁহার মমতাময়ী পত্নীর নিকট মাসিক সাহায্য পাইতেন।

শ্যামাচরণের দান কখনও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রার্থীর সংখ্যা যখন যেমন হইত তাঁহার দান কার্য্যও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। অনেক সময় তাঁহার দান গোপন থাকিত। দাতা ও গৃহীতা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি এই দানের সংবাদ জানিতে পারিত না। শ্যামাচরণ নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, কাজেই তাহার দান-কথা গৃহীতার মুখ হইতে প্রকাশিত না হইলে তাহা অনেক সময় জানিবার কোন উপায়ই ছিল না। কোন কোন গৃহীতার মুখ হইতে লেখক শ্যামাচরণের দানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়াই আজ শ্যামাচরণের নিঃস্বার্থ দানের কথা প্রকাশ পাইতেছে।

কোন এক সময়ে একজন ব্রাহ্মণ বিশেষ বিপন্ন হইয়া শ্যামাচরণের সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে দান গ্রহণ করিলে তাঁহাকে সামাজিক লাঞ্ছনা

সহ্য করিতে হইবে। অথচ তিনি এমন বিপন্ন যে, শ্যামাচরণের ন্যায় মহৎ হৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। শ্যামাচরণ মানীর মান রক্ষা করিতে জানিতেন। আধুনিক কালাপাহাড়ী মত বা অসার দম্ভ তাঁহার মত ব্যক্তিকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিত না। সুতরাং শ্যামাচরণ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া টালার পুলের ধারে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন।

শ্যামাচরণ তাঁহার কোনও বিশ্বাসভাজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়া গোপনে বলিয়া দেন, তিনি যেন টালার পোলের ধারে গিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে টাকাটা অর্পণ করেন: ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী মনিবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরও এইরূপ দান গ্রহণ করিয়া সমাজের কাছে জবাবদিহি করিতে হয় নাই। এই শ্রেণীর গোপন দান শ্যাঁমাচরণের জীবনে বহুবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কোনও ইতিহাসে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে না।

শ্যামাচরণের প্রকাশ্য দানের অনেক কথাও এখন বহুলোকের স্মৃতিপথ হইতে হয়ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের কথা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবিদিত নাই; কিন্তু উহার প্রথম প্রতিষ্ঠার কাহিনী এ যুগের অনেক লোকই হয় ত অবগত নহেন। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর প্রথমতঃ ছাত্রগণকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল ও হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা কল্পে চেষ্টা করেন। বাঙ্গালাভাষায় এলোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ডাক্তার আর, জি, কর বাঙ্গালীর সাহায্যে এই চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সাধু-সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদানীন্তন কালের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক জগদ্বন্ধু বসুও এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু বসিরহাট মহকুমার দণ্ডির হাট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কলি-কাতায় তখন তাঁহার প্রভূত যশঃ। ডাক্তার কর ও ডাক্তার বসু যে সাধু প্রচেষ্টা লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছিল।

তাঁহারা জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী কি জানেন যে, নিরক্ষর শ্যামা-চরণ বল্লভই এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম সাহায্যকারী? কারমাইকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাভূমিতে আর, জি করের স্থাপিত চিকিৎসাগার যে প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস লিখিত হইতেছে; কিন্তু নীরব দাতা শ্যামাচরণকে সেই ইতিহাসের অঙ্গীভূত করিয়া লইলে দেশবাসী যে, শুধু কর্ত্তব্যপালন করিবেন তাহা নহে, প্রকৃত গুণীর সমাদর করিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারিবেন।

ডাক্তার জগদ্বন্ধু শ্যামাচরণের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। উভয়ে একই মহকুমার অধিবাসী। উভয়েই বঙ্গ-জননীর কৃতিসন্তান। জগদ্বন্ধু জানিতেন যে, শ্যামা-চরণের হৃদয় অতি মহৎ এবং উদার। তাই তিনি

ডাক্তার করকে সঙ্গে লইয়া বন্ধু শ্যামাচরণের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া শ্যামাচরণ তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

ডাক্তার জগদ্বন্ধু ও ডাক্তার কর তখন তাঁহাদের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বাঙ্গালীর অর্থ, বাঙ্গালীর চেষ্টা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে এইরূপ একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিলে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল হইবে, বাঙ্গালী যে শুধু বচন-সর্ব্বস্ব নহে, তাহারা কাজ করিতে পারে, দেশ ও দশের কাছে তাহা প্রমাণিত হইবে। তাই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মবীর শ্যামাচরণের কাছেই সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইয়াছেন। শ্যামাচরণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে কত টাকা দিতে হইবে, তাহা জানিতে পারিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন। উভয় ডাক্তার তাঁহার কাছে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আশা করেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্যামাচরণ জানিতে চাহেন, আর কে কে কত টাকা দিয়াছেন? তাহাতে ডাক্তার কর বলেন যে, তাঁহারা এখনও আর কাহারও

কাছে যান নাই—সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্মীর স্বনামধন্য বরপুত্রের কাছেই আসিয়াছেন।

শ্যামাচরণ তখনই তাঁহার কম্বুলীটোলার গদি হইতে টাকা আনিবার জন্য জনৈক কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। টাকা আসিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার এই সামান্য সাহায্যের কথা যেন প্রকাশ না পায়। খাতায় যেন জনৈক সাহায্যকারী বলিয়া ৫ হাজার টাকা জমা করিয়া লওয়া হয়। শ্যামাচরণ ঘুণাক্ষরেও জনসমাজে আপনাকে প্রচারিত করিতে চাহিতেন না। এখন সেই বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! সামান্য কোন কার্য্য করিলে তাহা বিঘোষিত করিবার জন্য যশোলুব্ধ বাঙ্গালীর কি বিপুল প্রচেষ্টা!

ডাক্তার জগদ্বন্ধু তখন শ্যামাচরণকে জানাইলেন যে, তাঁহারা তাঁহার কাছে আরও কিছু সাহায্য চাহেন। মেডিক্যাল স্কুল ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিবার জন্য তাঁহারা যে স্থান মনোনীত করিয়াছেন, সেই জমী শ্যামাচরণের। ঐ জমী স্কুল ও হাঁসপাতালের জন্য

ছাড়িয়া দিতে হইবে। তবে ঐ জমী তাঁহারা বিনামূল্যে লইবেন না। দাম দিবেন, তবে ক্রমান্বয়ে ৪ বৎসরে মূল্যটি লইতে হইবে।

শ্যামাচরণ দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, জমী তাঁহার একার নহে। যৌথ কারবারের অংশীরাও উহার মালিক। নহিলে তিনি উহার মূল্যও গ্রহণ করিতেন না। তবে তিনি ঐ জমী যে দরে ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই দরেই তাহা বিক্রয় করিবেন। অধিকমূল্য গ্রহণ করিবেন না। জমীর উপর যে সকল গুদাম ঘর রহিয়াছে, তাহাও তিনি নিজ ব্যয়ে উঠাইয়া লইবেন। সেজন্য ডাক্তার করকে অর্থব্যয় করিতে হইবে না। সমস্ত জমীর মূল্য ৪ বৎসরের পরিবর্ত্তে তিনি ৬ বৎসরে লইবেন।

ডাক্তার কর ও ডাক্তার জগদ্বন্ধু শ্যামাচরণের কাছে এতদূর আশা করেন নাই। তাঁহার উদারতা দর্শনে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণ মেডিক্যাল স্কুলের জন্য ভবিষ্যতে আরও সাহায্য করিবার ইচ্ছা

জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদিগের হাহাকার তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। দুর্ভিক্ষের অবসানের পর তিনি তাঁহাদিগকে আরও কিছু অর্থ প্রদান করিবেন।

ডাক্তার যুগল তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ দমন-কল্পে দণ্ডায়মান হওয়া অসম সাহসিকের কর্ম্ম। ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় হইবে। ভবিষ্যতের জন্য কি তিনি কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইবেন না? উত্তরে শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন যে, নারিকেল গাছে সব নারিকেল ঝুনা করিলে গাছ শক্তিহীন হয়।

শ্যামাচরণ তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ আরও অর্থ স্কুলের জন্য ব্যয় করিতে পারিতেন; কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে দেড়লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তাহার পর বৎসর মাতৃদেবীর মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় আড়াইলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার

কয়েকদিন পরেই এই মহনীয় জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ আবির্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সে সঙ্কল্প আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

বাঙ্গালার বহু প্রতিষ্ঠান—কল্যাণকর অনুষ্ঠানে শ্যামাচরণের দান ছিল। কিন্তু কখনও তিনি নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহার ধন-ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করেন নাই। অতিগোপনে, নেপথ্যে তাঁহার দান-কার্য্য সমাপ্ত হইত। দেশের মধ্যে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার সহিত শ্যামাচরণের ধনভাণ্ডারের কোন যোগ ছিল না। তাঁহার প্রভিপায় ছিল না যে, তাঁহার নাম প্রকাশ পায়, এজন্য সে সকল শুভ-প্রচেষ্টার নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিব না। তাঁহার ব্যক্তিগত হিসাবের খাতা দৃষ্টে অনেক দানের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেগুলি আপাততঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল। তবে যাঁহার অগোচরে এই বিশ্বে কোন কার্য্য বা চিন্তা থাকিতে পারে না, সেই বাক্যাতীত, চিন্তাতীত বিশ্ব-নয়ন্তার হিসাবের খাতায় তাহা জমা হইয়া রহিল।

মনুষ্য সমাজে প্রকারান্তরে তাহার প্রভাব অনন্তকালের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গালাদেশে কন্যাদায়-গ্রস্ত লোকের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। যে দেশে কন্যাদান মহৎ-পুণ্যের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, অর্থ-নীতিক সমস্যার চাপে, বিকৃত-শিক্ষা ও বিকৃত-মনোবৃত্তির ফলে সেই বাঙ্গালী ইদানীং বাঙ্গালার চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া চলিয়াছে। তাই এ দেশে স্নেহলতা কেরোসি-নের অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করে, তাই ঘরে ঘরে কন্যা-দায়ের সমাধানহীন সমস্যার ঘূর্ণিপাকে ভদ্র-গৃহস্থ পরিবার ডুবিয়া মরিতেছে। পল্লী-প্রাঙ্গণের আকাশ ও বাতাস অশ্রুসিক্ত-দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

শ্যামাচরণ এমন কন্যাদায়-গ্রস্ত বহু পরিবারের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন। কত পিতামাতাকে দুর্দ্দশার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কার্য্য অতি গোপনে সমাধা করা হইত। বাহিরের লোক জানিতেই পারিত না, আভাস পর্য্যন্ত পাইত না।

শ্যামাচরণ কত নিঃসম্বল পিতামাতার মুখে যে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেও তাঁহাকে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী দাতার ধনভাণ্ডার কখনও সৎকার্য্যে দান করার ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় না, বরং সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পিতৃমাতৃ-দায়গ্রস্ত হইয়া যাহারা শ্যামাচরণের কাছে সাহায্য-প্রার্থী হইত তাহাদিগকে তিনি কখনও পর্য্যাপ্ত সাহায্য দানে বিরত হন নাই। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দাতার নাম যাহাতে প্রকাশিত না হয়, সে প্রতিশ্রুতি তিনি গৃহীতার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন।

তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে কেহ সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। তাঁহার দানের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। জাতিধর্ম্ম বা বর্ণ বিচার করিয়া তিনি কখনও দান করিতেন না। এ সকল বিষয়ে তাঁহার সার্ব্বজনীনতা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইত। দাতা দুই শ্রেণীর আছে। একশ্রেণীর দাতা, দান

কার্য্যের পশ্চাতে যে নামের মহিমা থাকে, তাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া দান করিয়া থাকে; দ্বিতীয় শ্রেণীর দাতা, দানের জন্য অর্থ বিলাইয়া আনন্দ লাভ করে—অন্যের মুখে হাসি, সুখ ও সন্তোষের আলো দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে। শ্যামাচরণ শেষোক্ত শ্রেণীর দাতা ছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

"যত্র জীব তত্র শিব"

'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। 'যত্র জীব তত্র শিব' ইহা শুধু ভারতবর্ষেই প্রথম বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক হিন্দু আবহমানকাল হইতে এই বাণী শুনিয়া আসিতেছে তাই ভারতবর্ষে কখনও ভিখারীকে বিমুখ হইতে হয় না।

জন্মগত অধিকার হিসাবে শ্যামাচরণ এই মনোবৃত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাই নিঃসম্পর্কীয় নরনারীর দুঃখ কষ্টে তিনি তীব্র মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেন। অন্নজল জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন মানুষ উহার অভাব অনুভব করিতেছে, ইহা জানিতে পারিলে তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও তাহার সেই কষ্ট দূর করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

ইংরাজী ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দ, বাঙ্গালা ১৩০৩-১৩০৪ সালে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত

আশাসুনি, পাইকগাছা, কালীগঞ্জ থানার অধিকারভুক্ত গ্রাম সমূহে দুর্ভিক্ষের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল। এই ভীষণ লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের ইতিহাস গবর্ণমেণ্টের রচিত বিবরণে লিখিত আছে।

উল্লিখিত গ্রাম সমূহে দুর্ভিক্ষের হাহাকার সমুত্থিত হইবার পূর্ব্বে, তিন বৎসর ধরিয়া অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রকোপে শস্য সম্ভার বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম বৎসর অতিবৃষ্টির ফলে শস্যহানি ঘটে; দ্বিতীয় বৎসর আকাশ নির্ম্মম ও নিষ্ঠুরের ন্যায় বর্ষণে ক্ষান্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে প্রচণ্ড উত্তাপে ক্ষেত্রের শস্যসম্ভার শুকাইয়া যায়; তৃতীয় বৎসরে প্রচুর বর্ষণে অনেক শস্যহানি ঘটে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত এতদঞ্চলের নরনারী তিন বৎসরের আকালের মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সঞ্চিত ধান্য দ্বিতীয় বৎসরের অনাবৃষ্টির ফলে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় বৎসরের শস্যের অবস্থা দেখিয়া নৈরাশ্যভরে নরনারী হাহাকার করিয়া উঠিল। সুজলা সুফলা বাঙ্গালাদেশ—যাহার দুধের

নদীতে বন্যা বহিয়া যায়, যাহার ধানের ক্ষেতে স্বর্ণ প্রসব করে, যাহার গাছে ফল, নদীতে, জলাশয়ে শান্ত, স্নিগ্ধ সুমিষ্ট পানীয় জল, প্রবাদ বাক্যের মত ইতিহাসের পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর কি নিতান্তই ভাগ্যহীনতার ফলস্বরূপ নহে ?

দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানের নরনারীরা প্রথমে সঞ্চিত ধান্য, পরে তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া কোন রূপে দগ্ধোদর পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিল। ক্রমে তাহাও যখন ফুরাইয়া গেল, তখন, অর্দ্ধাশন, অনশন,—দরিদ্র বাঙ্গালীর যাহা নিত্য সম্বল তাহারই অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। ক্ষুধার প্রচণ্ড জ্বালার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ক্রমশঃ গগনভেদী হাহাকারে রূপান্তরিত হইল। মৃত্যুর করাল বিভীষিকা চারিদিকে নৃত্য করিয়া ফিরিতে লাগিল।

উদরের জ্বালায় স্থানীয় লোকজন চারিদিকে ছুটিয়া বাহির হইল। অন্ন কোথায় তাহার সন্ধানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সমর্থগণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার ফলে, জনপূর্ণ স্থানগুলি

ক্রমশঃ জনহীন এবং শ্বাপদগণের লীলাভূমি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। ক্ষুধার তাড়নায় অনেকে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রুগ্ন, অভুক্ত সন্তান ক্রোড়ে করিয়া পরিত্যক্তা নারীরা ভিক্ষায় বাহির হইল। কিন্তু ভিক্ষা দিবে কে? সকলেই যে ভিক্ষার্থী!

ঐ সকল অঞ্চলের ধনী জমীদার, দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। কাহারও হৃদয় এই বিভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রশমন কল্পে বিন্দুমাত্র আলোড়িত হইল না। সুখসেব্য পর্য্যঙ্কে ধনীর দুলাল, অনায়াসে প্রচুর উপাদেয় ভোজ্য গলাধঃকরণ করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। আর্ত্ত, পীড়িত ক্ষুধার্ত্তের করুণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্ম্মে আঘাত করিল না। দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীকে বাঁচাইবার জন্য কাহারও ব্যগ্র বাহু প্রসারিত হইল না, কোনও হৃদয় আলোড়িত হইল না। দরিদ্রের দুঃখ বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানবকে প্রায়ই বিচলিত করে না, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ইহার পূর্ব্বাভাস এই

দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে প্রকাশ পাইয়াছিল। যাঁহাদের জমীদারীর অন্তর্গত স্থানে এই দুর্ভিক্ষ-দানব তাহার জয়পতাকা উড়াইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, তাঁহারা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে এই সংহার-লীলা দেখিতে লাগিলেন।

দুর্ভিক্ষের দ্বারা অধ্যুষিত গ্রাম সমূহে তখনও যে সকল নরনারী উপায়ান্তর না দেখিয়া ভিটার মাটী আঁকড়িয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দলে দলে বসিরহাট মহকুমায় আগমন করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী কোনপ্রকার কার্য্য অবলম্বন করিয়া তাহারা কোনমতে দিনপাত করিবে। কিন্তু এতগুলি লোকের অন্ন সংস্থানের উপযোগী কাজ মিলা কঠিন। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহারা দেখিতে পাইল, এই অঞ্চলের অন্যান্য ধনীর তুলনায় শ্যামাচরণের গৃহদ্বার সদাই উন্মুক্ত। সেখানে গেলে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না। তণ্ডুল ও পয়সা ব্যতীত বস্ত্রহীনের বস্ত্রলাভও ঘটিয়া থাকে। এই সংবাদ লোকমুখে

ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী দলে দলে শ্যামাচরণের ধান্যকুড়িয়া ভবনে সমবেত হইতে লাগিল।

কলিকাতায় শ্যামাচরণের কাছে সংবাদ গেল, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার গৃহদ্বার হইতে একজনও যেন শুধুহাতে ফিরিয়া না যায়। যতই তাঁহার দান বাড়িতে লাগিল, ভিক্ষার্থীর সংখ্যা ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় শ্যামাচরণ কি ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, বোধহয় তাহার পরীক্ষার জন্যই বিশ্বেশ্বরের এই আয়োজন!

প্রত্যহই লোকসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তণ্ডুল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের জন্য কিছু পয়সা প্রত্যেক জনকে বিতরিত হইতেছিল। ক্রমে ভিক্ষার্থীর সংখ্যা এরূপ বাড়িয়া গেল যে, জনপ্রতি একপোয়া চাউল দিয়াও প্রত্যহ তের-চৌদ্দ মণ চাউল খরচ হইতে লাগিল।

যতই দিন যাইতে লাগিল, অনাহারক্লিষ্ট অস্থিচর্ম্ম-সার নরনারীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শ্যামা-

চরণ তখন কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিয়া ধান্যকুড়িয়ায় আগমন করিলেন। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্বয়ং তাহাদের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অনাহারের এ কি ভীষণ রূপ! দুর্ভিক্ষের এ কি প্রচণ্ড প্রকোপ!

তিনি দেখিলেন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেণী ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক আছে। হিন্দু, মুসলমান—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র পোদ, নাপিত, গোয়ালা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু, সকল প্রকার নরনারী তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার দ্বারে সমাগত। মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, আভিজাত্য—দুর্ভিক্ষের কঠোর পেষণে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুধু ক্ষুধা, উদরের তীব্র জ্বালা নিবারণের জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া সকলে ছুটিয়া আসিতেছে।

তিনি দেখিলেন, এমনভাবে প্রত্যহ তণ্ডুল বিতরণ করিয়া ইহাদিগকে সাহায্য করিলে সুবিধা হইবে না। কারণ, এইভাবে প্রত্যহ তণ্ডুল বিতরণ করা অসম্ভব।

বিশেষতঃ অনেক সময় কেহ হয়ত দুইবার পাইল, কেহ হয়ত সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতই হইল। ভিক্ষালাভের জন্য স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইত, তাহাতে স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষা হয় না, দুর্ব্বল নিপীড়িত হয়। এ সকল অত্যাচার সকল সময়ে নিবারণ করাও সম্ভবপর নহে।

তাহা ছাড়া ভিক্ষালাভের পর দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীরা সকল সময় তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে অপেক্ষা করিয়া থাকে। সুবিধামত স্থান দেখিয়া ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া লইয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লয়। মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া স্থানটিকে দুর্গন্ধময় ও অপরিষ্কৃত করে। প্রখর রৌদ্র অথবা বৃষ্টির সময় তাঁহার বাড়ীর বারাণ্ডার নিম্নে আশ্রয় লয়, সময় সময় তাঁহার মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বারাণ্ডার উপর মলমূত্রও পরিত্যাগ করিয়া যায়।

অবশ্য এ সকল অনাচারের প্রতীকার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তিনি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক

তাড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু মহাপ্রাণ শ্যামাচরণ তাহাদিগের অসহায় অবস্থার কথা বুঝিয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে তাহাদের এ সকল অনাচার সহ্য করিতেন। উহারা তাঁহারই সাহায্যপ্রার্থী হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার কোন কোন বন্ধুবান্ধব উহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামাচরণ উত্তরে বলেন যে, উহারা বিতাড়িত হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। সেখানে গিয়াও ঠিক এইভাবেই জীবন যাপন করিবে। উহারা মানুষ, সুতরাং মানুষের আবাস স্থানেই উহারা থাকিবে। কাজেই যেখানেই যাউক না কেন, সেখানেও অনুরূপ ভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে। তত্রত্য অধিবাসীরাও এজন্য বিব্রত ও বিরক্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া কোন লাভ নাই।

লোক সংখ্যা—প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে দেখিয়া শ্যামাচরণ চিন্তিত হইলেন। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিমূঢ় হইয়াছিল। এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল দুর্ভিক্ষ

পীড়িত নরনারীর প্রকৃত হিতসাধন করা যায়, তিনি তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রতিদিন চাউল ও পয়সা বিতরণ করিলেই সকলে যে, রন্ধনাদি করিয়া লইবার সুবিধা পাইবে তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এমন একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে এই সকল নরনারী উদর পূর্ত্তি করিয়া প্রত্যহ অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে পারে। তাহা হইলে প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে, রন্ধনের যোগাড় করিবার নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে না।

শ্যামাচরণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তণ্ডুল প্রাপ্ত হইয়াও অনেকে, কাষ্ঠ লবণ, রন্ধনের হাঁড়ি প্রভৃতি কোন না কোন বিষয়ের অভাবে সকল দিন অন্নাহার করিতে পাইত না। সুতরাং একটা বিরাট অতিথিশালা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মানসপটে সমুদিত হইল।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটা বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল। শ্যামাচরণ সেই মুক্ত প্রান্তরে অনেক-

গুলি বৃহদাকার গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এ বিষয়ে তিনি সহধর্ম্মিণী দাক্ষায়ণীর নিকট পরামর্শ ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। মমতাময়ী, উদার-হৃদয়া দাক্ষায়ণী এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিতা হইয়াছিলেন। তিনিও স্বামীর ন্যায় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, এই সকল ভাগ্যহত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীর প্রতি কেহ যেন কোনরূপ অনাচারের অনুষ্ঠান না করিতে পারে। তিনি প্রত্যহ এই সকল ভিক্ষুকের অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তারপর নিজে অন্ন গ্রহণ করিতেন।

শ্যামাচরণের জননীও এ বিষয়ে পুত্রকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নর-নারীর হাহাকার তাঁহার প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি কৃতিপুত্রকে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য সমধিক উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, নারী অনেক সময় পুরুষের সহায়। নারী যেখানে পুরুষের পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া কর্ম্ম-শক্তিতে পুরুষকে প্রবল করিয়া তুলেন, সেই পুরুষের পক্ষে তখন অসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইয়া উঠে।

মাতা ও পত্নীর নিকট হইতে উৎসাহ, সমবেদনা ও উত্তেজনা প্রাপ্ত হইয়া শ্যামাচরণের কর্ম্মশক্তি উদগ্র হইয়া উঠিল। তিনি কায়মনোবাক্যে বিরাট কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। চিরসুন্দরের বংশীরব তাঁহার কাণের মধ্য দিয়া মর্ম্মের তারে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহার মহান, মধুর সুর-তরঙ্গ বাহিরে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। যত্র জীব তত্র শিব—জীবের দুঃখ, মানবের প্রতি সমবেদনা, ব্যথা করুণা, নর-নারীর ক্ষুধিত, অনাহারক্লিষ্ট সহস্র সহস্র আর্ত্তের সেবার জন্য শ্যামাচরণের হৃদয় সঙ্কল্পে অটল হইয়া উঠিল। অনন্ত সুন্দরের বংশীরব অনন্তবিশ্বে শুধু এই ধ্বনি তুলিয়াই মানব-মণ্ডলীকে বিশ্বহিতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য অনুক্ষণ আহ্বান করিতেছে। যাহারা ভাগ্যবান্, যাহারা মহৎ শুধু তাহারাই এই চিরন্তন সঙ্গীত তরঙ্গের মধুর ধ্বনি শুনিতে পায়।

বাস্তবিক দিন দিন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর-নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাদের নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব যে ভাবে সম্মুখে উপস্থিত হইতেছিল, তাহাতে যে কোন অসীম শক্তিসম্পন্ন মানুষকেও বিহ্বল করিয়া তুলে। সকলের অন্নবস্ত্র ও পীড়ার দুঃখ নিবারণ করিবার চেষ্টা যে অত্যন্ত দুঃসাহসের দ্যোতক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শুধু অন্নদান করিলেই চলিবে না। অনেকে পীড়িত, অসংখ্য লোক বস্ত্রহীন। মাতৃত্বের পর্য্যায়ে অনেক নারী পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ আসন্ন-প্রসবা। তাহাদিগের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। এই সকল আশ্রয়হীনা নারীর জন্য আশ্রয়স্থানের নির্দ্দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন। জাতিগত বা বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য যাহারা বজায় রাখিতে চাহে, তাহাদিগের সে মনোবৃত্তি যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার বন্দোবস্ত করা অনিবার্য্য-রূপে প্রয়োজন।

কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠোর এবং গুরু। সমস্ত বিষয়ই একবার উত্তমরূপে মনে মনে আলোচনা করিয়া লইয়া

উৎসাহী কর্ম্মবীর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এ কর্ম্ম সুশৃঙ্খলে অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে। জীবনের এই কঠোরতম পরীক্ষায় বিফল-মনোরথ হইলে চলিবে না। মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে।

শ্যামাচরণের সাধু উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা দর্শনে যৌথ-কারবারের অন্যান্য অংশী, উপেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতিও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারাও তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক-খানি প্রদীপ্ত অঙ্গার শতসহস্র অঙ্গারকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে, এই সত্য বিশ্বে নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সকলের নিকট হইতে উৎসাহবাণী শ্রবণ করিয়া শ্যামাচরণের কর্ম্মশক্তি আরও প্রবল হইয়া উঠিল। রন্ধনশালার যুগল গৃহ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। একখানিতে ব্রাহ্মণ পাচক অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। অপরটিতে মুসলমান পাচক আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। পাছে কোন পক্ষের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়, তজ্জন্য উভয় সম্প্রদায়ের

৫-১৩

নরনারীর জন্য পৃথক বন্দোবস্ত হইল। সে ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল।

স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের জন্যও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। এক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান নারী স্ব স্ব মনোবৃত্তি ও ভাবধারা অনুসারে যাহাতে বিনা দ্বিধায় চলিতে পারে, তাহার জন্য শ্যামাচরণ অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি করিলেন না। যেখানে নারীরা ভোজন করিবে বা বিশ্রাম লইবে, তথায় যাহাতে পুরুষের প্রবেশাধিকার আদৌ না ঘটিতে পারে, শ্যামাচরণ সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন।

নারীদিগের আহার স্থান এমন ভাবে আবৃত করিয়া দিলেন যে, তাহাদের ভোজনকালে কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। তারপর যে যাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতি অনুসারে যাহাতে ভোজনকালে কোনপ্রকার অসুবিধা বোধ করিতে না পারে তাহারও

সুচারু বন্দোবস্ত হইল। এজন্য অনেকগুলি স্বতন্ত্র গৃহও নির্ম্মিত হইল।

এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার পালনের ব্যবস্থা করিয়া শ্যামাচরণ অতিথিশালার দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। আহারের সঙ্গে সঙ্গে শয়নের ব্যবস্থাও হইল। গোলপাতার গৃহ সমূহ মুক্তপ্রান্তরে নির্ম্মিত হইল। স্ত্রীলোকগণ যাহাতে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া আশ্রয়গৃহে স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বপ্রকার অনাচারের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী দ্বারবান সমূহ কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

যে সকল ব্যক্তি সপরিবারে শ্যামাচরণের অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। আহার ও আশ্রয়স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া শ্যামাচরণ সকলের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, পীড়া হইলে যাহাতে সুচিকিৎসা হয়, এ নিমিত্ত উপেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুযোগ্য চিকিৎসককে নিযুক্ত হইলেন।

সকল প্রকার ব্যবস্থা হইয়া গেলে উপেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই বিরাট অতিথিশালার পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন। দরিদ্র নারায়ণের সেবায় শ্যামাচরণ যে বৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, উপেন্দ্রনাথ তাহাকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করায় শ্যামাচরণও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কারণ, যৌথ কারবার পরিচালনের সমগ্র ভার শ্যামাচরণের স্কন্ধে ছিল। সেজন্য বৎসরের অধিকাংশ ভাগ তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইত।

উপেন্দ্রনাথকে শ্যামাচরণ তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, উপেন্দ্রনাথ কার্য্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যযজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিবে না। দরিদ্রনারায়ণের সেবার কার্য্য যথোপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইবে।

এই বিরাট অন্নদান, আশ্রয়দান এবং আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবার কার্য্য ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, বাঙ্গালা ১৩০৩ সালের কার্ত্তিকমাসে আরব্ধ হইয়াছিল। ১৮৯৭

খৃষ্টাব্দ, বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১৯শে মাঘ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী এই অতিথিশালায় আশ্রয় পাইয়া জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

সূচনার প্রথম দুইমাস এই অতিথিশালায় প্রত্যহ একসহস্র লোক আহার করিত। পরে ৩ হইতে ৪ সহস্র লোক পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবেলা করিয়া এখানে আহার্য্য পাইত। উপেন্দ্রনাথ এরূপ শৃঙ্খলার সহিত এই কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন যে, কোনদিনও সামান্যরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত অন্নদান কার্য্য চলিতে থাকিত। এই সময়ের মধ্যে যে যখন আহারার্থ উপস্থিত হইত, পরিতোষ সহকারে তাহার ভোজন কার্য্য সমাধা হইত।

শ্যামাচরণ এই দানসত্রে কদর্য্য তণ্ডুল অথবা ডাল তরকারী ব্যবহার হইতে দেন নাই। শ্যামাচরণ নিজে সপরিবারে যে তণ্ডুলের অন্ন ব্যবহার করিতেন

দরিদ্রনারায়ণগণের জন্যও সেই তণ্ডুল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অপকৃষ্ট অথবা অল্প-মূল্যের জঘন্য চাউল ব্যবহার করিবার অনুমোদন আদৌ ছিল না। হিসাবের খাতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায়, পাইকারি হিসাবে বেলিয়াঘাটার কালীশঙ্কর তারকনাথের আড়ত হইতে ৪৸৶১০ হিসাবে উৎকৃষ্ট বালাম চাউল প্রথম দফায় ৬০/০ মণ ক্রয় করা হইয়াছিল। সে যুগে ঐ দরই অত্যন্ত অধিক বলিয়া জনসাধারণ মনে করিত। সে যুগে সাধারণ চাউলের দাম মন করা ৩৷৹ হইতে ৪৲ টাকা ছিল।

সেই দুর্ভিক্ষের যুগে উৎকৃষ্ট বিউলি ও খাঁড়ি মসুরী ৪।০ সওয়া চারি টাকা মণ হিসাবে বিক্রীত হইত। অতিথিশালার নষ্টপ্রায় হিসাবের খাতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ঐ দামেই অতিথিশালার জন্য ডাইল খরিদ করা হইয়াছিল। কলিকাতার সেরেস্তার কাগজপত্রে চাউল ডাইল ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের হিসাব পাওয়া যায় না। সুতরাং এই গ্রন্থে দুর্ভিক্ষ বাবদ অন্যান্য বিষয়ের হিসাব তুলিয়া দিবার সুবিধা হইল না।

শ্যামাচরণ সাধ্যানুসারে শুধু অনশন-ক্লিষ্ট নর-নারীর অন্ন ও বস্ত্রাভাব দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই সে কথা বলিয়াছি। তিনি সন্তান-সম্ভবা জননীদিগের সুপ্রসবের ব্যবস্থাও করিয়াদিয়াছিলেন। সেজন্য যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন। অতিথিশালায় অবস্থানকালে যে সকল রোগী সু-চিকিৎসা সত্ত্বেও মৃত্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যয় ও তাহাদের আত্মীয়গণের সামান্যরূপ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া শুদ্ধ হইবার ব্যয়ভারও তিনি বহন করিয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপে অনেক ভদ্র-গৃহস্থ পরিবারও শ্যামাচরণের আশ্রয়লাভের আশায়, নিকটস্থ অধিবাসী-দিগের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সামাজিক লজ্জা এবং লোকাচারের জন্য পুরুষরা অথবা মহিলাগণ অতিথিশালায় আসিয়া দান গ্রহণে নিদারুণ কুণ্ঠা অনুভব করিতেন, ইহা বুঝিয়া শ্যামাচরণ তাঁহাদের জন্য প্রত্যহ সিধা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের জন্য দুগ্ধ, বার্লি, সাগু প্রভৃতির

বন্দোবস্ত করিতে শ্যামাচরণ বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে এমন ভাবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান লেখকও অন্যতম। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ব্যাপার স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। যদি ভাগ্যবিড়ম্বিতা বঙ্গমাতার কোন সন্তান না হইয়া শ্যামাচরণ য়ুরোপের কোন সভ্যতালোক-প্রাপ্ত সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া এইভাবে দরিদ্রনারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বে তাঁহার নাম পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইত। এতদিনের মধ্যে শত শত গ্রন্থ তাঁহার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়া শ্যামাচরণের মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি নগরে নগরে প্রতিষ্ঠিত হইত।

স্বগ্রামে—ধান্যকুড়িয়ায় শ্যামাচরণ এই ভাবে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারীকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই স্থান ব্যতীত অন্যত্রও শ্যামাচরণের বাহু আর্ত্ত, ক্ষুধাপ্রপীড়িত নরনারীর জন্য প্রসৃত হইয়াছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু

মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, "মাসিক বসুমতী" সম্পাদক, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা-গ্রজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, শ্যামাচরণ খুল্না জেলার নিদারুণ দুর্ভিক্ষ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ পরম্পরায় বিশ্বস্ত ভাবে অবগত হইয়াছিলেন যে, খুলনা জেলার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানের বহু ভদ্র পরিবার নিরন্ন অবস্থায় মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। পিতৃপিতামহের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অন্যত্র গমনের সুবিধা এবং উপায় নাই। সাহায্যের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইবার শক্তি এবং প্রবৃত্তি না থাকায়, তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়া বসিয়া আছেন।

মহাপ্রাণ শ্যামাচরণ এই সংবাদ শ্রবণে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস বায়ুমণ্ডলকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। বঙ্গমাতার সন্তান হইয়া তিনি এতগুলি নরনারীকে নীরবে মৃত্যুর করাল

গ্রাসে পতিত হইতে দিতে পারেন না। শ্যামাচরণের অন্তর্নিহিত দেবতা পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য প্রেরণ করিলেন।

শ্যামাচরণের নির্দ্দেশ মত, প্রেরিত কর্ম্মচারীরা খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল পরিবার প্রকাশ্য দিবালোকে দান গ্রহণ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের ভবনে রাত্রিযোগে আহার্য্যদ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল।

তিনি জানিতেন, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন অনেক ভদ্রপরিবার এরূপভাবে সাহায্য অথবা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। তাই তিনি কর্ম্মচারীদিগকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা দান লইতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা ঋণ স্বরূপ আহার্য্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে পারেন। যখন তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইবেন, তখন দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিলেই চলিবে।

এ প্রস্তাবে কোনও ভদ্র পরিবারের আপত্তি রহিল না। তাঁহারা ঋণ স্বরূপ চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ, বস্ত্র প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ নৌকা বোঝাই করিয়া প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যই প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইভাবে দ্রব্যাদি লইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবারের জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের নামে কর্ম্মচারীরা হিসাব রাখিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের কাহাকেও সে ঋণ শোধ করিতেও হয় নাই—আজ পর্য্যন্ত কেহ সে বিষয়ে তাগাদা করিতেও যায় নাই। দানের এই বিচিত্র ব্যবস্থা শ্যামাচরণের দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছিল। সেই সময়ের হিসাবের খাতাও এখন আর বিদ্যমান নাই। যে জন্য উহার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তির পর হিসাব পত্রের খাতাও অন্তর্হিত হইয়াছিল।

শ্যামাচরণ যদি সে সময় মূর্ত্তিমতী করুণার রূপ ধরিয়া দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ না

হইতেন, তাহা হইলে কত লোক যে অনশন ক্লেশে মৃত্যুপথের যাত্রী হইত তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালী এজন্য শ্যামাচরণের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে এই পরহিতে নিবেদিতপ্রাণ মানুষটির স্মৃতি মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া ধন্য হইবে।

শ্যামাচরণ যখন যৌথ কারবার হইতে লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে বিপন্ন নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন, সেই সময় কারবারের অংশীরা ব্যয়াধিক্য দেখিয়া মনে মনে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কেহ কেহ প্রকাশ্য ভাবে এই প্রকার ব্যয়ের বিরুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অংশীদিগের এই প্রকার মনোভাব অবগত হইয়া শ্যামাচরণ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

নামের জন্য, প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি কোনদিন বিন্দুমাত্র আগ্রহ অন্তরের কোনও কোণে পোষণ করিতেন না। যে কার্য্যকে তিনি মনুষ্যের অবশ্য-

পালনীয় কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, যৌথ কারবারের সকলেই যাহাতে সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশপথে অগ্রসর হইতে পারেন, এই কথা মনে করিয়াই তিনি যৌথ কারবার হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রশমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। যদি তাঁহার পরম প্রিয় আত্মীয় ও শিষ্যস্থানীয়গণ সেই পুণ্য কর্ম্মে আগ্রহান্বিত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি কখনই কর্ত্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না।

শ্যামাচরণ তখন দৃঢ়তার সহিত সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত একাকী এই বিপুল কর্ম্মভার বহন করিবেন। অনশনক্লিষ্ট নরনারীগণকে আশ্রয় দিয়া তিনি কখনই অর্থ ব্যয়ের আশঙ্কায় মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবেন না। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থের এক কপর্দ্দক অবশিষ্ট থাকিতে তাহা তিনি এই মহৎ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, কাহারও অনুগ্রহ কামনা করেন না। আপনার চরণে ভর দিয়া তিনি কারবার-

টিকে বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অংশের সমস্ত অর্থই তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে ব্যয় করিতে থাকিবেন। ভগবান তাঁহার সহায়।

বীর শ্যামাচরণের এই দৃঢ়সঙ্কল্প ও তেজোগর্ভ উক্তি শ্রবণ করিয়া অংশিগণের মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভাল বাসিতেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তখন তাঁহারা নীরবে শ্যামাচরণের কার্য্যে, উৎসাহভরে আবার যোগ দিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবা পূর্ণোৎসাহে চলিতে লাগিল, সমগ্র মহকুমা শ্যামাচরণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়স্তম্ভিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। সৎচাষী সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত, বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিবর্জ্জিত ব্যবসায়ী শ্যামাচরণ এ কি অপূর্ব্ব মনুষ্যত্বের দ্যোতক কার্য্য সম্পাদিত করিতেছেন!

শ্যামাচরণ কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে মাঝে মাঝে ধান্যকুড়িয়ায় আসিয়া আশ্রয়গ্রস্ত নরনারীদিগের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতেন। তাহাদের

ভোজন কালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা কৃতার্থ হইয়া যাইত। অনেকের মুখে এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, আশ্রয়প্রাপ্ত নরনারীরা তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইতেও কুণ্ঠিত হইত না। তিনি সকলকে স্নিগ্ধ মধুর, বিনয়নম্র বচনে সান্ত্বনা দিতেন, আশ্বাস বাণী শুনাইতেন।

নারীমাত্রকেই শ্যামাচরণ মাতৃসম্বোধন করিতেন। আশ্রয়প্রাপ্তা দুঃখিনী নারীদিগকেও তিনি মাতৃসম্বোধনে আপ্যায়িতা করিয়া তাহাদিগের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। অভিযোগ করিবার কাহারও কিছু ছিল না, তথাপি তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

অতিথিশালার আশ্রয়প্রাপ্ত লোক সমূহের মধ্যে যাহারা পীড়িত হইয়া চিকিৎসিত হইত, তিনি তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া তাহাদিগকে দর্শন করিতেন। মধুরবচনে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদের রোগাক্লিষ্ট চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিবার চেষ্টা

করিতেন। তাঁহাকে কাছে পাইয়া অনেক রোগীর মন সত্যসত্যই উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। এমনও শুনা গিয়াছে যে, কেহ কেহ শ্যামাচরণকে নিবেদন করিত যে, তিনি যদি তাহার দেহে হস্তাবমর্ষণ করেন, তাহা হইলে সে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে। অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্রোড়পতি শ্যামাচরণ রোগীর মলিন শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাহার সেবা করিয়াছেন। তাঁহার চিত্তে ও ব্যবহারে কোন প্রকার বিকার দেখা যাইত না। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াও তিনি প্রফুল্ল ভাবে তাহার সেবা করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

তাঁহার মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের সহিত মানুষের কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই সেই পরমপুরুষ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে। এই শিক্ষা ভারতবর্ষের হিন্দুর মজ্জাগত ব্যাপার। দর্শন-শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও নিরক্ষর চাষী পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব অবগত আছে। ভারতবর্ষের জল, বাতাস, আকাশ

পর্য্যন্ত এই মনস্তত্ত্বের প্রবাহ বহন করিয়া ধন্য হইয়া থাকে।

শ্যামাচরণের মনে ঘৃণা বলিয়া কোনও বৃত্তি মনুষ্য সম্বন্ধে কখনও ব্যক্ত হইতে দেখা যায় নাই। এই জন্যই "যত্র জীব তত্র শিব" এই পরম অনুভূতি তাঁহার মধ্যে চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার--

ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেইজন,

সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই তত্ত্বটি শ্যামাচরণ যে কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তিনি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর জন্য যেরূপ ভাবে সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন এমন কি ভৃত্যবর্গ সম্বন্ধেও ঠিক এই মনোবৃত্তির বিকাশ দেখা যাইত। তিনি পরিচারক-দিগের প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের সন্ধান রাখিতেন।

তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিতেন। প্রতিদিন তিনি প্রত্যেক পরিচারককে প্রশ্ন করিতেন, কাহারও আহারাদি সম্বন্ধে কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। যদি কাহারও কোনদিন পীড়া হইত, তখনই সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। নিজের সন্তানের পীড়ায় তিনি যেরূপ উদ্বেগ অনুভব করিতেন, সামান্য কোন পরিচারকের পীড়ায়ও তাঁহাকে তেমনই উদ্বিগ্ন করিত।

এজন্য পরিচারকবর্গ মনপ্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। শ্যামাচরণের জন্য তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত ছিল না। শ্যামাচরণের খাস-পরিচারক এখনও পর্য্যন্ত জীবিত আছে। এ ব্যক্তি এখন বৃদ্ধ হইয়াছে। শ্যামাচরণের কথা বলিতে গেলে, তাহার কোটর মধ্যস্থ নিষ্প্রভপ্রায় নয়নযুগল ভাবের আতিশয্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; তাহার কণ্ঠ অশ্রুভারে যেন রুদ্ধপ্রায় হয়। তাহার মুখে শুনা গিয়াছে যে, এমন সুকোমল অন্তঃকরণ

সাধারণতঃ কোনও পুরুষের মধ্যে দেখা যায় না। শ্যামাচরণ সকলকে তাঁহার বিরাট হৃদয়ে যেন পরম-স্নেহভরে স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের বাড়ীর যিনি কুল-পুরোহিত ছিলেন, শ্যামাচরণ তাঁহাকে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; একশত টাকা আয় হইতে পারে এমন মূল্যের সম্পত্তিও তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার দৃষ্টি সকলের প্রতি সমভাবে নিপতিত হইত।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীদিগের জন্য শ্যামাচরণ যে অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দরিদ্রনারায়ণ-গণকে অন্ন-বস্ত্র ও ঔষধাদি দানে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বোধহয় মনুষ্যজীবনে ইহার অধিক কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। বাঙ্গালার গৌরব পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে এইরূপ বাণীই বজ্রনির্ঘোষে নিনাদিত হইয়াছিল। দরিদ্রনারায়ণের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মানব-জীবনে আর নাই।

এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের, এই জীবসেবা, দরিদ্র-নারায়ণের পূজা বাঙ্গালীর ভাবধারাকে প্রকাশ করে। বাঙ্গালী সেই ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্ম-পোষণ-নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। এই আত্মসর্ব্বস্বতা ভারতীয় মনোবৃত্তি নহে। ইহা ঈশ্বরবিশ্বাসহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষ-ময় ফল। বাঙ্গালীকে এই বিকৃত মনোবৃত্তির প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। গৃহী শ্যামা-চরণের ন্যায় পুরুষের কার্য্যকলাপ তাহাদের আদর্শ-স্থানীয়।

দুভিক্ষের মহাপ্রকোপের বৎসর ধরিয়া দান ও বিতরণ-কার্য্য চলিল। ক্রমে বাঙ্গালার অদৃষ্টাকাশে বিপদের মেঘ দূরীভূত হইতে লাগিল। সুবৃষ্টিপাতে চাষীরা ক্রমে ক্রমে পুনরায় শস্য বপন ও রোপণ কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে লাগিল। শ্যামাচরণের আশ্রয়ে থাকিয়া যাহারা প্রতিপালিত হইতেছিল, তাহারা তখন রোগ ও অনশনের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার কর্ম্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে আশ্রয়-প্রার্থীরা আবার স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্যামাচরণ অনেককে সাহায্যও করিলেন। তাঁহার জয় গানে গগন পবন মুখরিত করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহারা গ্রামে ফিরিয়া স্ব স্ব পরিত্যক্ত কর্ম্মভার স্কন্ধে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।

জননী ইন্দিরা সেবার বাঙ্গলার কৃষিক্ষেত্রে সুবর্ণ-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ জীবনের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বস্রষ্টার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিলেন। তাঁহার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ত হইতেছিলই। রমা অচলা হইয়া তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহা সকলেই জানিত; কিন্তু দরিদ্র-নারায়ণের সেবার সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের পর তাঁহার কারবার যেন শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। প্রকৃত দানে ভাণ্ডার ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া বরং স্ফীততর হইতে থাকে, শ্যামাচরণের জীবনে সে দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট।

চতুঃ পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

আনন্দ-মেলা

মানবের জীবন একটা বিরাট রণক্ষেত্র। পদে পদে সংগ্রাম করিয়া মানুষকে যশোমাল্য অর্জ্জন করিতে হয়। এজন্য কবিরমুখে আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাওয়া যায়—

"সংসার-সমরাঙ্গণে
যুদ্ধ কর প্রাণপণে,
ভয়ে ভীত হয়োনা মানব।"

শ্যামাচরণের জীবনেও এই রণক্ষেত্র প্রথম হইতে বিভীষিকা সহ আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অকুতোভয়ে রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সে কাহিনী এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি জয়ের হিরণ্ময় মুকুট শিরে ধারণ করিয়া সার্থকজন্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সংগ্রামের অব-

কাশে তিনি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখ এবং শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

জননী তখনও জীবিতা, তাঁহার আশীষবাণী শ্যামাচরণকে অক্ষয়-বর্ম্মে আবৃত রাখিয়াছিল। জননীর পরিচর্য্যা করিবার অবকাশ অবশ্য সকল সময় কর্ম্মী শ্যামাচরণের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অবকাশ করিয়া লইয়া তিনি প্রায়ই জননীব চরণ-বন্দনা করিয়া ধন্য হইবার জন্য বাসগ্রামে আসিতেন।

শ্যামাচরণের ধনভাণ্ডার যখন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, চারিদিকে তাঁহার অসাধারণ কীর্ত্তি-কথা ঘোষিত হইয়াছিল, সেই সময় তাঁহাকে প্রিয়জন বিরহের তীব্র বেদনা বোধ করিতেও হইয়াছিল। তাঁহার প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদর অকালে স্ত্রী ও সন্তান রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। শ্যামাচরণ সেজন্য হৃদয়ে তীব্র বেদনা পাইয়াছিলেন। পুত্র-বিরহ-কাতরা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শ্যামাচরণ অনেক সময় আপনার তীব্র শোকবেগ সংবরণ করিয়া থাকিতেন। জননীকে

ভুলাইবার জন্য নানাপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন।

দুঃখ ও সুখ পরস্পর পাশাপাশি চলিতে থাকে। শ্যামাচরণ তাহা বুঝিতেন বলিয়া হৃদয়ের তীব্র বেদনাকে কর্ম্ম-সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখিতেন। ইষ্টদেবতার আরাধনায় মনে সান্ত্বনা ও শক্তি অনুভব করিতেন। বিপুল কর্ম্মভার যাঁহার স্কন্ধে বিদ্যমান, তাঁহার পক্ষে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করিবার সময়ও বড় থাকে না। কর্ত্তব্যই তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দেয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্যামাচরণের তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শ্যামাচরণ তাহাদিগের নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। প্রথমা কন্যাকে তিনি ইত্যবসরে সুপাত্রে অর্পণ করিলেন। কলসুর নিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র হালদারের পুত্র মহানন্দ হালদারকে শ্যামাচরণ জামাতৃপদে বরণ করেন। যুবক মহানন্দ অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও বিশ্বাস ভাজন বলিয়া শ্যামাচরণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বৃহৎ কারবারের ধন-ভাণ্ডারের ভার

ইহার উপর অর্পণ করিয়া শ্যামাচরণ সুস্থ থাকিতে পারিয়াছিলেন।

সন্তানবাৎসল্য শ্যামাচরণের অন্তরকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। তাঁহার স্নেহ-কোমল হৃদয় অনুক্ষণই সন্তান-দিগের কল্যাণ-কামনায় নিমগ্ন থাকিত। প্রচণ্ড কর্ম্ম-প্রবাহে অবগাহন করিয়াও কখন তাহাদিগের কথা বিস্মৃত হইতেন না।

শ্যামাচরণ দ্বিতীয়া কন্যা নিথরবালাকেও যোগ্য পাত্রে অর্পণ করেন। কলস্থুর গ্রাম নিবাসী দীননাথ মণ্ডলের পুত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডলের সহিত নিথর বালার পরিণয় ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। রাসবিহারী অত্যন্ত বিনয়ী, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মদক্ষ। জমীদারী কাজ কর্ম্মে তিনি উত্তমরূপে দক্ষতালাভ করিয়াছেন। অধুনা তিনি বল্লভ ও সাউদিগের বিশাল জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ইনি ২৪ পরগণা জিলাবোর্ডের সদস্য, সাউথ দমদম মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

শ্যামাচরণের কনিষ্ঠা কন্যা নলিনীবালা উত্তরকালে বনমালীপাড়া নিবাসী কেদারনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত পরিণীতা হন। শ্যামাচরণের এই জামাতাও ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া থাকেন।

শ্যামাচরণ ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভগিনী, ভাগিনেয় প্রভৃতি সকলকেই সমধিক স্নেহ-সুধা বিতরণ করিতেন। সকলকে আপনার পরিবারভুক্ত করিবার কামনা, তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল ছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মাধুর্য্য তাঁহাকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিত। ভাগিনেয়, ভগিনী প্রভৃতিকে তিনি সকল সময়ই দেখা শুনা করিতেন। কাহারও কোন অভাব জানিতে পারিলে তখনই তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিতেন।

যৌথ কারবারকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করার সঙ্গে তিনি বল্লভ, গাইন ও সাউ এই তিন পরিবারকে সমসূত্রে গ্রথিত রাখিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁহার সময়ে ত অটুট-ভাবে চলিয়াইছিল, উত্তরকালে তাঁহার অবিদ্যমানে

এখনও পর্য্যন্ত সে বন্ধন, অটুট ও অব্যাহত রহিয়াছে। এজন্য তাঁহার সংসারকে আনন্দ-মেলা বলিয়া অভি-হিত করিলে, তাহতে আদৌ অতিরঞ্জন দোষ দৃষ্ট হইবে না।

এই আনন্দ মেলায় শ্যামাচরণ পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। গৃহে স্নেহমমতাশালিনী জননীর আশীর্ব্বাদ, পতিব্রতা, সাধ্বী, উদারহৃদয়া সেবা নিপুণা পত্নীর নিপুণ শুশ্রূষা ও প্রেম, পুত্রকন্যার অনাবিল স্নেহ নির্ঝরের অস্ফুট আনন্দকূজন, আত্মীয় স্বজনের সহযোগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির অফুরন্ত উৎসধারা শ্যামাচরণের চিত্তে একটা প্রসন্ন স্নিগ্ধতা আনিয়া দিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পরিণত বয়সে ভাগ্যশ্রীর পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইয়া শ্যামাচরণ পূর্ণানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কোন অভাব নাই, কোনও দীনতা নাই। আত্মমর্য্যাদা রক্ষার প্রচুর উপাদান শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি লাভ করিয়াছেন। তিনি আজন্ম

লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক ; রাধামাধবের ভক্ত। জগজ্জননীর স্বরূপ, তাঁহার অফুরন্ত শক্তির উৎস শ্যামাচরণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের জীবন-তরণী পাল তুলিয়া স্ফীতবক্ষে আনন্দ-সমুদ্রের উদ্দেশে, অনুকূল স্রোত ও পবনে ভর করিয়া ভাসিয়া চলিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

মাতৃবিয়োগ

শ্যামাচরণের জননী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন শতবর্ষ কাটাইয়া উঠিলেন, তখন শ্যামাচরণ জননীর জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুনঃ পুনঃ পুত্রশোকে জননীর বক্ষোদেশ ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এজন্য শ্যামাচরণ প্রায়ই এমন কথা প্রকাশ করিতেন, তাঁহার জননী যেন তাঁহার পূর্ব্বে দেহরক্ষা করেন।

পুত্রের প্রদত্ত জলগণ্ডুষ জননীর কামনা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে মাতার সে কামনা যেন পূর্ণ হয়। সব পুত্রই মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট রহিয়াছেন, তিনিও ক্রমশঃ বৃদ্ধত্বের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এখন তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে মাতা দেহরক্ষা করিলে তিনি শেষকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

অবশ্য জননীকে ছাড়িয়া থাকিতে শ্যামাচরণের হৃদয়ে বেদনা—তীব্র ব্যথা অনুভূত হইবে সত্যই; কিন্তু সে দুঃখ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাহা সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু মাতার ভার তিনি আর কাহারও উপর রাখিতে সম্মত নহেন।

বৃদ্ধা জননী ক্রমে ১০৫ বৎসরে উপনীতা হইলেন। শ্যামাচরণ তখন খুলনা জেলার ভীষণ-দুর্ভিক্ষ দমন ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিয়া লোকসমাজের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্যামাচরণ প্রায়ই জননীকে দেখিবার জন্য কলিকাতা হইতে ধান্যকুড়িয়াই ছুটিয়া আসিতেন। জননী এই সময়ে বিশেষ অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাতার সেবার জন্য শ্যামাচরণ উপযুক্ত সংখ্যক পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াই নিরস্ত হইলেন না;

তিনি গৃহিণী দাক্ষায়ণীর শুশ্রূষা ও সেবাপরায়ণতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। তথাপি পত্নীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, জননীর দিকে এখন হইতে আরও খর-দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পরিচারিকারা যথাযথভাবে মাতৃদেবীর পরিচর্য্যায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকে

সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অনুরোধ না করিলেও চলিত। তাঁহারা উভয়ে শ্বশ্রূমাতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা স্বামীর গর্ভধারিণী জননী, পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা অনুভব করিতে না পারেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ছিল।

ধান্যকুড়িয়া হইতে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া যাইতেন, মাতার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের পথে যাইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিলেই অবিলম্বে তাঁহারা যেন তাঁহাকে সে সংবাদ প্রদান করেন।

ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য জনিত নানাপ্রকার ব্যাধি শ্যামাচরণের জননীকে আক্রমণ করিতে লাগিল! চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইল না। ভাল ভাল চিকিৎসক বৃদ্ধার শেষ জীবনকে যথাসাধ্য দৈহিক ক্লেশ হইতে মুক্তি দিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সকলেই

বুঝিতে পারিলেন ১০৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীর জীবনের ভোগ শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

শ্যামাচরণ মাতার যাবতীয় অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইহলোকে যাহা কিছু করণীয় ছিল, হিন্দু শ্যামাচরণ তাহার কোনটি অপূর্ণ রাখেন নাই। বৃদ্ধা কায়মনোবাক্যে আপনার ধর্ম্মে বিশ্বাসবতী ছিলেন; শ্যামাচরণ হিন্দু-ধর্ম্মানুগত সকল প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা মাতার পরকালের বিশ্বাসকে সার্থকতার-পথে চালিত করিয়াছিলেন।

ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন এবং চিকিৎসকগণ বুঝিতে পারিলেন, অচিরকাল মধ্যে এই পুণ্যবতী মহিলা ইহলোকের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্যামাচরণের কাছে সে সংবাদ গেল। তিনি ব্যবসা কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

জননীর অন্তিম সময়ে একমাত্র পুত্র অবশ্যই উপস্থিত থাকিবে। যে জননীর বক্ষোসুধাপানে তিনি এই

পৃথিবীতে পুষ্ট হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্ক-ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই সুন্দরা ধরণীর যাহা কিছু ভাল ও মন্দের সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, যাঁহার স্নেহ-সুধা পানে তিনি দৃঢ় শক্তিতে সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভে সমর্থ হইয়াছেন, যে জননীর সতর্ক-দৃষ্টি তাঁহাকে সংসারের পিচ্ছিল-পথে পদস্খলিত হইতে দেয় নাই, যাঁহার স্নেহের প্রতিদান সহস্র জীবনেও শোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব; পৃথিবীতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু যে জননী সেই সর্ব্বস্রষ্টার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ, তাঁহার অন্তিম সময়ে শ্যামাচরণকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, এই জননী ছাড়া তাঁহার শ্রেষ্ঠতরা জগতে আর ত কেহই নাই!

শ্যামাচরণ জননীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সদা-প্রসন্ন আননে মৃত্যুর ছায়া ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। জীর্ণদেহ, চিরন্তন আত্মাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। জীর্ণ, ছিন্ন, মলিন-বাস ফেলিয়া দিয়া আত্মা রূপান্তরের আশ্রয় লাভের জন্য তখন উন্মুখ।

৫৪৫

শ্যামাচরণ মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃঢ়, কোমল অন্তরে তখন যে ভাব-সমুদ্রের তরঙ্গ সমুত্থিত হইতেছিল, তাহা শুধু মাতৃভক্ত সন্তানেরই পক্ষে অনুভবযোগ্য। যে হতভাগ্য কখনও মাতৃস্নেহ পায় নাই, তাহার পক্ষে শ্যামাচরণের সেই সময়কার মনের ভাব অনুমান করিবার কোন শক্তি হইবে না।

চরম মুহূর্ত্ত ক্রমে উপনীত হইল। ১৩০৫ সালের ২৯শে কার্ত্তিক বৃদ্ধা পুত্র-ক্রোড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শ্যামাচরণ বালকের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহজগতে জননীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কি ভাবে জীবন ধারণ করিবেন? শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন-দেহ ও মন লইয়া তিনি আর কাহার কাছে জুড়াইতে আসিবেন? কে আর তাঁহার মস্তকে ও পৃষ্ঠে স্নেহ-শীতল-হস্ত বুলাইয়া দিয়া সান্ত্বনা ও আশার বাণীতে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবে?

মাতৃবিয়োগ-কাতর প্রৌঢ় সন্তানকে কেহ সান্ত্বনার-বাণী শুনাইয়া আশ্বস্ত করিতে সাহস করিল না।

সকলেই তাঁহার প্রকৃতির বিষয় অবগত ছিল। কিছু-কাল গভীর শোকে আচ্ছন্ন থাকিবার পর শ্যামাচরণ স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাঁ, এখন সন্তানের কর্ত্তব্য, হিন্দু পুত্রের কর্ত্তব্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। মাতৃ-দেহকে শ্মশানে লইয়া যাইতে হইবে; এখন অধীর হইয়া শোক প্রকাশ করিলে চলিবে না।

শ্যামাচরণের জননী দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তদুপ-যুক্ত সমারোহে মৃতদেহ শ্মশানতীর্থে লইয়া যাইতে হইবে। কীর্ত্তনের দল প্রস্তুত ছিল। মধুর হরিনামে দিঙ্মণ্ডল পরিপ্লাবিত করিয়া শ্মশান-বন্ধুরদল শবদেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। শ্যামাচরণ অনুবর্ত্তী হইলেন।

বড় সাধের, বড় স্নেহের পূজ্য, পুণ্যদেহ চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর সজ্জিত হইল। শ্যামাচরণ রোরুদ্যমান-মুখে মাতার সৎকার করিলেন। এই গভীর শোকের মধ্যেও তাঁহার একটা বিশেষ সান্ত্বনা জন্মিল যে, জননী তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারিয়াছেন। আজ শ্যামাচরণ মাতার পারলৌকিককার্য্য করিবার অবকাশ পাইয়াছেন।

পঞ্চ পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

দান-সাগর

মাতৃ-বিয়োগে শ্যামাচরণ কয়েক দিন শোকাভিভূত থাকিবার পর, জননীর পারলৌকিক-ক্রিয়া মহা-সমারোহে সম্পন্ন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্যামাচরণ কায়মনোবাক্যে হিন্দু ছিলেন। হিন্দুর প্রচলিত আচার-ব্যবহার, সর্ব্ব-প্রকার অনুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠাভরে পালন করিতেন। তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, মাতার আশীর্ব্বাদেই তিনি জীবনে এবম্প্রকার অসাধারণ সাফল্যলাভ করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি প্রাণ ভরিয়া, হিন্দুর চিরাচরিত প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

জননীর মনোবৃত্তির সহিত শ্যামাচরণের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ও যোগ ছিল। সুতরাং তিনি মাতার সংস্কার

ও বিশ্বাসকে নিজের সংস্কার ও বিশ্বাসের সহিত বিন্দু-মাত্র পার্থক্য দেখিতে পাইতেন না। জননী যে বিশ্বাস এতদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন, যে সংস্কারের আবেষ্টনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করাই পুত্রের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

শ্যামাচরণের মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, জ্ঞাতি কুটুম্ব, স্বজাতি, স্বগ্রামবাসী সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলেই পরলোকগত আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। তিনি যদি দীনভাবে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দ দান করিতে পারেন, তাহা হইলে অসংখ্য আত্মার শুভেচ্ছায় তাঁহার জননী লোকান্তরে অখণ্ড আনন্দের অধিকারিণী হইতে পারিবেন।

হিন্দুর ইহাই সংস্কার—হিন্দুধর্ম্মের ইহাই তত্ত্বকথা। পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিত। সুতরাং তদনুসারে তিনি মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জননীর আত্মার অক্ষয় স্বর্গ-কামনা প্রচেষ্টায় তিনি শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সমবেতভাবে যে পরামর্শ দিলেন, তাহা শ্যামাচরণেরই সংস্কার ও চিন্তাধারার অনুরূপ।

তিনি স্বশ্রেণীস্থ যাবতীয় পরিবারকে সমাদরে আহ্বান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইলেন। গ্রামে গ্রামে ঘূরিয়া স্বজাতি আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতিকে শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিবার জন্য যথারীতি আহ্বান করিলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে তাঁহাকে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ও পুলকিত হইল।

শ্যামাচরণের মনে আর একটা বিশ্বাস ছিল যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করাইতে পারিলে তাঁহার জননী অমরধামে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই ব্যাপার সহজসাধ্য ত নহেই, এ পর্য্যন্ত অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকই এই অসম্ভব কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সাহস করেন নাই।

উক্ত অঞ্চলের কোন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ এ পর্য্যন্ত কোনও সৎচাষীর প্রদত্ত উপহার কখনও গ্রহণ করেন নাই। সামাজিক প্রথা অনুসারে তাহা নিষিদ্ধ ছিল। কোন সৎচাষী সম্প্রদায়ের লোকই ইতিপূর্ব্বে এবম্প্রকার কল্পনা করিতেও কোনদিন সাহসী হন নাই। শ্যামাচরণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বন্ধু তাঁহাকে এই প্রচেষ্টায় বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু শ্যামাচরণ কোন কার্য্যেই নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। জননীর আত্মার কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার কাছে কোন প্রকার বাধা বিঘ্নই তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অসমসাহসে ভর করিয়া তিনি জননীর আত্মার কল্যাণ কামনায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল, অকৃত্রিম, বিনয় ও হীনতা স্বীকার করিয়া কাহারও দ্বারস্থ হইলে কোন হিন্দুই প্রার্থীর তৃপ্তি বিধানের জন্য তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। প্রগাঢ় বিনয়, অপরিসীম নম্রতা

ও মধুর সৌজন্যে প্রত্যেক মানুষকে জয় করা সম্ভবপর।

তিনি ধান্যকুড়িয়ার নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-প্রধান গ্রামগুলিতে স্বয়ং গলবস্ত্র হইয়া গমন করিলেন। প্রতি গৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে, পরলোকগতা মাতৃদেবীর অক্ষয়-স্বর্গ কামনায় তিনি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তদুপলক্ষে কিছু উপহার দিয়া তিনি ধন্য হইতে চাহেন। এই উপহার গ্রহণ করিলে তাঁহার জননীর তৃপ্তি হইবে। যদি উপহার প্রত্যাহৃত হয়, তবে তাঁহার জননীর আত্মা অপরিতৃপ্ত থাকিবে।

তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৌজন্যে এবং উপহার প্রদানের ঐকান্তিক নিষ্ঠা সকলকেই মুগ্ধ ও অভিভূত করিল। উক্ত অঞ্চলের প্রায় একশত গ্রামের সহস্র কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-পরিবার শ্যামাচরণের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

আনন্দে অধীর হইয়া শ্যামাচরণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উপহার সামগ্রী সমূহ ক্রীত হইতে লাগিল।

প্রত্যেক গৃহে একটি বড় ঘড়া, একখানি উৎকৃষ্ট কাংস্য নির্ম্মিত বৃহৎ থালা, সেই থালা পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট সন্দেশ এবং ১খানি করিয়া মূল্যবান শাল প্রেরিত হইল।

মাতৃশ্রাদ্ধে শ্যামাচরণ দানসাগর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। সে এক বিরাট ব্যাপার। দরিদ্রনারায়ণ-সেবায় শ্যামা-চরণ অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর অনুষ্ঠানে তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ যেন আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

দরিদ্রনারায়ণকে সেবা করিলে, তাহাদের ক্ষুধিত আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করিলে, বিশ্বস্রষ্টা আনন্দ লাভ করেন, সুতরাং তাঁহার জননীর আত্মাও পরিতৃপ্ত হইবে। এজন্য দূরগ্রামবর্ত্তী দরিদ্র, ভিক্ষুক প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া হইল।

শ্রাদ্ধক্রিয়া মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্বগণ পরিতোষ সহকারে ভূরি ভোজনে পরি-তৃপ্ত হইল। কীর্ত্তনীয়া দল মধুর নাম সংকীর্ত্তন করিয়া পল্লীপ্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া তুলিল। চারিদিকে শুধু

'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব। সকলে বলিতে লাগিল, হাঁ মাতৃভক্ত শ্যামাচরণের আজিকার এই শ্রাদ্ধক্রিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

তারপর কাঙ্গাল গরীব, দীন দুঃখী ভিখারীদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। সে কি বিরাট ব্যাপার! প্রায় ৪০ সহস্র নরনারীকে একমালসা করিয়া লুচি ও সন্দেশ এবং একটি করিয়া টাকা প্রদত্ত হইল। শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন যে, দরিদ্রগণ ভাল জিনিষ খাইতে পায় না, সুতরাং উৎকৃষ্ট সন্দেশ উহাদিগের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক দরিদ্রকে দুইবেলা পরিতোষ রূপে ভোজন করাইয়া উল্লিখিত প্রকার বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। শ্যামাচরণ তাহাদের ভোজন কালে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আত্মীয় কুটুম্বগণকে তিনি যেরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, অনাহূত, রবাহূত দরিদ্রগণকেও ঠিক তেমনই সমাদরে অভ্যর্থিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

এই সুদীর্ঘকাল তিনি আত্মীয় পরিজন সহ স্বয়ং সমস্ত ব্যাপার পরিচালন করিয়াছিলেন। শুধু অন্যের উপর ভার দিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা ছিল, পাছে এই সকল দরিদ্রনারায়ণের কাহাকেও কেহ অপমান করে বা রূঢ় ব্যবহারে কাহারও মনে বেদনা দেয়। জননীর পারলৌকিক মঙ্গল কার্য্য তাহা হইলে পণ্ড হইয়া যাইবে। এজন্য চক্ষু কর্ণ মেলিয়া তিনি শ্রান্তি ও ক্লান্তিহীন ভাবে বিতরণ ক্ষেত্রে সমুপস্থিত ছিলেন।

বাহিরের ভার স্বয়ং লইয়া অন্তঃপুরের সম্পূর্ণ ভার তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ভুবন বল্লভের পত্নীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃসমা ভ্রাতৃবধূকে গোপনে বলিয়া দিয়াছিলেন, কেহ কোন দ্রব্য আত্মসাৎ করি-তেছে জানিতে পারিলেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হইবে না। যে যাহা পারে লইয়া যাক্, তাহাতে ক্ষতি হইবে না। কিন্তু এই পুণ্য দিনে যদি কাহারও অসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া রূঢ় কথা বলা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মনে বেদনা পাইবে। তাহার ফলে

তাঁহার পরলোকগত মাতার আত্মা শান্তি পাইবে না। মাতার আত্মার তৃপ্তির জন্য আজ সকল প্রকার অনাচারই উপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্যামাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। এই বিরাট শ্রাদ্ধ ব্যাপার লইয়া কাহারও মনে ব্যথা প্রদান করিবার মত কোন ঘটনারই উদ্ভব হয় নাই। আত্মীয় স্বজনবৃন্দ সকলেই প্রাণপণে সুশৃঙ্খলা সহকারে কার্য্যটিকে সুচারুভাবে নির্ব্বাহিত করিবার জন্য অসীম পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের নাম দিগ্‌দিগন্তে ঘোষিত হইতে লাগিল। তাঁহার যশোসৌরভে আকাশ ও বাতাস মাতিয়া উঠিল।

কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে শ্যামাচরণ প্রথম পৌষের শীতার্ত্ত রজনীতে সমস্তক্ষণ নগ্নপদে বহু সহস্র দান-গ্রহণার্থী নরনারীর মধ্যে যাপন করিলেন। সে সময়ে তিনি বিশ্রামের জন্য এক মুহূর্ত্তও স্থানান্তরে যান নাই। যাঁহারা শ্যামাচরণকে তদবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ আর ইহলোকে এখন বিদ্যমান নাই। যে দুই-চারিজন এখনও জীবিত আছেন,

তাঁহাদের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, এমন নিষ্ঠা-ভরে দরিদ্রনারায়ণকে সেবা করিতে সহসা কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেবা করিয়াই যেন শ্যামাচরণ কৃতার্থ হইতেছিলেন।

এই দানকে সাত্ত্বিক-গুণান্বিত দান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বসিরহাট মহকুমা শ্যামাচরণের এই কীর্ত্তি বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারা যায়।

কবির "পউষ প্রখর শীতজর্জ্জর ঝিল্লিমুখর রাতি" সেই রজনীতে ধান্যকুড়িয়ার পল্লীগ্রামে কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। সে রজনী অসংখ্য নরনারী-কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রেণীবদ্ধভাবে দান-গ্রহণকারী নরনারীর হস্তে মালসা-পূর্ণ আহার্য্য ও রজতমুদ্রা বিতরিত হইতেছিল। হর্ষানন্দে বিভোর প্রার্থীরা দলে দলে চলিয়া যাইতেছিল।

শ্যামাচরণ যেন কল্পনানেত্রে দেখিতেছিলেন, তাঁহার জননী পরপার হইতে মঙ্গল হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিতেছেন। মাতার আনন সন্তানের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া যেন প্রসন্নহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল দর্শক শ্যামাচরণের তদনীন্তন অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তুই-একজনের নিকট হইতে এরূপ ভাবের আভাস পাওয়া গিয়াছে।

২৪ ঘণ্টাব্যাপী দানকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর শ্যামা-চরণ স্বস্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এখন বাকি শুধু জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে লইয়া নিয়মভঙ্গ করা। উহার আয়োজন করিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বাবধি স্থির ছিল। পরিশ্রান্ত দেহভার লইয়া শ্যামাচরণ সহধর্ম্মিণীর কাছে উপনীত হইলেন। দাক্ষায়ণীও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। অন্তঃপুরেও আতিথ্যসৎকার-ব্রত চলিতেছিল।

ষষ্ঠপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে

মৎস্যমুখী বা নিয়মভঙ্গের দিন প্রভাত হইল। মাতৃ-বিয়োগের পর, ইহলোকে মাতার সহিত দৈহিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদের পর, পুনর্ব্বার পূর্ব্বাচরিত প্রথায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার দিন শ্যামাচরণ জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে আয়োজন সামান্য নহে। প্রভাত হইতে শ্যামা-চরণ উৎসাহভরে কর্ত্তব্য পালনের জন্য সজাগ হইলেন।

জননীর শোকে একমাস কাল অশৌচ পালনের পর আজ আবার পুরাতন পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। কিন্তু সে পুরাতনের সবটুকু—প্রধান অংশটুকু নাই। আজ জীবনে তিনি প্রথম মাতৃবিচ্ছেদের স্বরূপ যেন উপলব্ধি করিলেন। জীবনের প্রথম সংগ্রাম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাতৃঅঙ্কচ্যুত

হইবার দুর্ভাগ্য তাঁহার কখনও ঘটে নাই। আজ সেই কথা কি শ্যামাচরণের চিত্তে বিক্ষোভ তুলিতেছিল?

কিন্তু তাঁহার বাহ্য ভাবভঙ্গী দেখিয়া কাহারও মনে কোনও প্রশ্ন জাগে নাই, এ কথা জীবিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। শ্যামাচরণের কার্য্যে কেহ কখনও বিন্দু মাত্র ক্লান্তি বা অবসাদের লক্ষণ প্রকটিত হইতে দেখেন নাই। নিয়মভঙ্গের দিনেও তাহা প্রকাশ পায় নাই।

কর্ম্মরথ ঘর্ঘররবে চলিতেছিল। শীতের প্রভাত ক্রমশঃ মধ্যাহ্নের খর আলোকে উজ্জ্বলতর দীপ্তিমণ্ডিত হইয়া উঠিল। আত্মীয়, জ্ঞাতিকুটুম্বগণের সমাগমে শ্যামাচরণের বৃহৎ অট্টালিকা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আহারের আয়োজন হইল। শ্যামাচরণ জ্ঞাতিকুটুম্ব-গণের সহিত একাসনে আহারে বসিলেন।

আহারে বসিয়াও তিনি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন, জ্ঞাতিকুটুম্বগণের পাতে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেষিত হইতেছে কি না। সকলের আত্মা পরিতৃপ্ত হইলেই তাঁহার সমস্ত আয়োজন সার্থক

হইবে। এই মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়াই তিনি সকল কার্য্য করিতেন। কোনও ব্যক্তি কোনও বিষয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হইলে, অপরিতৃপ্ত থাকিলে, তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন।

পরিতোষ সহকারে সকলের ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্যামাচরণ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আচমন করিতে উঠিলেন। আচমন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহসা শ্যামাচরণ বমন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। এই বমন এমন ভীষণ ভাবে আরম্ভ হইল যে, আত্মীয় স্বজনগণ প্রমাদ গণিলেন।

তখনই চিকিৎসকের ডাক পড়িল। অতি কষ্টে বমন বেগ নিবারিত হইতে না হইতেই তাঁহার দেহে উত্তাপ বৃদ্ধি হইল। ডাক্তারগণ চিন্তিত হইলেন। রোগ নিরাকরণের জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও আহূত হইলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধের পর, নিয়মভঙ্গের দিন হইতেই আক-স্মিক পীড়ার আক্রমণ শ্যামাচরণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দাক্ষায়ণী স্বামীর রোগ শয্যা পার্শ্বে আসন

গ্রহণ করিলেন। পিতার পীড়ার গুরুত্ব বুঝিবার মত বয়স না হইলেও সকলের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইতে দেখিয়া, কিশোর বয়স্ক পুত্র দেবেন্দ্রনাথের আনন শুষ্ক ও ম্লান হইয়া উঠিল।

উদ্বেগ ও আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। শ্যামাচরণের জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অক্লান্ত-কর্ম্মী, পুরুষের শয্যালীন দেহ রোগ ভোগে অবসন্ন, এমন দৃশ্য আত্মীয় স্বজন বহুকাল দেখেন নাই। প্রচণ্ড কর্ম্মোৎসাহে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অখণ্ড মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত এতকাল পর্য্যন্ত শুধু সিদ্ধি লাভের জন্য সাধনা করিয়া আসিয়া-ছেন—বিজয়লক্ষ্মী যাঁহার মস্তকোপরি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ধারা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ এমন ভাবে পীড়ায় অবসন্ন হইতে দেখেন নাই।

এই মহাপ্রাণ কর্ম্ম-সাধকের জীবনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। সুতরাং তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাল ভাল অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহাকে রোগমুক্ত

করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ চিকিৎসা প্রণালীর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

পত্নী দাক্ষায়ণী স্বামীর শুশ্রূষায় দিন ও রাত্রি নির্ব্বিচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রোগশয্যা-প্রান্ত হইতে কেহ তাঁহাকে বিশ্রামার্থ অন্যত্র পাঠাইতে পারিলেন না। সতী তাঁহার জীবনদেবতার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম উপভোগের জন্য মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট করিতে সম্মত ছিলেন না।

তিন দিন চলিয়া গেল। শ্যামাচরণের রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চিকিৎসকগণের মুখমণ্ডল সন্দেহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাঁহাদের সংশয়-দোলায়মান চিত্তের স্বরূপ তাঁহাদের আননে নয়নে প্রতিফলিত হইল। সমগ্র ধান্যকুড়িয়ার অধিবাসী শ্যামাচরণের রোগমুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

জীবন ও মৃত্যুর বিভীষণ সংগ্রাম আরব্ধ হইল। মানুষ সমবেত শক্তি সহকারে শ্যামাচরণকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিল না।

সে কি ভীষণ সংগ্রাম! মৃত্যু কিন্তু তাহার দৃঢ়, অজেয় বাহু প্রসারিত করিয়া সুনিশ্চিত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার অনুচরবর্গ হুঙ্কার তুলিয়া প্রতিরোধকারী মানুষের অস্ত্রশস্ত্রকে শতধা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া জয়োল্লাসে শ্যামাচরণের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

সন্দেহ ও শঙ্কায়, নৈরাশ্য ও দুর্ভাবনায় নিয়মভঙ্গের পর চারিটি দীর্ঘ দিবা ও রজনী অতিবাহিত হইল। মনুষ্যশক্তি প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া ক্রমেই হঠিয়া আসিতে লাগিল। প্রচণ্ড দৈবকে নিরোধ করিবার শক্তি নাই। মাতৃভক্ত পুত্র, জননীকে ছাড়িয়া ইহ জগতে আর থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহার সমগ্র অন্তর মাতৃচরণে আশ্রয় লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে পরমাত্মীয়গণের কাছে বলিতেন, মাকে ছাড়িয়া সন্তান কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, যেদিন জননী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন,

তখন হইতেই তাঁহার সমস্ত কর্ম্মশক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সমস্ত শক্তির উৎস ছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই গাণ্ডীবীর সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল, জননীর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামাচরণের সমগ্র কর্ম্মশক্তি তিরোহিত হইবে, এমনই একটা বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

আত্মীয়গণের মনে তখন শ্যামাচরণের পূর্ব্বোচ্চারিত সেই সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। তবে কি শ্যামাচরণ ইহলোক হইতে অপসৃত হইতেছেন? এ যাত্রা কি এই মাতৃগতপ্রাণ মহাপ্রাণ পুরুষটিকে বাঁচাইয়া তুলা যাইবে না?

দাক্ষায়ণী তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াও স্বামীকে বাঁচাইতে চাহেন। তাঁহার ইহ পরকালের দেবতা, তাঁহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য, সর্ব্বগুণান্বিত স্বামীকে সেবার বলে, অর্থের বিনিময়ে কি বাঁচাইয়া তুলা যাইবে না?

কোমল নারী হৃদয়, স্নেহদুর্ব্বল সতীর অন্তঃকরণ হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে তিনি কোন-

রূপ অধীরতা প্রকাশ করিলেন না। রোগীর শয্যা পার্শ্বে কাহারা যেন নিঃশব্দ চরণে অগ্রসর হইতেছে! কত অশরীরী প্রাণীর নিঃশ্বাস স্পর্শ যেন অনুভূত হয়। সতী দৃঢ় হৃদয়ে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

চিকিৎসকগণ রোগীর কক্ষে আসিতেছেন, যাইতেছেন। ঔষধের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আত্মীয় স্বজন, নির্ব্বাক ভাবে রোগ শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। ম্লানকাতর মুখে পুত্র ও কন্যারা এক একবার উঁকি মারিয়া শয্যাশায়ী পিতার প্রতি চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সমগ্র অট্টালিকা বিষাদ ভারে সমাচ্ছন্ন। কয়দিন পূর্ব্বে যেখানে বহুশত নরনারীর আনন্দ চীৎকার, কীর্ত্তনের রসঘন সুরের ঝঙ্কার গগন পবনকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেখানে সকলে শব্দহীন ভাবে চলাফিরা করিতেছে।

দাস দাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই মুখ নিরানন্দ। এমন প্রভু জন্মান্তরের পুণ্য ফলে লাভ করা যায়।

তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ লইতেছিল, কর্ত্তার অবস্থা কেমন আছে।

ধীরে ধীরে ৭ই পৌষের রজনী ঘনাইয়া আসিল। চিকিৎসকগণ উৎকণ্ঠিত ভাবে আজিকার রজনী সতর্ক হইয়া থাকিবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র আশার আলোক যে দেখাইতেছিল না, তাহা শ্যামাচরণের আত্মীয় স্বজনও বুঝিয়াছিলেন। যাহা ধ্রুব, যাহা অলঙ্ঘ্য, যাহা অনিবার্য্য, তাহার জন্য প্রস্তুত না হইয়া উপায় কি? জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রাম ভীষণ-তর রূপে দেখা দিল। এই প্রচণ্ড ঝটিকার বেগ হইতে দীপশিখাকে আর বোধ হয় রক্ষা করা চলে না!

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

দীপনির্ব্বাণ

মানুষের শক্তি পরাজিত হইল। কালের নির্ম্মম হস্ত শ্যামাচরণের দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া প্রাণপক্ষীকে সংগ্রহ করিয়া অনন্তের পথে ধাবিত হইবার জন্য শয্যাপ্রান্তে সমুপস্থিত।

৮ই পৌষের প্রভাত হইতেই শ্যামাচরণের অবস্থা ক্রমেই আরও মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। জীবন প্রবাহ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। নাই!—আশা নাই! রোগীর জীবন-প্রদীপ বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়া আসিতে লাগিল।

বেলা ১১৷৷০টার সময় শ্যামাচরণ পরপারে যাত্রা করিলেন। জননীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর পাঁচদিনমাত্র তিনি রোগশয্যায় বাঁচিয়া ছিলেন। কোনও শক্তি তাঁহাকে ইহ জগতে ধরিয়া রাখিতে

পারিল না। আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহা পারে নাই। মাতৃভক্ত সন্তান মাতাকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন নাই। সর্ব্বজন-বাঞ্ছাকল্পতরু, প্রেমময় শ্রীভগবান, পবিত্রচেতা, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। "মহাসিন্ধুর অপরপার হইতে সঙ্গীতের" আহ্বান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্যামাচরণ জননীর সহিত মিলিত হইবার জন্য চলিয়া গেলেন।

একটা বিরাট-হৃদয় মানুষ বাঙ্গালার আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল—ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। ধান্যকুড়িয়া গ্রাম হাহাকার করিয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে সেই আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ফিরিয়া বাতাসকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। আর্ত্ত, পীড়িত, অভাবগ্রস্ত দীনদরিদ্র আজ পিতৃহীন হইল। কে আর তাহাদিগের অভাব-মোচনে কল্পতরু হইয়া উঠিবে?

অন্তিম মুহূর্ত্তে শ্যামাচরণের যাবতীয় আত্মীয় কুটুম্ব ও জ্ঞাতি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামিবিয়োগবিধুরা দাক্ষায়ণীকে তাঁহারা সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কে কাহাকে

সান্ত্বনা দিবে? অশ্রুভারে সকলেরই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

শোকের তীব্র ঝটিকা প্রচণ্ড বিক্রমে বহিতে লাগিল। এমন ভাবে অকস্মাৎ শ্যামাচরণ চলিয়া যাইবেন, এমন আশঙ্কা দশদিন পূর্ব্বেও কাহারও চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে নাই। কোন রোগ নাই, সুস্থ সবল মানুষ, মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বমন রোগে আক্রান্ত হইবার পর, ৫ দিনের মধ্যে দোকান পাট ফেলিয়া এমন ভাবে চলিয়া গেলেন! রোগশয্যায় দীর্ঘকাল যমযন্ত্রণা ভোগ করিলেন না, কাহাকেও তেমন ভাবে কষ্ট দিলেন না। কর্ম্মরথ চক্রনির্ঘোষে দিগন্ত কম্পিত করিয়া চলিতে চলিতে সহসা মধ্যপথে নিশ্চল হইয়া গেল।

এইরূপ সুস্থ সবল দেহে, সৌভাগ্য-সূর্য্যের প্রদীপ্ত আলোক-দীপ্তির মাঝে এমন করিয়া অন্তর্দ্ধানের কাহিনী শুধু পুণ্যবানের জীবনেই ঘটিয়া থাকে। বিস্ময়-স্তব্ধ, শোক-মুগ্ধ গ্রামবাসী অস্ফুটস্বরে শুধু এই কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। হাঁ, প্রকৃত পুণ্যবান্

এমনইভাবে মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্তের পথে মহা-প্রয়াণ করিয়া থাকে।

মৃতদেহ গঙ্গাতীরে বহন করিবার ব্যবস্থা হইল। হিন্দু, নিষ্ঠাবান বাঙ্গালী শ্যামাচরণের দেহ পবিত্র গঙ্গা-তীরে দাহ করাই সঙ্গত শত মনুষ্যবাহিত শবশয্যা খড়দহের নাথুপালের ঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিল। পিতৃয়োগকাতর কিশোরবয়স্ক দেবেন্দ্রনাথ পিতার অন্তিমকার্য্য সম্পাদনের জন্য অনুবর্ত্তী হইলেন।

হরিধ্বনিতে মুহুর্মুহু আকাশ বিকম্পিত করিয়া শ্মশান-যাত্রীরদল চলিতে লাগিল। পথিমধ্যে দেগঙ্গা নামক একটি হাট বসিয়াছিল। শ্যামাচরণের মৃতদেহ তথায় নীত হইবা মাত্র দলে দলে ক্রেতা ও বিক্রেতা পণ্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল।

শ্যামাচরণ—দেশের গৌরব, দীন দুঃখীর পরিত্রাতা, বাঙ্গালামায়ের সুসন্তান শ্যামাচরণ নাই! এই ভীষণ সংবাদে তাহারা অধীর হইয়া উঠিল। সেই পুরুষ-বরের জীবন-শূন্য দেহ একবার—শেষ বারের মত দেখিয়া ধন্য হইবার জন্য তাহারা ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

সেই জনতার মধ্যে এমন অল্পলোকই ছিল, যে কখনও শ্যামাচরণের কাছে কোন না কোন বিষয়ে উপকৃত হয় নাই। দরিদ্রের দল হাহাকার করিয়া উঠিল। কে আর তাহাদিগের বেদনা-কাতর নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দিবার জন্য প্রসন্ন আননে বরাভয় মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইবে? ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র কে আর অকুণ্ঠিতভাবে বিতরণ করিয়া অভাবগ্রস্তের মহা-দুঃখ নিবারণ করিবে? দেগঙ্গার হাট প্রায় ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানকার বাতাস শোকভারে স্তব্ধ হইয়া উঠিল।

মেঘলেশশূন্য পৌষের আকাশ স্তব্ধভাবে শববাহী যাত্রীর দলের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব পাটে বসিতেছিলেন। রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে শ্মশানবন্ধুরা অগ্রসর হইল। দীর্ঘ পথ—গঙ্গার তীর বহুদূরে। বাহকদল অক্লান্তচরণে অগ্রসর হইল।

যথাসময়ে খড়দহে নাথুপালের ঘাটে যাত্রিদল পৌঁছিল। পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে শবদেহ স্নানপূতঃ করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতাশয্যায় শ্যামাচরণের দেহাবশেষ

রক্ষিত হইল। দরিদ্রের সর্ব্বস্ব জ্বলন্ত অনলে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

কিন্তু দেহের অবসানেই কি আত্মার মৃত্যু—পূর্ণচ্ছেদ ঘটে? কবি বৃথাই প্রশ্ন করিয়াছেন ?—

"কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস,—
মৃত্যু যদি শেষ ?"

না, শ্যামাচরণের দেহের অবসান ঘটিয়াছে সত্য ; কিন্তু অম্লান, বলিষ্ঠ, প্রেমপূর্ণ, মধুর আত্মা কখনও মরে না। শ্যামাচরণ অমর হইয়া বাঁচিয়া আছেন, বাঁচিয়া থাকিবেন। তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য, মানব সমাজের কাছে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

অষ্ট পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

যথাসময়ে শ্যামাচরণের শ্রাদ্ধবাসর সমাগত হইল। পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতার মুক্ত আত্মার অশেষ প্রীতি সম্পাদনের জন্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন। দীন-দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে যিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্র এবং পত্নী দাক্ষায়ণী সেই অনাথ, আতুরগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া লোকান্তরে অবস্থিত আত্মার তৃপ্তিবিধান করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

জননীর শ্রাদ্ধের মাসাধিককাল পরে পুত্রের শ্রাদ্ধ-বাসরের অনুষ্ঠান, পুত্রবধূ ও পৌত্র—দাক্ষায়ণী ও দেবেন্দ্রনাথের কাছে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক বেদনার কারণ হইয়াছিল, তাহা কি ভাষায় ব্যক্ত করা চলে? কিন্তু কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠোর; অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্মকে অব্যাহত রাখিতেই হইবে। তাই কম্পিত-কণ্ঠে, স্পন্দিত-বক্ষে দেবেন্দ্রনাথকে উচ্চারণ করিতে হইল;—

"পিতা স্বর্গঃ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

শ্যামাচরণের ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে। তাঁহার অবয়ব স্মরণ করিবার মত কোন তৈলচিত্র অথবা আলোকচিত্র এ পৃথিবীতে নাই। এই অদ্ভুত মানুষটির আকার, অবয়ব কিরূপ ছিল, তাহা শুধু বর্ত্তমানে অনুমানযোগ্য; কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব-কীর্ত্তি, বিপুল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, বিরাট দান এবং বিচিত্র ব্যবহারের স্মৃতি বাঙ্গালার আকাশ ও বাতাসকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গালায় শ্যামাচরণের মত কর্ম্মবীরের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার চাপে বাঙ্গালী তাহার অতীত সর্ব্বপ্রকার গৌরবের অধিকার হইতে বঞ্চিত। বাঙ্গালী চাকুরীজীবী—দাস জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শ্যামাচরণের জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া বাঙ্গালী বুঝিতে শিখিবে, ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেও এমন একজন বাঙ্গালী, দেশমাতৃকার ক্রোড়ে জন্মগ্রণ করিয়াছিলেন, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত

কোন সংস্রব না রাখিয়াও শুধু আত্মশক্তির দ্বারা ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী যে ব্যবসায়ে অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারে, শ্যামাচরণ তাহার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্যামাচরণ! তুমি বঙ্গ-পল্লীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, পল্লীমাতার সেবায় কোনদিন বিরত হও নাই; দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া দীন-দরিদ্রের মর্ম্মব্যথাকে বিস্মৃত হও নাই; স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে প্রসূত হইয়া হিন্দুর আচার, নিষ্ঠা ও ধর্ম্মকে বিস্মৃত হও নাই; ধনের মোহ, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, মানুষকে দাম্ভিক, অহঙ্কারী করিয়া তুলে। তুমি অবহেলা ভরে তাহা জয় করিয়াছিলে। মানবের সেবায়—বিশ্বেশ্বর তৃপ্তিলাভ করেন, এই মহাতত্ত্ব তুমি স্বাভাবিক জ্ঞানবলে আয়ত্ত করিয়া আজ বিশ্বেশ্বরের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন নিশ্চয়ই অধিকার করিয়াছ। তুমি সিজারের ন্যায় বলিতে পার, "আমি আসিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম, জয় করিয়াছিলাম।"

দুঃখিনী বঙ্গজননী তোমারই মত সন্তানকে বহু সংখ্যায় প্রার্থনা করিতেছেন। তোমার মত শত শত ভাগ্যবান, কৃতি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, উদার-হৃদয় মহাপ্রাণ বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে, তখনই বাঙ্গালীর মিথ্যা অপবাদ ঘুচিয়া যাইবে, তখনই বাঙ্গালা-মায়ের আননে প্রসন্নতার হাস্য সমুজ্জ্বল বিভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। শ্যামাচরণ তুমি আবার আসিও, আবার বাঙ্গালীর হৃদয়ে কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া তুলিও। বাঙ্গালী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সমাপ্ত।